দেশপ্রাণ শাসমল

'শরৎ-সাহিত্যে নারী', 'মানুষ শরৎচন্দ্র', 'বিদ্রোহী রামমোহন'
প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা
শ্রীপ্রমথনাথ পাল

ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

তমলুকের প্রবীণ জননায়ক,
লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী,
পরমশ্রদ্ধাভাজন
উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি
মহাশয়ের শ্রীচরণে

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বীরেন্দ্রনাথ বিরাট। তাঁহার গৌরব-সমুজ্জ্বল, কর্ম্মবহুল জীবন পুস্তকের সাহায্যে আলোচনা করা আমার মত দীন সাহিত্য-সেবকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। আমা অপেক্ষা যোগ্যতা-সম্পন্ন যে-সব ব্যক্তির এদিকে অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল তাঁহারা, বীরেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দীর্ঘ চারি বৎসর অতীত হইলেও, এক প্রকার নীরব দেখিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এই গ্রন্থখানিকে দেশপ্রাণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখনের উপযুক্ত উপাদানসমূহ আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা আমার জ্ঞান-গোচর হইয়াছে সেগুলি ভবিষ্যতে সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন জীবনী লিখিবার সুবিধার পক্ষে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া বীরবরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা—এই পুস্তক রচনার অন্যতম অভিপ্রায়। এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন প্রুফ কপি সংশোধনের অসুবিধা হেতু এবং মুদ্রাকরের অমনোযোগিতা দোষে এই পুস্তকে কিছু-কিছু ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। সহৃদয় সুধী পাঠক সেগুলি মার্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে যে-বিষয়ে যে-ভ্রান্তি লক্ষিত হইবে তাহা পাঠকগণ সানুগ্রহে লিখিয়া জানাইলে সুখী হইব।

চৈত্র, ১৩৪৫
কলিকাতা

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"দেশপ্রাণ শাসমল" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহুপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর দীর্ঘকালের মধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু মূল্যবান তথ্য হাতে আসিয়া পৌছিলেও সেগুলি সংযোজিত করিয়া ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা নানা অন্তরায় হেতু সম্ভব হয় নাই। সেই মূল্যবান উপকরণগুলি বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বহু ব্যক্তি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পরিচিতি পাদটীকায় দেওয়া সম্ভব নয় মনে করিয়া সেগুলি পুস্তকের শেষাংশে যোগ করিয়া দেওয়ার মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও সেই হেতু মূল্যাধিক্যের আশঙ্কায় সেগুলি সব দেওয়া গেল না। নিতান্ত প্রয়োজনবোধে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ ও কয়েক ব্যক্তিব পবিচিতি দুই-চারি পংক্তি করিয়া যোগ করিয়া দিলাম।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রাণ শাসমল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগব অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুব জেলার দক্ষিণাংশকে উড়িষ্যাব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উড়িষ্যার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি যে-সব যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলিকে আমি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য দলিল বলিয়া বিবেচনা করি। ভবিষ্যতে কখনও কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া সেগুলি পবিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এবারেও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পুস্তকখানি বাসনানুযায়ী সংশোধন করিয়া দিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশে আমাকে সমধিক উৎসাহিত করিয়াছেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেসন্স জজ শ্রদ্ধেয় শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী নন্দ, দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক প্রীতি-ভাজন শ্রীবনবিহারী দাশ ও ঐ সমিতির সদস্য সুহৃদ্বর শ্রীমন্মথনাথ গিরি।

বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল বর্ত্তমান সংস্করণের প্রকাশভার গ্রহণ করায় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

সূচী

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। বীরভূমি পুণ্যভূমি মেদিনীপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে মাতা, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, আত্মীয়বর্গ, গুরু-পুরোহিত ও অন্যান্য বহুজনসমক্ষে এক একবিংশতি-বর্ষবয়স্ক যুবক কিছুদিনের জন্য জন্মভূমি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে নিম্নলিখিত প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলেন :—

"পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তা জননী ঠাকুরাণী, সংসার-সুহৃদ্-শ্রেষ্ঠ পূজনীয় অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ, পূজ্যবর আচার্য্য এবং গুরুজনগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মসুহৃদগণ,

অদ্য আমার ইউরোপ গমনোদ্যোগে সহায়তা, সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া আমার কল্যাণ কামনায় আপনারা জগৎপিতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরেব নিকট যে ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন এবং স্নেহ-পরবশ হৃদয়ে আমাকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান কবিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। প্রবাসকালে প্রতিদিন সে-সকল স্মবণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হইব। আপনাদিগের সমক্ষে সর্ব্ব-সাক্ষী ভগবানের দিকে চিত্ত নিবেশিত করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে—

১। সর্ব্বদা পরমেশ্বরকেই আমাব পবম সহায়, পবমাত্মীয়, পবম বিধাতা এবং জীবনের সর্ব্বপ্রকার-উন্নতিদাতা বলিয়া স্মবণ রাখিব এবং ধর্ম্মবলই শ্রেষ্ঠতম এবং নিশ্চিত বল জানিয়া সর্ব্বদা পবমেশ্বরের ও বিবেকের আদেশানুসবণে চেষ্টিত থাকিব। সকল কার্য্যেরই অগ্রে ভগবানকে স্মরণ কবিব এবং প্রতিদিন তাঁহার অভিপ্রেত পথে চলিতে পারি কি না তাহা লক্ষ্য কবিব।

২। অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমি সর্ব্বদা আমার নিয়মিত এবং অভিপ্রেত অধ্যয়নে মনোযোগী হইব এবং যাহাতে আইনশিক্ষায় যথোচিত উন্নতি লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপ রাখিব। অন্যান্য যে সকল আনুষঙ্গিক অধ্যয়নাদি করিতে পারি, তাহা অবসর কালে করিব। কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রধান লক্ষ্য বিস্মৃত হইব না।

৩। আমার চরিত্র সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল রাখিয়া যথাসাধ্য তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব। চরিত্রবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সাধু ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিব না এবং অসচ্চরিত্র, বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের সহিত সংসর্গ করিব না।

৪। কোন সমাজে কোনও প্রকার লোকের সংসর্গের অনুরোধে বা নিজের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় কখনও মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না। ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধুচরিত্র, ধর্ম্মবন্ধু ও চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতীত দেহরক্ষার ছল করিয়া কোনও আকারে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

৫। ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা- ও লোভ-পরিবর্জ্জিত-ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার ও পরিচ্ছদাদিব ব্যবস্থা করিব এবং এ-সকল বিষয়ে বিলাসিতা ও ভোগলিপ্সা সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্জ্জন করিয়া সংযম অবলম্বন করিব।

৬। ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মবন্ধুগণেব গৃহে ভিন্ন কোন প্রকাবে স্ত্রী-জাতিব সহিত ঘনিষ্ঠতা কবিব না। কিন্তু স্ত্রী-জাতির প্রতি সর্ব্বদা মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ও পবিত্রতাপূর্ণভাবে দৃষ্টি কবিব এবং যথোচিত সম্মান সহকাবে ব্যবহারাদি কবিব। ইউবোপের কোন রমণীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ আদৌ মনে স্থান দিব না।

৭। আমাব বৈষয়িক অবস্থা স্মবণ বাখিয়া সকল বিষয়েই পবিমিতব্যয়ী এবং পবিমিতাচারী হইয়া চলিব। যে পরিমাণ ব্যয়েব ব্যবস্থা আমি এখান হইতে কবিয়া যাইতেছি, প্রাণরক্ষাব প্রয়োজন ভিন্ন এবং অভিলষিত বিদ্যালাভে আবশ্যক না হইলে তদপেক্ষা অতিবিক্ত ব্যয় করিয়া সংসারের ঋণদায় বৃদ্ধি করিব না এবং কাহাবও অন্তঃকরণে ক্লেশ দিব না।

৮। আমার বর্ত্তমান এই পরিবারবর্গের, এই সংসারের, আ স্বজনগণেব এবং স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের জন্যই আমি ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতেছি এবং ইহাদের সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য থাকিবে। স্বয়ং এ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া বিদেশীয় ধরণে জীবন যাপন করিব না।

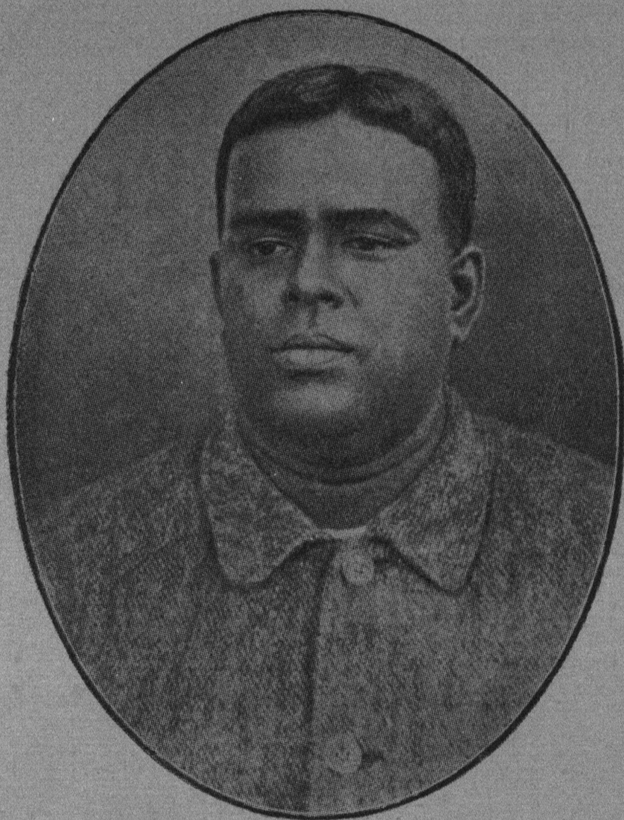
৯। উপরি উল্লিখিত লক্ষ্য সাধনের জন্য সৎসংসর্গ, অধ্যয়ন, অভ্যাস বা অন্য যে-কোন সাধনের প্রয়োজন হইবে এবং যে-সকল দৈহিক, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের প্রয়োজন হইবে, কায়মনোবাক্যে তাহা সাধনে যত্নবান্ থাকিব। চরিত্রের নির্ম্মলতা, আলাপ-ব্যবহারাদির বিশুদ্ধতা ও উন্নত আদর্শে যাহাতে জাতীয় চরিত্র বিদেশবাসিগণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে, ভারতের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে, বংশেব মুখোজ্জ্বল হইতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টা সর্ব্বদাই করিব।

এই সকল মহৎ ভাব, উচ্চ ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি বিদেশে যাইতেছি। ভগবানের সহায়তা এবং আপনাদেব আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষাই আমার সম্বল। আপনারা আমার সর্ব্বপ্রকাব অপবাধ ক্ষমা কবিয়া এবং বিস্মৃত হইয়া প্রসন্নান্তঃকবণে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনাদিগের আশা ও উপদেশানুযায়ী জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

দুর্ব্বলেব বল, পরম সহায়, স্বদেশ-বিদেশের পরম বন্ধু, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পবমেশ্বর আমাব সহায় হউন এবং সুপথে বক্ষা করুন। তিনি সকলেব কুশল বিধান করুন এই প্রার্থনা করিতেছি।

ওঁ তৎ সৎ হবি ওঁ"

যে সত্যনিষ্ঠ বীব যুবক এই প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা সবলচিত্তে পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহা জীবনে অক্ষরে-অক্ষবে পালন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের **দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।**



চিরোন্নতশির পুরুষসিংহ

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

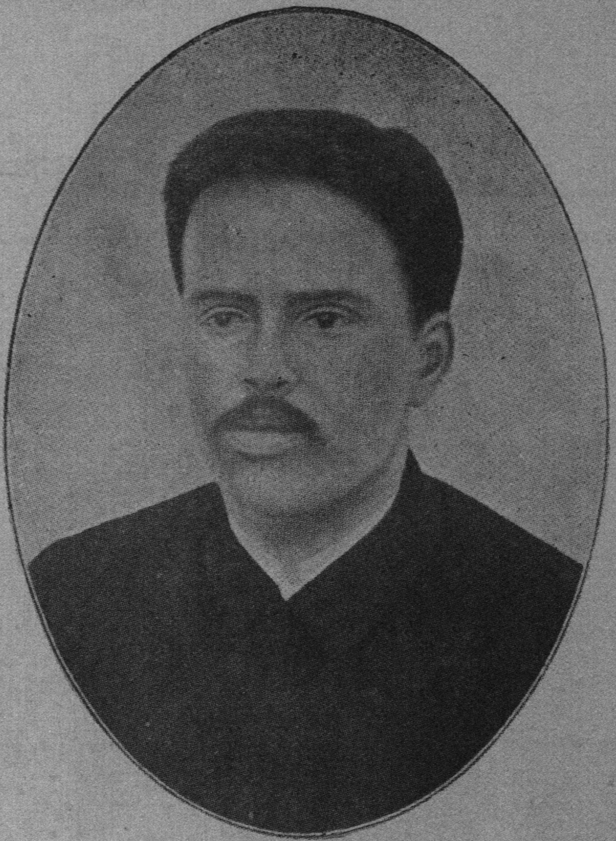
জন্ম—১২৮৮ (ইং ১৮৮১) সাল, ৯ই কার্ত্তিক, শনিবার

মৃত্যু—১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) সাল,

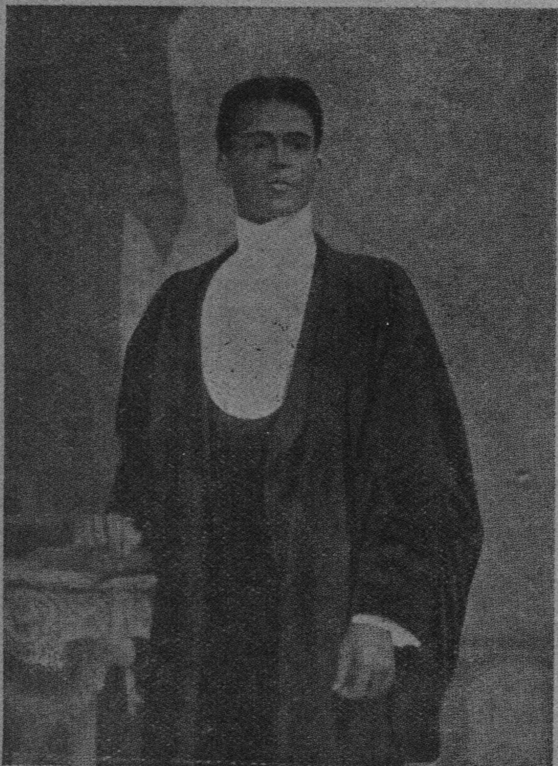
৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৪শা নভেম্বর), শনিবার



বীরেন্দ্র-জননী ৺আনন্দময়ী দেবী



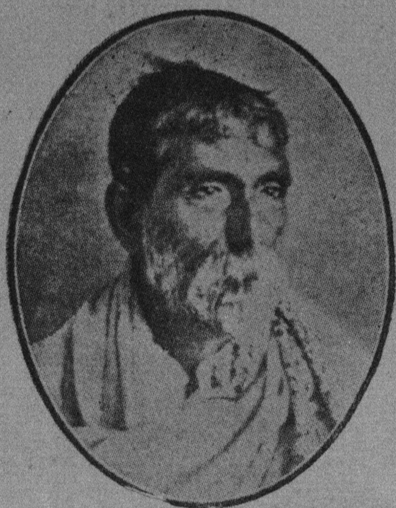
কলেজের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ



বিলাতে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ



বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ



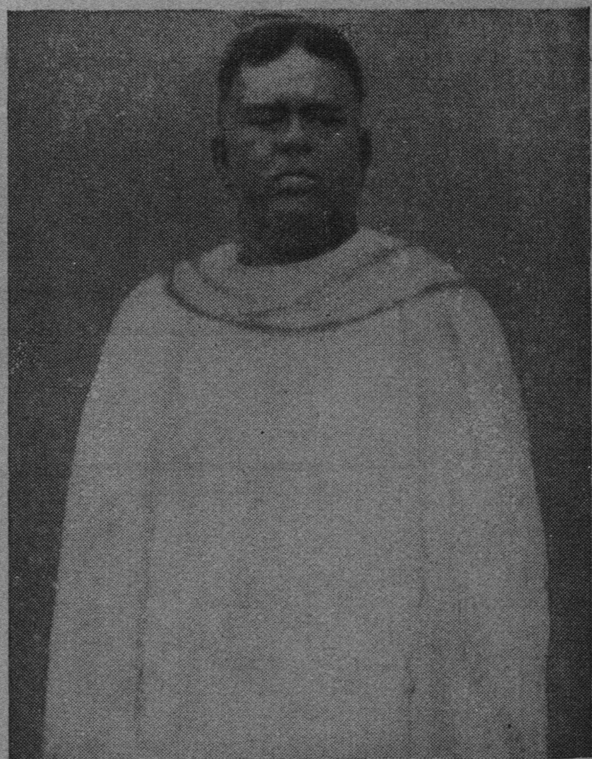
স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়



স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য



বীরেন্দ্র-সহধর্মিণী শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী



কলিকাতা করপোরেশনের কাউনসিলর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

দেশপ্রাণ শাসমল

——:**:——

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মস্থান

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি পুণ্যভূমি মেদিনীপুর জেলা বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত। বর্ত্তমান যুগের খ্যাতনামা অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র কানুনগো, মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুদিরাম বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (পূর্ব্ব নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,) প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রভৃতি বীর এই জেলারই সন্তান-সন্ততি। মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ তাঁহাদের স্বাধীনচিত্ততার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ঐতিহাসিকমাত্রেই অবগত আছেন, ভারতবর্ষে একমাত্র মেদিনীপুর আপনার স্বাধীনতা সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলের শেষে বিদেশী শাসনের অধীন হয়। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক), ময়নাগড়, তুর্কাগড়, খণ্ডরুইগড, লালগড, কর্ণগড় প্রভৃতি প্রাচীন-কীর্ত্তি-সম্বলিত স্থান আজও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আকর্ষণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষের পীঠস্থানগুলির অন্যতম।* প্রত্যেক স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসী অগ্রণী হইয়াছেন।

মুসলমান শাসন বিস্তারের সময় মেদিনীপুর সেই শাসন প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। মেদিনীপুরের যে ঘটনা চুয়ার্ড বিদ্রোহ নামে বিখ্যাত তাহা মূলতঃ স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। মোগল, পাঠান, বর্গী ও

---

* এখানে সতীর বামপদের গুল্‌ফ পতিত হইয়াছিল। সতী বা প্রকৃতি সৎ বা চিরন্তনের নাভিদেশে দক্ষিণপদ রাখিয়া বামপদে সেই চির বা কালের তাল রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। তাহা হইলে দেখা যায়, মেদিনীপুর প্রগতির ছন্দময়তা রক্ষা করে।

ইংরেজ মেদিনীপুরের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা-প্রিয়তার সঙ্গে সেই আন্দোলনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেজন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতে কোন মতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সময়ে বোমা ও গুলি-গোলার সাহায্যে ইংরেজ-শাসন এদেশ হইতে উৎখাত করিবার জন্য যে গুপ্ত আন্দোলন চলিয়াছিল তাহার সূত্রপাত হয় মেদিনীপুরে। ৺অরবিন্দ ঘোষ বরোদা হইতে বাংলাদেশে আগমনের বহু পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যাকারী ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও ৺হেমচন্দ্র কানুনগো মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলের মধ্যে গুপ্ত সমিতি আরম্ভ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, তখন মেদিনীপুর জেলা অগ্রণী হইয়াছে এবং অহিংস অসহযোগ বলিতে সত্যই কি বুঝায় মেদিনীপুরবাসীই প্রথম তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তারপর আবার ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করে, তখন সেই আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এই জেলাবাসী নাশকতা-মূলক বিদ্রোহ করিয়া আর একবার বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণ করেন যে, তাঁহারা স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতাই তাঁহাদের জন্মগত অধিকার। মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ স্বীকার, ক্লেশবরণ ও স্বাধীন-চিত্ততার মহিমায় বর্ত্তমান ভারতের যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক প্রশংসার যোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের সুধী সেবকগণের নিকট মেদিনীপুরের কথা সুপরিচিত। 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, 'বত্রিশ সিংহাসন', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, 'শিবায়ন কাব্য' প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী।

এই মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় অবস্থানকালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর গ্রন্থ 'কপালকুণ্ডলা' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরবাসী প্রতি বৎসর কাঁথিতে 'বঙ্কিম মেলা'র অনুষ্ঠান করিয়া মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন। এই কাঁথি

মহকুমার কাজলাগড় নামক স্থানে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন চাকুরীসূত্রে বাস করেন এবং তাঁহার বহু বিখ্যাত গান এইস্থানে বকুলবৃক্ষশোভিত এক পুষ্করিণীর তটে বসিয়া রচনা করেন। কাঁথিবাসী কাজলাগড়ে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতি বৎসর কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটী গ্রাম আমাদের দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান।

বংশ-পরিচয়

দেশপ্রাণ প্রায় সকলের নিকট 'শাসমল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুবা নাম বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনি জীবনে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি তাঁহার 'বীরেন্দ্র' এই নাম ও 'শাসমল' এই উপাধি উভয়েরই সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 'বীরেন্দ্র' শব্দের অর্থ যে বীরশ্রেষ্ঠ সে কথা কাহাবও নিকট বলিবাব আর প্রয়োজন নাই। তবে 'শাসমল' শব্দের সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। ১৯৩৪ সালে বীরেন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণ সভায় খ্যাতনামা বক্তা সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছিলেন,—"মহারাষ্ট্র প্রদেশে 'সাহসমল' কথা প্রচলিত আছে এবং সেখানে 'সাহসমল' উপাধিধারী এক সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় এখনও আছেন। এই বিশেষ ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায় সাহসেব সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেন বলিয়া ইহাদিগকে 'সাহসমল' উপাধি প্রদান কবা হইয়াছিল।" বাহুবলে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মেদিনীপুব জেলার ময়নাগড়ের রাজাগণের উপাধি 'বাহুবলীন্দ্র' হইয়াছে। 'সাহসমল' উপাধিও গুণানুসারে প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে, কোনও রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই 'সাহসমল' উপাধিধারী ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়েব কেহ কেহ মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন এবং স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাদের 'সাহসমল' উপাধি রূপান্তরিত হইয়া কালে 'শাসমল' এই উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। আরও শুনা গিয়াছে যে, বীরেন্দ্রনাথ একবার কার্য্যব্যপদেশে মহারাষ্ট্র প্রদেশে গিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে তখন তাঁহার 'শাসমল' পদবীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে মারাঠী বলিয়া মনে করিয়াছিল। 'শাসমল' শব্দটা

যেন অনেকটা মারাঠি রকমের। যাহা হউক, বীরেন্দ্রনাথ যে সত্যই ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার জীবন-কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাইব।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র পটভূমি দরিয়াপুরের অনতিদূরে চণ্ডীভেটী নামে একখানি গ্রাম আছে। প্রাচীনকাল হইতে এই চণ্ডীভেটী গ্রামের 'শাসমল' পরিবার কাঁথি অঞ্চলে প্রতাপশালী জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানে ও সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ও জমিজমা ছিল। এই প্রাচীন জমিদার বংশ কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের তেজস্বিতা ছিল সর্ব্বজন-সুপরিচিত। তেজস্বী হইলেও তাঁহারা কদাপি প্রজাপীড়ন কবিতেন না। যোগ্য ব্যক্তির গুণের যথোপযুক্ত আদর করিতেন, দেশের যে-কোন মঙ্গলজনক কার্য্যে অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন এবং অর্থ সাহায্য করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃ-পিতামহের বহুগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশেরই করুণাকর শাসমল (বীরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ) কলিকাতা নগরীর সন্নিকটস্থ মেটিয়াবুরুজে ভাঙ্গা জাহাজ মেরামতের কন্‌ট্রাক্ট লইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত। তিনি বহু লোককে টাকা কর্জ্জ দিতেন। একবার তিনি বহু দরিদ্র দেনদারকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে এদেশে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। করুণাকর পদব্রজে বহু দূরবর্ত্তী তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং বৃন্দাবনে দেবমন্দির ও পান্থশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতাও শাসমল বংশের গুণগরিমার পরিচয় ঘোষণা করিতেছে।

করুণাকরের অন্যতম পৌত্র রামধন (বীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত) ও রামধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্রও কৃতী পুরুষ ছিলেন। রামধন কাঁথি কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কাঁথির মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কাঁথিতে যখন লোক্যাল বোর্ড প্রবর্ত্তিত হয় নাই তখন তিনি রোডসেস কমিটির সর্ব্বপ্রথম সভ্য নিযুক্ত হন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার খুব লক্ষ্য ছিল।

কাঁথিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তিনি নিজ বাটীতে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইহাই মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ইঁহারই চেষ্টায় চণ্ডীভেটী গ্রামে ডাকঘর ও একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্রও কাঁথি কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান উকিল ছিলেন। ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকাব ছিল। ভারতের প্রথম র‍্যাঙ্গ্‌লার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু রমেশচন্দ্রের গভীর আইন জ্ঞানের সমাদর করিতেন। তিনি রমেশচন্দ্রকে ব্যারিষ্টারী পড়িবাব উপদেশ দেন। কিন্তু মাতার সম্মতি না পাওয়ায় রমেশচন্দ্রের বিলাতযাত্রা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শিক্ষা

রামধন শাসমলের মধ্যম ভ্রাতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল। বিশ্বম্ভরের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র, মধ্যম বীরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ। বিপিনচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ কাঁথিতে থাকিয়া বিষয়সম্পত্তি চালনা করিতেন। আর বীরেন্দ্রনাথই আমাদের দেশপ্রাণ শাসমল। বীরেন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালের ৯ই কার্ত্তিক শনিবার চণ্ডীভেটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মেব সময় জ্যেষ্ঠতাত রামধন শাসমল বলিয়াছিলেন—এই শিশু একজন প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা পুরুষ হইয়া আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল কবিবে। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোত্‌লা * ছিলেন। সেইজন্য একটু বেশী বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু লেখাপড়া ব্যতীত তিনি গৃহেই বহুবিধ সুশিক্ষা লাভেব সুযোগ পাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে বড়ই দুর্দ্দান্ত ও একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কাহাকেও বড় একটা ভয় করিয়া চলিতেন না। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্রদেব এক প্রকার সর্দ্দার ছিলেন। সহপাঠিগণ তাঁহার কথা প্রায়ই মানিয়া চলিতেন।

বীরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই শাসমল-পরিবারে ব্রাহ্মমতের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই বংশের গজেন্দ্রনাথ শাসমল ও ঈশ্বরচন্দ্র শাসমল প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত-ভাবে শাসমল পরিবারের চণ্ডীভেটীব বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসব সম্পন্ন হইত। বীরেন্দ্রনাথের পিতৃদেব ৺বিশ্বম্ভর শাসমল মহাশয় ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত না হইলেও ব্রাহ্মমতকে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রাহ্মমতের সংস্পর্শে বীরেন্দ্রনাথ স্বাধীন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। এইভাবে বীরেন্দ্রনাথের অন্তবে সহজাত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি বাল্যেই অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায়।

বীরেন্দ্রনাথ ১১।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। তারপর তিনি কাঁথি গমন করেন এবং সেখানে হাই স্কুলে

---

* তোত্‌লার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অজ্ঞাত মনের পরিচয় এই যে, ভাষায় প্রকাশ-কালীন ভাবের আকস্মিকতা শৈশবের এই তোত্‌লামিতে প্রকাশ পায়। শিশু বীরেন্দ্রনাথ ভাব-প্রকাশ অপেক্ষা ভাবাধিক্যকাতর।

ভর্ত্তি হন। কাঁথিতে তাঁহাদের একখানি নিজস্ব অট্টালিকা ছিল। সেইখানে থাকিয়া বীরেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে কাঁথি হাই স্কুলে ব্রাহ্মমতের আচার্য্য তারকগোপাল ঘোষ প্রধান শিক্ষক ও আচার্য্য শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বহু গুণের আধার ছিলেন। বালকগণ যাহাতে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে সেদিকে তাঁহারা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। এই শিক্ষকগণের সান্নিধ্য ও শিক্ষা লাভ করিয়া বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অঙ্কুরিত স্বাধীনতা-বৃত্তি, স্বাধীন চিন্তা ও জীবনে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধনে আর যে একটি জিনিষ বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা হইল ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথের নামে দেশ প্লাবিত। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনায় ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথই বালক বীরেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিলেন। কি করিয়া তিনিও একদিন সুরেন্দ্রনাথের মত বক্তৃতা দিতে পারিবেন, কি ভাবে তিনিও একদিন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবেন, বাল্যকাল হইতে তিনি এই স্বপ্ন দেখিতেন। সেইজন্য তিনি ইংরেজী ও ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করিতেন। আর সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা-বিবৃতি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

বীরেন্দ্রনাথ ক্লাসের বিধিবদ্ধ লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। ইংরেজী ও বাংলা রচনায় তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল। তিনি পদ্যও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি পদ্য 'সাহিত্য' নামক তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র হইলেও সকল শ্রেণীর বালকের সহিত অবাধভাবে মিশিতেন। তিনি প্রকৃতই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বন্ধুর বিপদের সময় তিনি পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয়ে কদাপি কাতর হন নাই। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বহু গরীব ছেলেকে অর্থ, পুস্তক ও বস্ত্র দান করিয়াছেন। তিনি বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া আমোদ-আনন্দ ভোগ করিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে ও মধ্যে-মধ্যে কাঁথির দক্ষিণে জুনপুটের

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বাংলায় বন্ধুগণসহ বনভোজনের আয়োজন করিতেন এবং সমূহ ব্যয় নিজে বহন করিতেন। তাঁহার মাতাপিতা ও বড় দাদা ইহাতে খুব খুসী হইতেন।

কাঁথি হাই স্কুলে অধ্যয়ন-কালে বীরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। কাঁথি হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে (তৎকালে বিদ্যাসাগর কলেজের 'মেট্রোপলিটন্ কলেজ' নাম ছিল) প্রবেশ লাভ কবেন। সে সময় কলেজ-ক্লাসে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পৃথক্-পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল না। বর্ত্তমান সময়েব আই. এ. ও আই. এস্-সির পরিবর্ত্তে এফ এ পডান হইত। কলেজে অধ্যয়নকালে বীরেন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা হইতে তাঁহার কুসংস্কারমুক্ত নির্ম্মল চরিত্রের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মমতের সংস্পর্শে ছেলেবেলায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা তাঁহাদের বংশের স্বাভাবিক উদারতা গুণেই হউক, বীরেন্দ্রনাথ কখনও জাতিভেদ মানিতেন না। অস্পৃশ্যতা তাঁহাব অজ্ঞাতই ছিল। তখনও অস্পৃশ্যতা দূবীকরণ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বীবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যে ছাত্রাবাসে তথাকথিত উন্নত ও তথাকথিত অনুন্নত ছাত্রেব সহিত বাস কবিতেন, সেই ছাত্রাবাসে একদিন একজন তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেব অভিভাবক আসেন। তিনি সেখানে সব শ্রেণীর ছাত্রেব একত্র বসিয়া আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হন এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রদিগকে একসঙ্গে লইয়া ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করেন। ইহা শুনিয়া আবাল্য তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীব সকল ছাত্র ছাত্রাবাস ত্যাগ করিলেও তিনি তথাকথিত অনুন্নত ছাত্রদেব সহিত ছাত্রাবাসে বাস করিবেন এবং একসঙ্গে বসিয়াই আহার করিবেন। ইহার পর আর কেহই ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে সাহস কবেন নাই। বীরেন্দ্রনাথের নিজ বাড়ীতে কয়েক জন বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু জাতিগত পার্থক্যানুসারে কখনও তাঁহাদের পান-ভোজনের ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। বীরেন্দ্রনাথের মাতৃদেবীও অস্পৃশ্যতা মানিয়া চলিতেন না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছোট ছেলেদের মনকে প্রথম হইতে প্রস্তুত করিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ "ছোটদের জ্ঞানোদয়" নামে একখানি

পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে তিনি তাহার মুদ্রণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি এক নামকরা কংগ্রেসীর হাতে পড়ে। তিনি তাহা মুদ্রণের বা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই।

নেতার আসন লাভ করা বীরেন্দ্রনাথের জীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে। ইহা তাঁহারই প্রাপ্য। দেশের সেবা করিয়া নেতাব আসন লাভ করাই প্রকৃত নেতা হওয়া।

ছাত্রাবস্থা হইতেই বীরেন্দ্রনাথ দেশের ও দশেব সেবা কবিয়া আসিয়াছেন। এই সময়েই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে যখন তিনি কলেজেব ছাত্র তখন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনেব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতাব "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকাব সম্পাদক ৺নরেন্দ্রনাথ সেন সেই অধিবেশনের সভাপতি এবং মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺কাত্তিকচন্দ্র মিত্র অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ছিলেন এবং ঐ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবাব জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে তিনি মেদিনীপুব জেলা হইতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বৎসবেই কলিকাতায় নিখিল ভাবত রাষ্ট্রীয় মহাসভাব অধিবেশন বসে। স্বর্গীয় দীনশা ওয়াচা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত কবেন। ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ অধিবেশনেব অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন এবং মেদিনীপুব জেলা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগদান কবিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায়, কংগ্রেসের সহিত বীরেন্দ্রনাথেব সম্পর্ক বহু দিনের।

বিলাত যাত্রা

বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়নের পর বীরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজে (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) যোগদান করেন। তখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যাপনা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও অধ্যাপনা শ্রবণ করিয়া আপনাকে দেশহিতকর কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিবেন—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই বীরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার মনে ইংলণ্ড গমনের বাসনা জাগে। তিনি তখন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উত্তম আইন-জ্ঞান না থাকিলে দেশের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করিবার পক্ষে অনেক বাধা আসে। এই সময় তাঁহার মনে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নের সঙ্কল্প অত্যন্ত প্রবল হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তখনও কাঁথি মহকুমার কেহ বিলাত গমন করেন নাই। বিলাতযাত্রায় বীরেন্দ্রনাথের মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনগণের কিছুমাত্র সম্মতি ছিল না। সেই জন্য তিনি হঠাৎ একদিন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ ভারতের টিউটিকোরিনে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনচন্দ্রকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। বিপিনচন্দ্র ও মাতা আনন্দময়ী তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন পরে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। বীবেন্দ্রনাথেব আর এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। বীরেন্দ্রনাথ বিলাতে মিড্‌ল টেম্প্‌ল্‌ (Middle Temple)-এ ভর্ত্তি হন এবং তিন বৎসর আইন অধ্যয়ন করিয়া যথাসময়ে সেখান হইতে ব্যাবিষ্টারী পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন।

বিলাতে অধ্যয়নকালে ও পরবর্ত্তী জীবনে বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে বীরেন্দ্রনাথ কখনও ইচ্ছা করিয়া একদিনের জন্যও সিনেমা-থিয়েটার দেখিতে যান নাই। বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। ডাঃ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র বিলাতে একসঙ্গে থাকিতেন। ডাঃ ঘোষ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ১৯৩৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে দেশপ্রাণ শাসমলের আলেখ্য উত্তোলন অনুষ্ঠানে * ডাঃ ঘোষ বলেন,—"বিলাতে অবস্থানকালে অনেক ভারতীয় যুবককে সেখানে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মত এমন নির্ম্মলভাবে জীবন যাপন করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কুটিলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

* আলেখ্য তৈয়ার ও উত্তোলনের ব্যয় বহন করেন ৺মহেশ্বর মাইতি ও বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক এবং আলেখ্য উত্তোলনের উদ্যোগ-আয়োজন করেন ৺অমূল্যচরণ প্রামাণিক।

তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও কিসে ভারতের পরাধীনতার মোচন হয় এই আলোচনা লইয়া কালযাপন করিতেন। একদিন বাসার কয়েকজন যুবক ছল করিয়া বীরেন্দ্রনাথকে ভুলাইয়া সিনেমা-গৃহে লইয়া যায়। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং কয়েকদিন পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর আবার আমার মধ্যস্থতায় মনোমালিন্য দূর হয়। বীরেন্দ্রনাথ সকলের সহিত অতি সরল ও মধুর ব্যবহার করিতেন। যৌবনে আমার সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় তাহা আমরণ দৃঢ়ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।"

বীরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিলাত হইতে আমেরিকা ভ্রমণ করিতে যান। তিনি সেখানে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়াছিলেন, তাহাব কিয়দংশ তাঁহার নিজের কথায় এখানে বিবৃত করিতেছি। ['স্রোতের তৃণ' (১৯২২ খৃষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ১৬১ দ্রষ্টব্য]

"সে আজ প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলেতে ব্যারিষ্টাবী প'ড়তে প'ড়তে মাস কয়েকের জন্য একবার যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্ক সহরে তখন 'আউট্ লুক্' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরুত। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় মিঃ হ্যামিন্টন ডব্লিউ মেবী তার সম্পাদক ছিলেন। ·· ···মিঃ মেবীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের অথার্স ক্লাবে বা লেখক সমিতিতে আমার পরিচয় হয়েছিল। ······তিনি একদিন তাঁর পঞ্চম য়্যাভিনিউর বাডীতে আমাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সবে মাত্র তাঁব বসবার ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে স্থরু করেছি এমন সময় তাঁর একজন চাকর আমাদেব জন্য চা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। মিঃ মেবী তৎক্ষণাৎ আমাকে অতি সহজ ও সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মিঃ শাসমল, আপনার সঙ্গে আমার পোর্টারের (চাকরের) পরিচয় করিয়ে দিব কি ?' ······আমি এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একটু অপ্রতিভ হলেও মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সামলে নিয়ে ভদ্রোচিত 'নিশ্চয়ই' বলে মিঃ মেবীর চাকরের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। ······সে লোকটি তার প্রভুর সম্মুখেই তাঁর পাশের একখানা চেয়ারে বসে পড়েছিল। ······তার সঙ্গে····· গোটাকতক কথা হবার পর সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন মেবী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'মিঃ শাসমল, আমার ব্যবহারে বোধ হয় আপনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। তা' হবারই কথা,

কারণ—আমি শুনেছি, আপনি যে দেশ থেকে আসছেন, সে দেশে মানুষের কাজের ভালমন্দ অনুসারেই মানুষকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা হয়। এমন কি, আপনাদের দেশে নাকি যে এক পুরুষ মেথরের কাজ করে তার বংশের আর কেউ কখনো ব্রাহ্মণ হতে পারে না। আমাদের এদেশে কিন্তু আমরা সকলে সকল কাজকেই আনন্দদায়ক এবং গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে থাকি। এদেশে আজ যে মুচির কাজ করছে, সে ভাল লোক হলে কাল এদেশের প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। আপনি বোধ হয় এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবন-চরিত পড়েছেন। আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি, আমাব পোর্টারের মত একজন সৎলোক কোন দেশেই সচরাচব খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আপনার সঙ্গে কেন, পৃথিবীর যে-কোন সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তাব পবিচিত হবার অধিকার আছে।'

"দু'লক্ষখানা বই পড়লে আমার যে জ্ঞান হতো না, আজ এই একটি সামান্য ঘটনায় আমাব সেই জ্ঞান হয়েছিল। আমি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম—আমবা এতদিন ধবে কেবল কাগজেই মবে এসেছি এবং কলমেই কেঁদেছি, কিন্তু প্রকৃত ডেমোক্র্যাসিব প্রতি আমাদেব কারও যে হৃদয়ের খুব অনুরাগ আছে, এমন মনে হয় না। ·····আমাদেব অনেকের বিশ্বাস আছে, বই পড়ে ডেমোক্র্যাট্ হওয়া যায়। আমাদের সে বিশ্বাসকে আজ এই জাতিগঠনের দিনে জন্ম-জন্মান্তবের জন্য বিদায় দিতে হবে। আমরা যখন আমাদিগকেই কোনকালে ভাল করে বুঝতে পাবলাম না, তখন আমরা আমাদেরই লেখা পড়ে কি ক'বে যে মানুষ হবো তা' আমার সাধ্য-সাধনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আমবা যদি আমাদেব ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে একেবারে দীনহীন কাঙ্গালের মত হারিয়ে ফেল্‌তে পারি, তবেই সে বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়ে এমন এক বিরাট প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে যে, তার কাছে যুগ-যুগান্তরের অন্ধ-বিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা চিবদিনের জন্য কোথায় পালিয়ে যাবে।"

যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও কর্ম্মক্ষেত্র

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর যান এবং সেখানে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তখন তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি সেখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে জেলাবোর্ড ও সদর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এখানেও তিনি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সময় সমগ্র দেশে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত চলিতেছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাংলাদেশকে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম তখন এক লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে শাসিত হইত) দুইভাগে ভাগ করিয়া দুইটি প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা করেন। তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল—বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও সেই সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচাব। বীরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনেও কিছুমাত্র পশ্চাতে ছিলেন না। তিনি আপনাব অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা লইয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত জোরের সহিত স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। তিনি দেশেব রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার হিতকর ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার কার্য্যগুণে তিনি অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হন। মেদিনীপুরবাসী সেই দিন হইতে তাঁহাকে তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসে। বলা বাহুল্য, শাসমলই এই অধিবেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন এবং মেদিনীপুর জেলার একজন প্রতিনিধিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের এই

সম্মেলনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দেয় তাহাই পরে সুরাট কংগ্রেসে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠে।

মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথের ব্যবসায় বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। একজন নিপুণ ব্যারিষ্টার বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমনি সময়ে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন এবং হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। এখানেও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাব পসার বেশ জমিয়া উঠিল।

বন্যার্ত্ত ব্যক্তিদের সেবা

১৯১৩ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুব জেলায় প্রবল বন্যা হয়। তাহাতে বহু ঘরবাড়ী ভাসিয়া যায়, গো-মহিষাদি অনেক গৃহপালিত জন্তুব প্রাণহানি হয। ফসল একেবাবে নষ্ট হইযা যায়। দেশবাসীব আর দুঃখের অবধি ছিল না। আর্ত্তেব বেদনা, পীড়িতেব কাতবধ্বনি চিবদিন বীবেন্দ্রনাথেব হৃদয় স্পর্শ করিত। বীবেন্দ্রনাথ এই সময সাধাবণেব নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলে গমন করেন এবং কর্ম্মীদল গঠন করিয়া সেবাকার্য্য চালাইতে থাকেন। বীবেন্দ্রনাথ ধনীব সন্তান, নিজে বড আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু তিনি দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য আপনাব সুখশান্তি ভুলিয়া গ্রামে-গ্রামে ঘুরিযা বেড়াইয়াছিলেন। কর্দ্দমাক্ত পথে পদব্রজে দীর্ঘ রাস্তা গমন করিতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ কবেন নাই। তাঁহাব মন যে সর্ব্বদা দেশের জনসাধারণের দুঃখের দিকে চাহিয়া থাকিত। তিনি নিজের কথা চিন্তা করিবেন কেন! সেই জন্য শাসমল মহান্, শাসমল দেশপ্রাণ।

এই সময় মেদিনীপুর জেলার অদৃষ্টে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা-শাসন-সমিতি মেদিনীপুব জেলা পরিদর্শন করিয়া এই জেলাকে দুইটি জেলায় বিভক্ত করিবার প্রস্তাব কবেন। এই প্রস্তাব অনুসারে বাংলা সরকারও মেদিনীপুর জেলাকে দুইটি জেলায় পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। জেলাবাসীর আন্তরিক মনোভাব অবগত করাইবার জন্য বাংলার লাট সাহেবের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই ডেপুটেশনের একজন সভ্য ছিলেন। সরকার বাহাদুর জেলাবাসীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া

আপনাদের সঙ্কল্পে অটুট থাকেন। তাঁহারা খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া সেখানে বহু অর্থব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। তখন আন্দোলনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। মেদিনীপুর-জেলাবাসী বুঝিতে পারেন—এখন আর জেলা বিভাগ রদ করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পাবেন, খড়্গপুরে নূতন জেলার সদর স্থাপিত হইলে নূতন জেলাব লোকের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই অধিক হইবে। সেজন্য যাহাতে কাঁথিতে নূতন জেলার সদর স্থাপিত হয় সেই উদ্দেশ্যে বীরেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সালে ৪ঠা অক্টোবর কাঁথি পরিদর্শন করেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাঁথিকে নূতন জেলার সদবে পরিণত করিবাব জন্য গভর্ণরের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠান হয়। এই সময় ইউরোপে মহাসমর জলিয়া উঠে। কি কাবণে জানি না, বৃটিশ সরকার মেদিনীপুর বিভাগেব চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সেইজন্য তিনি মেদিনীপুবেব প্রত্যেক বিপদে আপনার সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে উদ্ধাব কবিবার জন্য বীরবেশে সংগ্রাম করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসহযোগ আন্দোলনে বীরেন্দ্রনাথ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীর পূর্ণ অসম্মতিতে বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয়। ইহা লর্ড কার্জ্জনেব ভারত শাসন কালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রথম হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। কাজেই প্রথমে বাঙালীরা ইংরেজী শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিল আর তাহাব ফলেই তাহারা ভাবতের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর নেতৃত্ব ইংরেজ শাসকদিগের দুর্ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাঁহাবা বাঙালীদিগকে নানাভাবে জব্দ করিবাব চেষ্টা কবিতে থাকেন। তাঁহারা স্থিব কবেন যে, বাঙালী জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পাবিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। সেজন্য তাঁহারা বঙ্গদেশেব পূর্ব্বাঞ্চলেব জেলাগুলি ও আসাম লইয়া একটি প্রদেশ এবং বঙ্গদেশেব বাকী অংশ, বিহাব ও উড়িষ্যা লইয়া আব একটি প্রদেশ গঠন কবেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধেব জন্য সমগ্র ভাবতে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন জাগিয়া উঠিলে বৃটিশ সবকাব পুনরায় দুই বাংলাকে একত্র মিলিত করেন, কিন্তু তাঁহাবা বাঙালী বিনাশের সংকল্প ত্যাগ কবেন নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাবা বিহাব ও উড়িষ্যা নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ এবং পরে আসাম নামে আর একটি প্রদেশ গঠন করেন। এইখানেও তাঁহাবা বাঙালী নিধন প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন নাই—বাংলাভাষাভাষী হিন্দুদের বিরুদ্ধে বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদেব মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে থাকেন। সে প্রচেষ্টায়ও যখন তাঁহারা বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহারা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। গান্ধীজীচালিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার ফলে পরবর্ত্তী মারাত্মক পরিণতি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দেব আগষ্ট মাসে কলিকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং বৃটিশ সরকারের কূট-কৌশলে ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারত বিভাগ আর উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা ও বাহুবল পাঞ্জাবের দ্বিধাকরণ।

বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্বদেশী পণ্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি তাহার পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসে। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের প্রতিনিধি হইয়া উহাতে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন মেদিনীপুরে আহ্বান করেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং উহা অসামান্য সাফল্যমণ্ডিতও হয়। মেদিনীপুর উকিল সভার সভাপতি উকিল স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মাইতি অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি এবং মিঃ এ কে. ফজলুল হক্ সম্মেলনেব সভাপতি ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন বসে। তাহাতে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় সভাপতি পদে বৃত হন। শাসমল এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং বিশেষ নৈপুণ্যেব পরিচয় দেন। এই কংগ্রেসের প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীজী-প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ ব্রত। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেব প্রধান কথা—সর্ব্ব ক্ষেত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেব সহযোগ হইতে অহিংসভাবে দূবে থাকা। বাংলার আইন ব্যবসায়ীদেব মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন ইহার বিরোধিতা করেন। তারপর তিনি নাগপুব কংগ্রেসে অসহযোগেব প্রস্তাব সমর্থন করেন। নাগপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ কবেন। "পূর্ব্বে এদেশে ছুটির অবকাশে রাজনৈতিক নেতা হওয়া যাইত। নিজের সুখ-শান্তিকে ষোল আনা বজায় রাখিয়া, এমন কি, নিজের ঐশ্বর্য্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যও দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না। তৎপূর্ব্বে দেশ-সেবার জন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ বা স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার কথা উঠিলে লোকে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত।" [স্রোতের তৃণ, (১৯২২ খৃঃ), পৃষ্ঠা ১]

কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করার সময় শাসমলের সুনাম বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় বাংলার বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতেও যে তাঁহাকে মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত করা হইত তাহা তাঁহার বন্ধু বিহারের অন্তর্গত চক্রধরপুরের স্বর্গীয় প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তীকে ১৯১৮

খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত এক পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগের পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথের মানসরাজ্যে যে ঝটিকার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথায় এখানে বিবৃত করিতেছি। [স্রোতের তৃণ (১৯২২ খৃষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ২]

"ব্যবসায়ে আমার যে দু'পয়সা উপায় হ'ত, সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনাও যে আমার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সে কথা অন্য কেহ না বললেও কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার অধিবাসীবৃন্দ ব'ল্‌বেন। সুতরাং কংগ্রেসের বাণী শুনেই আমাব শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে আমার বাস্তব জীবনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হ'যেছিল!

"যে আজন্ম ভোগলালসায় প্রতিপালিত হ'য়েছে, কামনা-জর্জ্জরিত যাব জীবন, এ সম্বন্ধে তার মনের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে হতে পারে? ঝড়ের মত দিক্-দিগন্ত প্রকম্পিত করে' কত দুঃখেব বার্ত্তা কত যন্ত্রণাব কাহিনী মনের গোড়ায় ভেসে আস্‌তে সুরু করেছিল! মনে হ'য়েছিল, যদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করি, তা'হ'লে এত বড বাড়ী পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, এত বৎসরের গাডী ঘোড়া ছাডতে হবে, এত সাধেব পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি, আহাব, চালচলন ইত্যাদিরও পরিবর্ত্তন না কর্‌লে চল্‌বে না, পার্‌বো কেমন কবে'।

"অন্য কেহ হলে, সে হয় তো এ সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট উপদেশেব জন্য ছুটে যেত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি একা যে কার্য্যে বিজডিত অর্থাৎ যে কাজেব দ্বাবা কেবল আমার একার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিম্বা সুনাম-দুর্নামেব সম্ভাবনা আছে, সে কাজের জন্য বড় একটা কাহারো উপদেশ আমি কখনও লই নাই। উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারি, সকলেব অসম্মতিতে বিলাত যাওয়া, আমাব মেদিনীপুবের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ কবে হঠাৎ কলিকাতা আসা ইত্যাদি আমাব জীবনেব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আমিই আমাব নিজেব একমাত্র উপদেষ্টা ছিলাম। আজ আমি আমাব সেই বহু পুরাতন কিন্তু নিতান্ত আপনাব উপদেষ্টাকেই এই নূতন কথা নূতন কবে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—পার্‌বো কি?

"ভালমন্দ জানি নে—হয়তো ভালমন্দ বিচাব কববার এখনো সময় হয়নি—তবে আমাব উপদেষ্টা আমাকে পূর্ব্বেব মতই স্পষ্টভাবে জবাব দিয়েছিলেন।

তা'তে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না, এতটুকু ভীতি বা আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয় নি। তিনি গুরু-গম্ভীরস্বরে বলেছিলেন—

তুমি কে? তোমার কর্‌বার বা না কর্‌বার, পার্‌বার বা না পার্‌বার আছে কি? দেখছ না, তুমি যে স্রোতের তৃণ! তোমাব না বলবার উপায় নাই—ভালমন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতা নাই, তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হয়েছে ও ভেসে চলতে হবে। তুমি কখন হেল্‌বে—কখন দুল্‌বে। কখন ডুববে, কখন ভাস্‌বে। তুমি আজ কোনও নদী-তীরবর্ত্তী দেবালয়ে দেবতার পদতলে শোভাবর্দ্ধন করতে পার। কিন্তু কাল তোমাকে হয়তো আবাব সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্মশানে কোনও মৃতের পদতলে লুটিয়ে পডতে হবে। তোমার চন্দন-বিষ্ঠা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, শুভ-অশুভ কোন কিছু বিচার কর্‌বার অধিকার নাই। তোমার ঊর্দ্ধে স্রোত, নিম্নে স্রোত, তোমার বামে স্রোত, দক্ষিণে স্রোত। তুমি এক বিরাট বহুবিশ্বব্যাপী স্রোতরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নিতান্ত নগণ্য তৃণখণ্ডমাত্র। তুমি সে স্রোতরাশির গতিরোধ কর্‌তে পাববে কেন? এ জগতে কেহ কখনো পারে নি, কেহ কখনো পার্‌বে না। এই স্রোতরাশির বিপুল আবর্ত্তে পড়েই নেপোলিয়ন সেণ্ট্ হেলেনায় বন্দী হয়েছিলেন, কীচ্‌নাব সমুদ্রগর্ভে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই স্রোতবাশির স্বাভাবিক ধর্ম্মেব গুণেই রুষ সম্রাটের বংশ লোপ হয়েছে—জার্ম্মান সম্রাট কাইজার আজ হলণ্ডে। আবাব এই স্রোতবাশিব প্রভাবেই শাক্যসিংহ ও যীশু খৃষ্ট—চৈতন্য ও জযদেব সর্ব্বস্ব ত্যাগ কবে' এই স্রোতের উপবেই একান্ত নিভবশীলের মত ঢলে' গলে' একাকাব হয়ে গিয়েছিলেন। দেখছ না, তোমাদেব চক্ষের সম্মুখে তোমাদেব মতই একজন ভাবতবাসী এই স্রোতরাশির মধ্যে পড়ে কোথায় ভেসে চলেছেন? মানব-বিনির্ম্মিত কারাগার ও মানব-প্রদত্ত সমূহ দৈহিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম কবে' দেশ ও দশেব জন্য আজ তিনি মৃত্যুব দুয়াবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং শুনছ না, তিনি তাবস্বরে বল্‌ছেন—আমাকে ভারতমাতা ও জগন্মাতাব মঙ্গলের জন্য কে কোথায় আছ বলি দাও? সাংসাবিক বুদ্ধি ও বৈষয়িক বিজ্ঞতার কথা গভীরভাবে চিন্তা করবাব কোনও আবশ্যক নাই। কারণ তারাও এই স্রোতরাশিব অন্তর্গত সামগ্রী। বস্তুতঃ, স্রোতের টানে যেমন তোমার টান, স্রোতের গতিতে যেমন তোমার শক্তি, সেইরূপ স্রোতের বর্ত্তমানতায় জগৎ বর্ত্তমান, স্রোতের অভাবে জগতের অভাব। দিব্যচক্ষে

চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে স্রোতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্রোতেই তোমার লয় হবে, স্রোতই তোমার স্বর্গের দেবতা এবং স্রোতই তোমার মর্ত্ত্যের সংসার। এই শিবসুন্দর অখণ্ড স্রোতরাশির মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হয়ে অবগাহন কর—তোমার প্রত্যেক অণু পরমাণুর ভিতর এই স্রোত-রাশির অপূর্ব্ব মহিমা ফুটে উঠুক্। তখন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের মাদকতায় প্রেম ও ত্যাগের অমৃতপানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠবে। *

"ইহার পর তর্কবিতর্ক বা বাক্-বিতণ্ডা করবার আর সময় বা অবসর ছিল না। ব্যবসায় ছাড়তেই হবে এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করতেই হবে—স্থিব করেছিলাম। কিন্তু একটু লজ্জা হচ্ছিল যে, সে সময় বাংলার অন্য কোনও ব্যারিষ্টার আমাব সঙ্গে এই কাজে যোগদান করতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং একটু দুঃখও হয়েছিল যে, যাঁহাদিগকে অন্তবের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতাম, যাঁহাদের হৃদয়েব সবলতা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁদেব সম্মুখেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাকে ভোট দিতে হবে। আমার কোন কোন বন্ধু উপযাচক হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এ সময় একবার মহাত্মা গান্ধীব সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন যে, আমি প্রতিপত্তি বিস্তাবের চেষ্টা করছি, সেইজন্য সে সময় তাঁর সঙ্গে একেবারেই সাক্ষাৎ করিনি।"

বীরেন্দ্রনাথ বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ শাসমল দেশসেবক বীবেন্দ্রনাথ শাসমল হইলেন। বাংলার আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য বীবেন্দ্রনাথ যে আয়োজন করিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখিয়া বন্ধ করিয়া দেন। নূতন মক্কেলদিগকে বলিয়া দেন যে, তিনি আর তাহাদের মোকর্দ্দমা লইতে পারিবেন না। তাঁহার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া যে সকল ছাত্র স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে

* ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ও প্রতীচীর মনীষী Plato, Locke, Birkley, Hume, Bergson ও Einsteine যাহাকে চিরন্তন মহাকাল ও যাহার গতিকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিশ্বনিয়ন্ত্রণ বলিয়া বুঝাইতে চান, তাহাকেই শাসমল 'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে কালস্রোত বা স্রোত বলিতেছেন।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গাড়ীখানি ও ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া দেন এবং প্রায় ১২।১৪ বৎসরের পর আবার ট্রাম গাড়ীতে চলিতে আরম্ভ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শাসমল বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার (Bengal Tilak Swarajya Fund)-এব কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শাসমল তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায়, সাধারণের টাকা-পয়সাব ব্যাপারে যাঁহারা হিসাব দেন না, তাঁহাদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাবণ তাঁহারা শাসমলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠাব পরিচয় পাইয়াছিলেন। শাসমল পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ কংগ্রেসের সময় খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদক থাকা কালে বহু ফাঁকিদারের ফাঁকি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনার কঠোর মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদেব বেশীর ভাগই ex-detenue। ইঁহারা ও আরও অনেকে পরে শাসমলের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের মন বিষাক্ত করিতে আবম্ভ করেন।

ইহাব কিছুদিন পবে একদিন চিত্তরঞ্জন শাসমলকে বলেন—২৫ লক্ষ টাকার ফাণ্ডে তোমাব একার থাকা উচিত নয়। কলিকাতার একজন কায়স্থ, একজন মারোয়াড়ী ও একজন মুসলমান থাকা ভাল। শাসমল কায়স্থ বা মুসলমান ছিলেন না। কাজেই তিনি ইঙ্গিত বুঝিয়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষেব পদ পরিত্যাগ করেন। পরে একজন কায়স্থ (৺নির্ম্মল চন্দ্র) কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে শাসমলের উপর অবিচার আরম্ভ হয়। শাসমলের কার্য্যের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতে না পারিয়া জাতিবিদ্বেষের আগুনে জ্বলিয়া উদারচিত্ত চিত্তরঞ্জনেব মনকে তিক্ত করিয়া যাঁহারা শাসমলেব উপর অবিচার সুরু করিলেন তাঁহারা পরে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শাসমলের জীবনকে যে ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা একে একে দেখাইতে প্রয়াস পাইব। তাঁহারা কেবলমাত্র বিরাট কর্ম্মী শাসমলের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করেন নাই, তাঁহারা সেইসঙ্গে স্বাধীনতা-অর্জ্জন-আন্দোলনে শাসমলের মত কর্ম্মপ্রতিভা হইতে দেশকেও অনেকাংশে বঞ্চিত কবিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ নিজের উপর এই অবিচার বুঝিয়াও আপনার কর্ত্তব্যে অবিচল ছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের জন্য যান। এই সময় তিনি কাঁথি মহকুমায় দুই মাস কাল পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তিনি প্রত্যহ ৮।১০ মাইল রাস্তা হাঁটিতেন। মোটর গাড়ীর দৌড় যত দূর পর্য্যন্ত, বাংলার অন্যান্য নেতার নেতৃত্বের গতি ও আন্দোলনের সীমা ততদূর পর্য্যন্ত ছিল। তাব বেশী তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এইখানে বীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকারের মনে পড়ে, ১৯২১ সালে বোধ হয় জুলাই মাসে বীবেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের প্রচাবকার্য্যে বাহির হইয়া পল্লীর কর্দ্দমাক্ত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একবাব গ্রন্থকারের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন দেখা গিয়াছে, শাসমলের নামে দেশবাসীর কি বিপুল আগ্রহ, কি প্রবল উৎসাহ, কি দুর্ব্বাব হৃদয়াবেগে ও কি ব্যাপক চাঞ্চল্য। কোন সভায় বীরেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিবেন একথা একবাব ঘোষিত হইলে দেশের লোক হাজারে-হাজারে আসিয়া সভায় জুটিতেন, আর উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন। সে দৃশ্য দেখিবাব মত। এই সময় তিনি নিজে পল্লীতে-পল্লীতে পদব্রজে ঘুবিয়া শুধু কাঁথি মহকুমা হইতে ২৭ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডাবে অর্পণ কবেন। তাঁহার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহা তিনি তখন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি শুধু তাঁহাব কর্ত্তব্যের দিকেই দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট কবিয়া রাখিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর তিলকের স্মৃতি রক্ষার্থে গান্ধীজীর নেতৃত্বে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার গঠিত হয়। এই ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা জমা হয়। এই এক কোটি টাকা ১৯২১ সালের টাকা। উহা বর্ত্তমান সময়েব অন্ততঃ দশ কোটি টাকাব সমান। এই টাকা তিলক স্ববাজ্য ভাণ্ডারে জমা হওয়ার পর হইতে গান্ধীজী তাঁহাব মৃত্যু পর্য্যন্ত তিলকের নামোচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তিলকেব নাম ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে না সত্য। কিন্তু দেশবাসীর মন হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া দেওয়ার জন্য যদি কেহ প্রধানতঃ দায়ী হন তবে তিনি গান্ধীজী। বস্তুগতভাবে তিলকের স্মৃতি রক্ষায় বা তাঁহার আদর্শ রক্ষায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

আজ অস্পৃশ্যতা ও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে জাতিভেদ প্রথা ভারতীর সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য দেশে যে-ভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বহু পূর্ব্বেই

বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। মনে হয় এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার উপর বেশী পরিমাণে পড়িয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কার্য্য করিতে-করিতে একসময় কোন গ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান। শাসমল মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জন্য কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে পূর্ব্ব হইতে আহারের বন্দোবস্ত ছিল। আহারের সময় বীরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ও হিন্দু সহকর্ম্মীদের স্থান হইতে কিছু দূরে সেই মুসলমান সহকর্ম্মীব জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং নিজে উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আপনার আসনের কাছে বসাইয়া এক পংক্তিতে সকলে ভোজন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিপদের সময় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জাতি-কুল কিছুমাত্র অবগত না হইয়া আপনার দয়া ও সেবার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেন, বীরেন্দ্রনাথও তেমনি দেশোদ্ধার-ব্রতে কোন প্রকার সম্প্রদায় মানিতে পারিতেন না। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা বরাবরই তাঁহার সহনাতীত ব্যাপার ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইউনিয়ন বোর্ড ও বীরেন্দ্রনাথ

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় আর এক নূতন আন্দোলন গড়িয়া উঠে। তাহা ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন বা ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রচলন করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে লোকের উপর নির্দ্ধারিত চৌকিদারী ট্যাক্সের পরিমাণ প্রচলিত হারের সাত গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারে শুনিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা দেশের কোনও উপকাব হইতে পারে না। বরং দীন-দরিদ্র ব্যক্তির উপর নানা রকমের উপদ্রব সৃষ্টি হইতে পারে। এজন্য তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দেব ২১শে ও ২২শে অক্টোবর তাবিখের কলিকাতার ইংরেজী অমৃত বাজার পত্রিকায় Beware ot Union Board (ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে সাবধান হউন) নাম দিয়া দুইটি দীর্ঘ ও যুক্তিতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

বস্তুতঃ, উক্ত বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনে ঘোরতর আপত্তি করিবার মত কয়েকটি বিষয় ছিল। (ক) ইউনিয়ন বোর্ড ইচ্ছা করিলে কাহারও দেয় করের পরিমাণ সাত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিত। ইহা আপত্তিজনক। পল্লী অঞ্চলে দলাদলি থাকেই। কাজেই বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য একমত হইলেই যে কোন লোকের কব সাত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারিত; যাহার বার টাকা কব, তাহাকে চুরাশি পর্য্যন্ত কর দেওয়াব প্রয়োজন হইতে পারিত।

(খ) কোন-কোন লোকের একাধিক ইউনিয়নে সম্পত্তি থাকে এবং সেজন্য তাঁহাকে সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলিতে কর দিতে হয়। দেয় করেব পরিমাণ যদি সাত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার ব্যবস্থা থাকিত এবং সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়নেই যদি কর সাত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে করদাতার অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

(গ) গ্রাম্য দলাদলি ত সকল গ্রামে থাকেই। তাহার উপর শতকরা ৯৮ ভাগ নিরক্ষর অজ্ঞ গ্রামবাসীদের মধ্যে ভোটাভোটির উপদ্রব আমদানি করিলে দলাদলি তীব্রতর হইত।

(ঘ) ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বৃটিশ সরকারের একটু পদস্থ কর্ম্মচারীদের পল্লীর তথ্য সংগ্রহের পক্ষে এক একটি ঘাঁটি হইয়া উঠিত এবং সুদূর মফস্বল অঞ্চলে বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর কাজ করিবার সহজ সুযোগ পাইত।

ইহা ছাড়া আইনঘটিত আরও কয়েকটি অসুবিধা ছিল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত কি না তাহা সে সময়ে কেহ ভালভাবে অবগত ছিলেন না। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন সম্বন্ধে নাগপুব কংগ্রেসে কোনও অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ববিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব অনুসাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছিল যে, এই আইনেব সঙ্গে অসহযোগ করিতে হইবে। ইহার অল্প দিন পবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিব কার্য্যকবী সভা স্থিব কবেন যে, সত্য-সত্য বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যাহা স্থিবীকৃত হয, তাহা কার্য্যে পরিণত কবা কার্য্যকবী সমিতিব উচিত। কাজেই তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা বরিশাল সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন বলা চলে না। বরং অন্যায় কবিয়াছিলেন বলাই সঙ্গত। এখানে বলা আবশ্যক মনে করি যে, শাসমল বরিশাল সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন বর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তিনি অসুস্থতা-নিবন্ধন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয়, যেন শাসমল মহাশয়ের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়াই কার্য্যকরী সভা ববিশাল সম্মেলনের প্রস্তাব বাতিল করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও সেই সঙ্গে বাংলার অন্যান্য জেলাবাসী কেহই তখন মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনে পোষকতা করেন নাই। তখন বোধ হয় তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে আইন মেদিনীপুরের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর তাহা বাংলার অন্যান্য জেলার পক্ষে শুভকর, অথবা ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ এক প্রকার আইন অমান্য এবং আইন অমান্য করিলে বা আইন অমান্যের পোষকতা করিলে অচিরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর বৃটিশ সরকারের চণ্ডনীতি আসিয়া পড়িবে—কাজেই তাহার যন্ত্রণাদায়ক ফল ভোগ করিতে যাইব কেন, অথবা মেদিনীপুরে

ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন সফল হইলে সেই অন্দোলনের নেতাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান করিয়া দিতে হইবে, কাজেই আন্দোলনের পোষকতা করিয়া লাভ নাই, অথবা আইন অমান্য আন্দোলনের পরীক্ষা (অর্থাৎ আইন অমান্যের জন্য অত্যাচারের বন্যা) মেদিনীপুরের নিরীহ সরলপ্রাণ কৃষককুলের উপর দিয়াই বহিয়া যাক্, আর আমরা খবরের কাগজের মারফৎ কালের খেলা দেখি। মেদিনীপুরের কৃষককুল যে নির্ভীক, প্রকৃত স্বাধীনতাকামী এবং তাহারা যে পরাধীনতা, কপটতা, ভণ্ডামির নামে লজ্জা পায় এবং স্বাধীনতাব নামে আত্মাহুতি দিতে অম্লান-বদনে অগ্রসর হয় তাহা তাঁহাদের বোধ হয় জানা ছিল না। আর জানিলেই বা কি হয়,—হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ফাঁকিবাজী মনোবৃত্তি না থাকিলে বাংলা মায়ের এমন শোচনীয় দুরবস্থা কেন।

বাঙ্গালী মনের দীন মানসিক অর্থনীতিই বাংলার প্রকাশ-প্রকৃতিকে শুধুই ক্ষুণ্ণ করে নাই, তাহাকে সংঘাতাপন্ন কবিয়াছে। সুতরা সংঘাতাপন্ন মূর্চ্ছা-রোগীদিগকে লইয়া তাহাদের ভাব-বিহ্বলতায় ইন্ধনদানে গুটিকতক ভাব-বিলাসীর পক্ষে নেতৃত্ব করা অঘটনীয় হয় নাই। সেই মূর্চ্ছাক্রান্তির উপসর্গ-নিদানে এখনও সমাজ-নিয়ম-তান্ত্রিকতাব অর্থ-নৈতিক সংঘাতের কথা ধরা পড়িল না। আব ধবা পড়িল না যে, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ-মন কেমন করিয়া গণসংযোগ-শক্তিকে হবণ কবিতেছে।

এই অবস্থায় জেলাবাসীর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে দেশপ্রাণ শাসমলকে একাকী মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিবোধ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তিনি সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ড দেশেব পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—জন-সাধারণকে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, তাহাদেব বেদনা যেখানে গভীর, তাহা খাঁটি রাজনৈতিক হউক্ বা না হউক্, কংগ্রেসসেবীদিগকে সেই বেদনা দূর করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসসেবী যে প্রকৃতই জন-সাধারণেব সেবক ও বিপদের বন্ধু, তাহাদের মধ্যে সেই ধারণা বদ্ধমূল কবিতে হইলে, যেখান দিয়া তাহাদের শোষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই শোষণের স্থানকে রোধ করিতে হইবে। এক কথায় স্থানীয় বিপদ, অসুবিধা, অত্যাচার ও শোষণ নিবারণের প্রতি কংগ্রেস-সেবী মনোযোগী না হইলে কংগ্রেসের নীতি জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে না, অন্ততঃ তাহাদের

অজ্ঞাত আত্মা আশা ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ তাহা করিবে না। বীরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের সুদক্ষ চালক ছিলেন। রাজনীতির এই গূঢ় তথ্য—দেশসেবার এই বৃহত্তর সত্য উপলব্ধি করিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হয় নাই। তিনি ক্ষিপ্রভাবে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

মেদিনীপুরবাসী কিছুতেই ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং সহস্র-সহস্র লোক প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিব না। জনমতের বিরুদ্ধে বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিভাগ মেদিনীপুরের কয়েকটী জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই অনতিবিলম্বে আন্দোলনের আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় বীরেন্দ্রনাথ কাঁথির তৎকালীন মহকুমা শাসক স্বর্গীয় জ্ঞানাঙ্কুর দের নিকট তাহার নিজের ইউনিয়ন বোর্ড কর না দেওয়ার অনুকূলে পাঁচ দফা যুক্তি দেখাইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৭৩ নং হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতাস্থিত তাঁহার বাসভবন হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রেরণ করেন :—

Sir,

I have the honour to inform you that I have decided not to pay any tax or rate under the Bengal Village Self-Government Act (Bengal Council Act 15 of 1919). It is desirable that the reasons, which have induced me to take this step, should be known to all parties concerned and hence I propose to place them before you as shortly as I can. But at the outset it must be understood clearly and definitely that I am writing this letter in my individual capacity and it has nothing to do with any public post that I hold or any public organization with which I may be connected.

Firstly, it is plain that the object of the Act is to modernize the Bengal village life by giving it a middling doze or what goes by the name of western civilization in this country. A careful perusal of only a few of the provisions of the act will establish this proposition beyond a

shadow of doubt. In case, however, you feel it difficult to follow me, I shall request you to place yourself in the position of the person who drafted the bill. Was he or was he not thinking of the better municipal, sanitary and other arrangemets of the West, when he was drawing up its provisions ? The answer is so obvious that I need not state it in so many words at all.

Now, I consider it wholly improper and inexpedient that without first having the learning to assimilate properly the foreign ideals, we should be made to run headlong towards them through nothing else than an Act of the State. Please do not misunderstand me. I do not say that the municipal, sanitary and other arrangements of the West are by themselves bad and as such they should be discarded by us unconditionally. Nor do I suggest for a single moment that we should raise a Chinese wall between the East and the West. I have grown wiser by the teachings of our recent past history and I only want that all those parties, who are sincerely interested in the well-being of the people of this hapless land, should guard themselves against any doubtless future downfall of ours.

It will be remembered that towards the beginning of the last century, some leaders of Indian thought tried their very best to introduce a form of education in this country, which would not only keep us to the noblest of our ideals but also enable us to rightly assimilate the best of the West. And as a consequence of this endeavour, it will not be denied by any, that the present system of education was introduced in our schools and colleges about a century ago There can be no doubt that as a result, their have been many B. A 's and M. A.'s among us, as also a certain form of municipal, sanitary and other managements in our towns, but what is the net outcome of all those undertakings ? Our town life in general and the life of our so-called educated countrymen in particular, are the truest and most faithful pictures of a gigantic failure of a noble attempt so solemnly undertaken. We have neither been able to keep to our own

ideals, nor have we succeeded to assimilate rightly the ideals of the West. It is therefore imperative that every enactment, which is designed to develop Self-Government in this country, as is supposed to be the object of the Act in question, should be so framed that, first of all, it should make special provision to keep in tact the individuality of our old civilization and then pave a way for the acceptance of only those foreign ideals which will be beneficial to us but which won't make us lose our Racial Soul. Otherwise, in my humble opinion, it will be useless for us or anybody else to obtain political freedom for those who will have lost their Eastern souls and that Eastern spiritual autonomy which is the greatest of all our possessions.

But it is clear that the Act does not make any such provision, nor does it say that the Union Boards will be able to chalk out their own education policy and impart such moral, spiritual and special political training as are absolutely necessary for the retention of our Racial Soul. It follows, therefore, that the Act will take down to the remotest Bengal village that very type of Godless materialistic atmosphere which is so very much in evidence in the towns of this country now. The result is bound to be deplorable and disastrous. The outer artificialities and even comforts have a much greater attraction to the ordinary thoughtless individual than the inner development of the soul. By the process of time, the same kind and amount of discontent and distrust will appear in the villages as are now prevalent in the towns. I am therefore firmly of opinion that, if this Act, as it is, were allowed to remain in the Statute Book for a decade and a half, it will most assuredly complete the cultural conquest of this people, which originally began to work among us about 200 years ago.

I am aware, of course, that some of my so-called educated countrymen say that India has suffered through her religion and she would have got on better without it. There are even some Indian leaders who think that English institutions

are the standards by which our aspirations are set. I am not at all surprised that this is so, for it is their Godless literary education which is responsible for their opinion. Indeed, I hold they cannot think or act in any other way at all. "They have however learnt nothing from the recent events all over the world, which, like a flash of lightning, make clear the dangers amidst which men have walked in darkness for centuries". Moreover, I strongly believe that "every man and every race can only continue to truely live by being himself, by being itself, otherwise he or they are nothing". I therefore enter my emphatic protest against this open and wide-spread attempt to modernise our village social life which is already in a process of disintegration and which some of us are striving hard to build anew, and declare that in the present circumstances it is a question of principle with me to have anything to do with the Bengal Village Self-Government Act,

Secondly, as I have already pointed out, the Act is supposed to develop Self-Goverment in this country. As a matter of fact, the Act itself says that it is "an Act to—develop Self-Government in the rural areas of Bengal", Now, this is not the place, nor the time, to discuss even roughly the meaning of the word Self-Government, but I have always wonderd how it was possible for anybody to describe this Act as a "Village Self-Government act". It is an elementary knowledge that if Self-Government means anything, it means this that the representatives of the place where it is in vogue, have the right to spend all or at least a good portion of the income accruing to their State, according to their owu necessities and even ambitions, The English people are a Self-Governing nation, because their representatives have the right to spend all the incomes accruing to the State, according to their own ideas of necessities and even ambitions, with a paltry allowance to His Majesty the King. This Act in question is, however, a direct negation of Self-Government in its this essential particular, in as much as it has given no powers to the

Union Board to touch the existing income of the State within its own jurisdiction. It is well known that the Gevernment of this country derive from every Union in Bengal certain permanent income annually on certiain very important heads, such as land revenue, road cess, public works cess, court fees, excise and so on, and if all or a good portion of these incomes had been handed over to the Union Board for education, sanitation an other purposes without any restrictions or powers of interference that now abound the Act, it could then possibly have been said that it is Self-Government which the Act has given us. I do not care to know if at the present moment some or all of these are or are not Provincial heads; for I believe that the present system of Government must be changed root and branch and we should begin to work at the beginning of the ladder in the village unions, making then Self-Governing in the real sense of the word. For that purpose, there shall be originally no consideration for Provincial or Imperial heads of income. First of all, there shall be union heads, which shall go to the unions for the administration of their local needs. If there be any surplus or a surplus must be had on larger grounds, then there shall be, one by one, Subdivisional, District and Provincial heads and lastly will come the Imperial heads. But the whole spirit of the Act behind its scenes is to 'civilize' the village folk of Bengal at their own personal expense by an Act of the Local Legislature, and as such it ought to have been named the Bengal Village Civilizing Act. It has arrogantly assumed the suggestion that unless we become modernized in certain directions and learn the art of Self-Government by tiny little bits, we cannot possibly get Swaraj for ourselves. I protest against this wrong and unjust assumption and declare that, as this Act has given us no Self-Government and as it therefore cannot possibly give us lessons in that divine art which is supposed to be the monopoly of some people, I shall not pay any tax that may be inposed upon me under its provisions and take its consequence whatever they may be.

Thirdly, I believe this so-called Village Self-Government Act is sure to affect the Permanent Settlement of this Province to a great extent. The Act says that the rate to be imosed shall be an assesment according to the circumstances and the property of the persons liable to the same. Now, I know for certatn that you have directed some of of the Union Boards of Ramnagore to calculate the assessment upon an income of Rs. 8/-a bigha. I am also aware that some of the Union Boards of Ramnagore and Contai have calculated their assessments upon that basis. It means this, if it means anything at all, that a fresh taxation is being indirectly imposed upon the permanently settled lands of Bengal, which must forever remain immune from fresh taxation of any kind, according to the provisions of Regulation I of 1793. I have heard it argued that this is called a rate and that is rent, and therefote there is no room for confusing the two. I shall ask those who are unable to understand this simple thing to go to the very subject matter of both the rate and the rent and find out if it is not the one and the same thing. It does not matter by what name you take the money from me now, for your demand is based upon my income from the permanently settled lands. And therefore you are not only directly taxing my agricultural income but also indirectly putting a fresh tax upon the lands permanently settled. I believe further that when the time for the realization of the maximum union rate will arrive, it will be found that our land taxes have in all been increased by 25 to 50 per cent. This is and will be in direct violation of the existing provision of law on the subject and therefore my another reason why I cannot have anything to do with the Bengal Self-Government Act.

Fourthly, while the din of European battles is still ringing in our ears with the consequent rise in price of several commodities of daily use, it is actually inviting unrest, some would call something else of Russia, to ask the people at large to pay fresh taxes. There has been a deficit of

20 crores in the Imperial Government and they have already increased postal rates, prices of matches and umbrellas, and rates on cloth and railways. Our Provincial Government being short of 2 crores of rupees, with grim determination to waste lacs on Midnapur Partition because lacs have already been wasted, are also bound to propose fresh taxation upon us sooner or later. The Ministers, I hear, are also without funds for the execution of what they say their nation-building projects, which again means that they are also coming to the people for money for the success of their schemes, if not also to justify their existence as Ministers. And to top all these things, so far as the particular Sub-Division of Contai is concerned, you have notified the intention of the Government to tax salt as before from the 1st. of October next—salt, which affects the humblest in India at every meal. Is this, then. the proper time to ask people to pay fresh taxes for becoming more 'civilized' or even for the mere learning of the art of Self-Government? So far as Ramnagore is concerned, it is the poorest thana in your Sub-Division and you yourself told me that it was against your wishes that the Bengal Self-Government Act has been extended there. It has been, however, a surprise to me that its unions which were directly under water last year, according to your own personal knowledge, have attracked your greatest attention in this respect. I don't know who is responsible fot this state of affairs in Ramnagore, but your District Magistrate and Divisional Commissioner must have been aware that a considerable portion of this thana was flooded last year and those that suffered from the same have hardly yet recovered from the effects thereof.

I know it has been the fashion now-a-days to declare that only the rich will be taxed under this Act, which, you told me, is your injunction to the Union Boards in your Sub-Division; but has anybody taken the trouble to read the Act on this point? Only those persons who are too poor to pay half an anna a month shall be exempted, and

all others are bound to come under the throes of this legislative anvil. Besides, it is the rich who now constitute the Union Boards all throughout the country and it is they who have been called upon to govern the poor by imposing fresh taxation upon themselves. Firstly, you cannot in law interfere with any resolution that the rich may pass regarding taxation upon the poor, as long as they keep themselves within its bounds; and secondly, even if it were possible, they will realize the whole amount of their new taxes from the poor as usual. They will increase their rates of interest on money and paddy and realize the whole amount of their new taxation from their poor debtors, as they now realize the whole amount of their income tax from them; they may even lower the rate of wages to the labourers on pain of increase in their taxation.

Then, there is the eternal truth staring at our face that your Act will ultimately make living still dearer in the villages. With town-planning in every village, brick-built privies anb sweepers and burning ghats and burial grounds everywhere, and without free elementary education, the demand for which is increasing every day, the prospects of village revolution are brighter indeed. Under these circumstances, I am indeed at times tempted to think that there might be some officials who are desirous of creating violence in the country throuth the operation of this Act. I hope, however, that my apprehensions are entirely unfounded. But the fact remains that inspite of our earnest efforts to keep people non-violent, houses of members of the Union Boards have been burnt. and criminal cases connected with the Union Boards are already cropping up in theTamluk and Ghatal Sub-Divisions of Midnapur. I only trust that you and the like officers have kept the higher authorities regularly informed of what is really going on in the villages now. I have recently visited the remotest villages of my district, specially of Contai and Tamluk, and I may say unhesitatingly that this Act has created the greatest amount of unrest that we ever heard of in recent

years. Members of Union Boards have resigned their posts by numbers, although none has yet accepted their resignations, but on the contrary some have chastized some of them privately ; and numberless petitions by the villagers to the Sub-Divisional officers, District Magistracte and District Board have produced no effect. It is, however, clear from secs. 1 (3), 3 and 58 of the Act in question that it was never intended that it should be thrust upon any unwilling people, consistently perhaps with the present day principle of selt-determination ; but I may assure you and all your higher officers that this is exactly what you all are doing now in my district. I solemnly protest against this policy, which is steadily drifting people to exasperation, and declare that, under such galling circumstances, I can not possibly have anything to do with the Bengal Village Self-Government Act.

Fifthly, I am convinced that the whole of the amounts that you have now proposed to raise under the Act will be completely wasted. I have been told that finding strong opposition to the extension of the Act itself, you advised the Union Boards to raise but only a few hundred rupees this year, and I understand further that no Union Board has actually proposed more than about Rs. 600 as the amount of their new taxation. It may be that your connection with this low rate is a myth, but this low rate itself is a fact, for I have seen the Contai Union rates. Now I assert without any fear of contradiction that whoever might have been instrumental in lowering the rate, the money thus collected will most assuredly be insufficient to produce any impression in minds of the people. I know there are certain unions which consist of more than 50 villages, but I shall take an average union consisting of 20 villages only. Supposing this union of 20 villages has collected Rs. 600 under this Act, Rs. 30 will have to be allotted to each of the 20 villages for this year. This means that a village will get only Rs. 2-8 a month. And this huge sum of Rs. 2-8 must be considered sufficient for the

establishment of schools, construction of hospitals, improvement of sanitation and village roads in the village for one month.

I know you may say that the rate has to be increased, as in fact the Divisional Commissioner once suggested it for the purpose of producing "impressions"; but if that has to be done in future, why is it not done this year and now? It is true that the intention is to waste some money now in order that the people may take the bait in future? Be that as it may, the fact remains that, if anybody is determined to produce any effect upon the people through this legislative performance, he must increase the rate of taxation not only to its maximum standard but also if possible to something more than that. But the inevitable question that will then arise will be the capacity of the people to bear the burden. If you confine yourselves to the rich only, even when the maximum is to be reached, your amount will fall far too short of the demands of the village, for you can't find more than a few rich only in a single village unit. And if you go to the poor for heavy taxation, you will be cruel and torturous to them. I am morally convinced that with the increase of taxation in the villages under this Act, you will most certainly impoverish the Bhadraloke middle class to an extent hitherto unknown. But it is the middle class which is the backbone of every society in the world. The cup of misery of our middle classes is, however, already full to the brim. They cannot already marry their daughters in time, nor can they educate their children properly. But it is they who will be the greatest sufferers under this Act in the long run, and I therefore feel that in the name of improvement you will all be deteriorating the country in its vital parts. I, therefore, enter my last protest against the same and say that I don't propose to pay any tax there-under.

In conclusion, I may add that I intend sending a copy of this letter to the highest authorities in the land.

অর্থাৎ

মহাশয়,

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন (১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫নং বেঙ্গল কাউনসিল য়্যাক্‌ট) অনুসারে কোন কর দিব না বলিয়া স্থির করিয়াছি। যে সকল কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি, সেগুলি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবগত করান বাঞ্ছনীয়; সেজন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেগুলি আপনার সমক্ষে উপস্থিত করার প্রস্তাব করিতেছি। কিন্তু প্রথমেই সুস্পষ্টরূপে ও নিশ্চিন্তভাবে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, আমি আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় এই পত্র লিখিতেছি এবং আমি যদি কোন জন-কল্যাণকর পদে অধিষ্ঠিত থাকি বা যদি কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকি তবে তাহার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

প্রথমতঃ, ইহা সুস্পষ্ট যে, আইনটির উদ্দেশ্য হইল এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে যাহা চলে তাহার কিঞ্চিৎ দিয়া বাংলার পল্লীজীবনকে আধুনিকভাবাপন্ন করিয়া তোলা। আইনটির মাত্র কয়েকটি ধারা একটু ভালভাবে পাঠ করিলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক, যদি আপনি আমার কথা বুঝিয়া লইতে অসুবিধা বোধ করেন, তবে যিনি বিলটির খসড়া রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার আসনে নিজেকে বসাইয়া আমার কথা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। যখন তিনি আইনের ধারাগুলি রচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্টতর মিউনিসিপ্যাল, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা খেলা করিতেছিল কি না? এই প্রশ্নের জবাব এত স্পষ্ট যে, অধিক কথায় তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রথমে বিদেশী আদর্শ ঠিকভাবে হজম করিবার শিক্ষা না পাইয়া অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়—কেবলমাত্র রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে সেই আদর্শের দিকে নত মস্তকে ছুটিতে বাধ্য হইব ইহা বর্ত্তমানে আমি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ভুল বুঝিবেন না। পাশ্চাত্যের মিউনিসিপ্যাল, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা মন্দ এবং সেই কারণে সেগুলি আমাদের বিনা সর্ত্তে বর্জ্জন করা উচিত এমন কথা আমি বলিতেছি না। আমি মুহূর্ত্তের জন্য একথাও বলিতে চাই না যে, প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আমাদের চীনের প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা উচিত। আমাদের সাম্প্রতিক অতীত ইতিহাসের শিক্ষায় আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি শুধু এইটুকু চাই যে, যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসীদের কল্যাণসাধন বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহী, তাঁহারা যেন আমাদের নিঃসন্দেহ ভবিষ্যৎ অধঃপতন সম্পর্কে নিজেদিগকে বাঁচাইয়া চলেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েক জন ভারতীয় চিন্তানায়ক এদেশে এমন এক ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাব ফলে আমরা শুধু যে আমাদের মহত্তম আদর্শভ্রষ্ট হইব না তাহা নয়, আমরা পাশ্চাত্যের যাহা কিছু উত্তম তাহা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। এই প্রচেষ্টাব ফলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের স্কুল-কলেজে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাহার ফলে আমাদের মধ্যে অনেক বি এ ও এম. এ পাশ-করা লোক দেখা যাইতেছে এবং আমাদেব সহরগুলিতে এক ধরণেব মিউনিসিপ্যাল, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টার মোট ফল কি দাঁড়াইয়াছে? সাধারণভাবে আমাদের নগর-জীবন এবং বিশেষভাবে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসীর জীবন এত পবিত্রভাবে আরব্ধ সেই প্রচেষ্টার বিপুল ব্যর্থতার যথার্থ চিত্র। আমরা আমাদের আদর্শ রক্ষা করিতে বা পাশ্চাত্যের আদর্শ ঠিকভাবে হজম করতে পারি নাই। কাজেই এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যে সকল আইন করা হইবে—আলোচ্য আইনটির উদ্দেশ্য বলিয়া যেমন ধরা হইয়াছে—সেগুলি এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যেন প্রথমতঃ তাহাতে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এবং যে সকল বিদেশী আদর্শ আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে অথচ যাহাতে আমাদিগকে আমাদের জাতিগত আত্মা হারাইতে হইবে না সেগুলি গ্রহণের পথ পরিচ্ছন্ন হয়। নতুবা আমার ধারণায়, যে সকল লোক প্রাচ্য আত্মা ও আমাদের সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিক স্বায়ত্ত-শাসন হারাইয়া বসিবে, তাহাদের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা আমাদের পক্ষে বা অন্য যে-কোন লোকের পক্ষে অসার হইবে।

কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, আইনটিতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই, অথবা ইহার দ্বারা এমন কথা বুঝায় না যে, ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তাহাদের নিজেদের শিক্ষানীতি স্থির করিবে এবং আমাদের জাতিগত আত্মার রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক শিক্ষা দান করিবে। কাজেই বুঝা যায় যে, এখন এদেশের সহরগুলিতে যে ধরণের নিরীশ্বর বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়া খুব বেশী মাত্রায় দেখা যাইতেছে, সেই ধরণের আবহাওয়াই এই আইনের বলে বাংলার দূরতম পল্লীতে গিয়া পৌছিবে। ইহার ফল নিশ্চিতই শোচনীয় ও ভয়াবহ হইবে। সাধারণ নির্ব্বোধ লোকের নিকট আত্মার গূঢ় উন্নয়নের তুলনায় বাহ্যিক নানাবিধ কৃত্রিমতা এমন কি সাচ্ছন্দ্যেরই আকর্ষণ অধিক। সহরাঞ্চলে এখন যে প্রকার ও যে পরিমাণ অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়াছে, কালক্রমে সেই প্রকার ও সেই পরিমাণ অসন্তোষ ও অবিশ্বাস পল্লী অঞ্চলে দেখা দিবে। সেজন্য আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, যদি এই আইনটি, যেমন আছে তেমনি-ভাবে, পনর বৎসর বিধি-পুস্তকে থাকে, তাহা হইলে, এই জাতির যে সাংস্কৃতিক বিজয়-প্রচেষ্টা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতই সম্পূর্ণ হইবে।

আমি জানি—আমাদের দেশের তথাকথিত কোন-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ভারত তাহার ধর্ম্মের জন্যই বহু কষ্ট পাইয়াছে। ধর্ম্ম ছাড়াই তাহার দিন ভালভাবে কাটিবে। এমন কি, কোন-কোন ভারতীয় নেতা একথাও মনে করেন যে, ইংরেজী বিধিব্যবস্থাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্দ্ধারণের মান। আমি ইহাতে আদৌ বিস্ময় বোধ করি না। কারণ নিরীশ্বর পুঁথিগত বিদ্যালাভের ফলেই তাহাদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। বাস্তবিকই আমি মনে করি, তাহারা অন্য কোন প্রকারেই চিন্তা বা কাজ করিতে পারে না। মানুষ শত-শত বৎসর ধরিয়া যে-সব বিপদের মধ্যে অন্ধকারে বিচরণ করিয়াছে, বিদ্যুতালোকের মত বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহারা সেই সব ঘটনা হইতে কিছুই শিক্ষা করে নাই। অধিকন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জাতি নিজে নিজেই ঠিকভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, নতুবা তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। আমাদের পল্লীগত যে সমাজ-জীবন পূর্ব্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং যাহা আমাদের কেহ-কেহ নূতনভাবে

গড়িয়া তুলিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতেছেন তাহা আধুনিকী-করণের এই প্রকাশ্য ও ব্যাপক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের সহিত সম্পর্ক রাখা যে আমার পক্ষে একটা নীতির প্রশ্ন তাহাও আমি ঘোষণা করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই আইনটির দ্বারা এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ আইনটিতে বলা হইয়াছে যে, "বাংলার পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য এই আইনের সৃষ্টি।" 'স্বায়ত্ত শাসন' কথাটির যথার্থ অর্থ কি তাহা মোটামুটিভাবেও আলোচনা করার স্থান ও সময় এখানে ও এখন নয়। কিন্তু কি করিয়া এই আইনটিকে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন বলা সম্ভব হইল তাহা ভাবিয়া সকল সময়ই বিস্মিত হইয়াছি। ইহা সাধারণ কথা যে, যদি স্বায়ত্ত শাসন বলিতে কিছু বুঝায় তবে তাহা এই যে, যে-স্থানে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত আছে সেইস্থানের প্রতিনিধিগণ তাহাদের রাষ্ট্রের প্রাপ্য আয়ের সবটা বা অন্ততঃ বেশী পবিমাণ নিজ-নিজ প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ব্যয় করিবাব অধিকার পায়। ইংরেজগণ স্বায়ত্ত-শাসনশীল জাতি। কারণ তাহাদের প্রতিনিধিগণ তাহাদের রাজাকে সামান্য ভাতা দিয়া রাষ্ট্রের আয়ের সবটা নিজেদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ব্যয় করিতে পারে। আলোচ্য আইনটিতে এই অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত শাসনকে সরাসরি অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ ইউনিয়ন বোর্ডকে ইহার এলাকা মধ্যস্থিত রাষ্ট্রের বর্ত্তমান আয় স্পর্শ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ইহা সকলেই জানেন যে, এদেশের সরকার ভূমি-রাজস্ব, পথকর, পূর্ত্তকর, কোর্ট ফি প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বৎসবে একটা স্থায়ী রকমের আয় বাংলার প্রতি ইউনিয়ন হইতে পান। যদি সব আয় বা উহার একটা মোটা রকমের অংশ ইউনিয়ন বোর্ডকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য বিনা বাধায় বা আইনে এখন হস্তক্ষেপের যে ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রাখা হইয়াছে তাহা না রাখিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বলা যাইতে পারিত যে, উহা আইনটি প্রদত্ত স্বায়ত্ত শাসন। বর্ত্তমানে এই খাতগুলির কতকগুলি বা সবগুলি প্রাদেশিক খাত কিনা তাহা জানিতে চাহি না, কারণ আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে এবং স্বায়ত্ত

শাসনশীল কথার ঠিক অর্থে পল্লী ইউনিয়নগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনশীল করিয়া উত্থান সিঁড়ির গোড়ায় কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে মূলতঃ আয়ের প্রাদেশিক খাত বা রাজকীয় খাত বলিয়া কিছু বিবেচনা করা হইবে না। প্রথমতঃ, কয়েকটি ইউনিয়ন-খাত থাকিবে—যে সকল খাতের আয় ইউনিয়নগুলির স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সেগুলির হাতে দেওয়া হইবে। যদি অর্থ উদ্বৃত্ত হয়—ব্যাপকতর কারণে কিছু অর্থ অবশ্য উদ্বৃত্ত করিতে হইবে—তবে একে একে মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক খাত ও শেষে রাজকীয় খাত থাকিবে। কিন্তু আইনটির বাহ্যিক দৃশ্যাবলীর পশ্চাতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য হইল বাংলার পল্লীবাসীদিগকে স্থানীয় আইন সভার আইনের দ্বারা তাহাদেরই ব্যক্তিগত ব্যয়ে সভ্য করিয়া তোলা এবং সেই কারণে ইহার নামকরণ হওয়া উচিত ছিল বঙ্গীয় পল্লী-সভ্যীকরণ আইন। এই আইনে ঔদ্ধত্য সহকারে এই কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমরা যদি কোন-কোন বিষয়ে আধুনিক হইয়া না উঠি এবং কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ স্বায়ত্ত-শাসনের কৌশল শিক্ষা না করি, তবে আমরা সম্ভবতঃ নিজেদের জন্য স্বরাজ পাইব না। আমি এই অন্যায় ও অসঙ্গত ধারণার প্রতিবাদ করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, এই আইনে আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হয় নাই বলিয়া এবং সেই কারণে ইহা কতকগুলি লোকের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া অনুমিত সেই স্বর্গীয় কৌশলের শিক্ষা দিতে পারে না বলিয়া ইহার বিভিন্ন ধারা অনুসারে ধার্য্য কোন প্রকাব কর আদায় দিব না এবং এই কাজের ফল যাহাই হউক না কেন, তাহা বরণ করিব।

তৃতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস—এই তথাকথিত গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের দ্বারা নিশ্চিতই এই প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু পরিমাণে ব্যাহত হইবে। আইনে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হইবে তাহার অবস্থা ও সম্পদের কথা বিবেচনা করিয়া করের হার স্থির করা হইবে। আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনি রামনগরের (কাঁথি মহকুমার একটি থানা) কোন-কোন ইউনিয়ন-বোর্ডকে বিঘা প্রতি আট টাকা হিসাবে আয় ধরিয়া বোর্ডের কর নির্দ্ধারণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমি আরও অবগত আছি যে, রামনগর ও কাঁথির কোন-কোন ইউনিয়ন বোর্ড ঐ ভিত্তিতে সম্পদের মূল্যের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। যদি ইহার আদৌ কিছু অর্থ থাকে, তবে তাহা হইল বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিতে পরোক্ষভাবে

নূতন কর ধার্য্য করা হইতেছে অথচ ঐ জমি ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশন অনুসারে নূতন কর ধার্য্য হইতে অবশ্যই বরাবর মুক্ত থাকিবে। এইরূপ বলাবলি করিতে শুনিয়াছি যে, ইহাকে বলা হয় কর, আর উহাকে বলা হয় খাজনা, কাজেই উভয়ের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিবার অবকাশ নাই। যাঁহারা এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে কর ও খাজনা উভয়েরই বিষয়-বস্তুটার অর্থ উপলব্ধি করিতে এবং উভয়ই এক ও অভিন্ন কিনা তাহা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। এখন আপনারা আমার নিকট হইতে কোন্ নামে টাকা লইতেছেন তাহাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমি হইতে আমার যে আয় হয় তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া আপনাদের দাবী। কাজেই আপনারা শুধু যে প্রত্যক্ষ-ভাবে আমার কৃষি-আয়ের উপব কর ধার্য্য করিতেছেন তাহা নয়, আপনারা পরোক্ষভাবেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমির উপর নূতন কর ধার্য্য করিতেছেন। আমার আরও বিশ্বাস যে, যখন ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ কর আদায়ের সময় আসিবে, তখন দেখা যাইবে যে, আমাদের জমির কর সর্ব্ব-সাকুল্যে শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে জমি বিষয়ে প্রচলিত আইন প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করা হইতেছে এবং হইবে। এবং ইহা বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের সহিত আমার সম্পর্ক না রাখার অন্যতম কারণ।

চতুর্থতঃ, যখন ইউরোপের যুদ্ধের (প্রথম মহাসমরের) কোলাহল এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে এবং যুদ্ধের ফলে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য্য কতকগুলি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন জনগণকে নূতন কর দিতে বলায় প্রকৃত পক্ষে অশান্তি ডাকিয়া আনা হইতেছে। রাশিয়ার সম্বন্ধে বলিতে গেলে কেহ কেহ অশান্তির পরিবর্ত্তে অন্য ভাষা ব্যবহার করিবেন। রাজকীয় সরকারে ২০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই ডাক মাশুলের হার, দিয়াশালাই ও ছাতার দাম, কাপড়ের শুল্ক এবং রেলওয়ের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের প্রাদেশিক সরকার মেদিনীপুর বিভাগ লইয়া ইতিমধ্যে যে লক্ষ-লক্ষ টাকা বাজে খরচ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা ঐ ব্যাপারে লক্ষ-লক্ষ টাকা বৃথা ব্যয় করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই অবস্থায় তাঁহাদের যখন দুই কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে, তখন তাঁহারা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বে হউক, নূতন কর স্থাপনের

প্রস্তাব করিতে বাধ্য। মন্ত্রীমহাশয়গণ যাহাকে তাঁহাদের জাতি গঠনের পরিকল্পনা বলেন তাহা রূপায়ণের মত টাকা তাঁহাদের হাতে নাই বলিয়া শুনিয়াছি—ইহার অর্থ তাঁহারাও তাঁহাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের নিকট আসিতেছেন। এই বিশেষ কাঁথি মহকুমার দিক দিয়া সর্ব্বোপরি এক কথা বলা যায় যে, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে পূর্ব্ববৎ লবণের উপর কর ধার্য্যের জন্য সরকারের অভিপ্রায় আপনি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ভারতের দীনতম লোকেরও দুই বেলা খাওয়ার সময় লবণের প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে অধিকতর 'সভ্য' হইবার জন্য বা স্বায়ত্ত শাসনের কৌশল শুধু শিখিবার জন্যই কি জনগণকে নূতন কর দিতে বলার ইহাই উপযুক্ত সময়? রামনগর থানা সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই থানা আপনার মহকুমার মধ্যে সব চেয়ে দরিদ্র। আপনি নিজেই আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেখানে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞানমতে এই থানার যে-সকল ইউনিয়নে গত বৎসর বন্যা হইয়াছিল, সেই সকল ইউনিয়নেই এই বিষয়ে আপনার মনোযোগ সব চেয়ে বেশী পড়িয়াছে। রামনগরে এই অবস্থা কে ঘটাইল জানি না। কিন্তু আপনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার নিশ্চিতই জানিয়া থাকিবেন যে, গত বৎসর এই থানার অনেকাংশে বন্যা হইয়াছিল এবং বন্যায় যাহাদের ক্ষতি হইয়াছিল তাহারা এখনও উহার আঘাত সামলাইয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ।

এই আইন অনুসারে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের উপর কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া প্রচার করা আজকাল একটা রীতি (ফ্যাসন) হইয়া দাঁড়াইয়াছে জানি। আপনার মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে আপনি ঐরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমাকে আপনি বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কি এই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইনটি পাঠ করিয়াছেন? যে সকল ব্যক্তির মাসে দুই পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নাই কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য হইবে না। বাকী সকলেই এই আইনের যাঁতাকলে পড়িবেন। তাহা ছাড়া এখন ধনী ব্যক্তিরাই দেশের সর্ব্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকেই নিজেদের উপর নূতন কর স্থাপন করিয়া গরীব ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, যতদিন ধনী ব্যক্তিগণ

আইন মানিয়া চলিবেন ততদিন তাঁহারা দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর কর ধার্য্য সম্পর্কে যে প্রস্তাবই পাশ করুন না কেন, তাহাতে আপনি আইনতঃ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; দ্বিতীয়তঃ যদি তাহা সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা বরাবরের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের নূতন করের সবটা আদায় করিবেন। তাঁহারা টাকা ও ধানের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করিবেন এবং এখন তাঁহারা যেমন দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহাদের আয়করের সবটা আদায় করিয়া লইয়া থাকেন, তেমনি তাঁহাদের দরিদ্র দেনীদের নিকট হইতে তাঁহাদের নূতন করের সবটা আদায় করিবেন। এমন কি, তাঁহারা করবৃদ্ধির উপবেও শ্রমিকদের মজুরীর হার হ্রাস করিয়া দিতেও পারেন।

তারপর সেই চিরন্তন সত্য আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে যে, আপনাদের আইনটি শেষ পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলে জীবনধারণ আবও ব্যয়বহুল করিয়া তুলিবে। প্রতি পল্লীতে সহর গঠনের পরিকল্পনা, পাকা পায়খানা নির্মাণ, ঝাড়ুদারের ব্যবস্থা, শ্মশানঘাট ও গোরস্থানের ব্যবস্থা অথচ প্রতিদিন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তাহার ব্যবস্থা না করায় পল্লী-বিপ্লবেব সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় সময়-সময় আমার মনে হয় যে, কোন-কোন অফিসার এই আইনটি প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে এদেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক থাকিতেও পারেন। আমার ভরসা আছে আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু যথার্থ ঘটনা হইল জনগণকে অহিংস রাখার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের কয়েকজন সদস্যের গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও ঘাটাল মহকুমায় ইতিমধ্যেই ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। আমার একমাত্র বিশ্বাস আছে যে, আপনি ও আপনাব মত অফিসারগণ বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলে বাস্তবিক পক্ষে যাহা ঘটিতেছে তাহা নিয়মিতভাবে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া রাখিয়াছেন। আমি সম্প্রতি আমার জেলার বিশেষতঃ কাঁথি ও তমলুক মহকুমার সুদূরবর্ত্তী পল্লীগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই আইন এত বেশী অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে যে, সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরের মধ্যে তেমন অশান্তির কথা শুনি নাই। অনেক ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য দলে-দলে সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। কেহ-কেহ এখনও তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নাই বটে, তবে পক্ষান্তরে কেহ-কেহ তাঁহাদিগের কাহাকেও কাহাকেও গোপনে

শাস্তি দিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ মহকুমা শাসক, জেলা শাসক ও জেলাবোর্ডের নিকট অসংখ্য দরখাস্ত দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। আলোচ্য *আইনটির ১ (৩), ৩, ও ৫৮নং ধারা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার বর্ত্তমান নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোন অনিচ্ছুক লোকের উপর* উহা জোরপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়ার কখনও ইচ্ছা করা হয় নাই। কিন্তু আমি আপনাকে এবং আপনার উচ্চতর অফিসারদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, আপনারা সকলে এখন আমাদের জেলায় আইনটি জোর-পূর্ব্বকই চাপাইয়া দিতেছেন। আমি পবিত্র মনে এই নীতির প্রতিবাদ করিতেছি। এই নীতি ধীরে-ধীরে দেশবাসীকে উত্তেজনার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই সঙ্গে আমি বলিতেছি যে, এই বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে আমি বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারি না।

পঞ্চমতঃ, আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, আপনি আইনানুসারে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সবটাই সম্পূর্ণরূপে বৃথা ব্যয়িত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, আইন প্রচলনে প্রবল বিরোধিতা দেখিয়া আপনি বর্ত্তমান বৎসরে মাত্র কয়েক শত টাকা আদায় করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি যে, কোন ইউনিয়ন বোর্ডই ঠিক-ঠিক তাহাদের নূতন কর হিসাবে ৬০০ টাকার বেশী সংগ্রহের প্রস্তাব করে নাই। হইতে পারে যে, এইরূপ নিম্ন হারের সহিত আপনার সম্পর্ক পৌরাণিক ঘটনা। এই নিম্নহার অসত্য নহে। কারণ আমি কাঁথি ইউনিয়নের হার দেখিয়াছি। এখন আমি কোন প্রকার অসঙ্গতির আশঙ্কা না করিয়া বলিতেছি যে, যাহারই চেষ্টায় করের হার হ্রাস হউক না কেন, এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ দেশবাসীর মনে কোন প্রকার সুধারণা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। জানি, কোন-কোন ইউনিয়নে ৫০টিরও বেশী গ্রাম আছে। কিন্তু আমি গড়ে প্রতি ইউনিয়নে ২০টি গ্রাম আছে ধরিব। ধরুন এই আইন অনুসারে ২০টি গ্রামবিশিষ্ট ইউনিয়নে ৬০০ টাকা সংগৃহীত হইল। বর্ত্তমান বৎসরে ২০টি গ্রামের প্রত্যেকটির জন্য ৩০ টাকা করিয়া বরাদ্দ করিতে হইবে। ইহার অর্থ প্রতি গ্রাম মাসে মাত্র আড়াই টাকা পাইবে। এই বিরাট পরিমাণ আড়াই টাকাকে বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পল্লীপথ নির্ম্মাণের পক্ষে এক মাসের জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে।

করের হার বৃদ্ধি করা হইবে একথা আপনি বলিতে পারেন জানি। কারণ বস্তুতঃ বিভাগীয় কমিশনার সুধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য একবার একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে তাহাই করিতে হয়, তবে এই বৎসর এবং এখনই তাহা করা হয় না কেন? ইহা কি সত্য যে, লোকে ভবিষ্যতে যাহাতে লোভাতুর হইয়া টোপটি গিলিতে পারে সেজন্য কিছু অর্থ বাজে ব্যয় করার ইচ্ছা আছে? যাহা হউক, আসল কথা হইল যদি কেহ এই আইন প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশবাসীর উপর সুফল উৎপাদন করিতে সংকল্পবদ্ধ থাকেন, তবে তাঁহাকে যে শুধু সর্ব্বোচ্চ সীমা পর্য্যন্ত কর-হার বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা নয়, অধিকন্তু সম্ভব হইলে তাহাকে তাহার উপরেও যাইতে হইবে। দেশবাসীর কর বহনের কতটা ক্ষমতা আছে তাহাই হইবে তখন অনিবার্য্য প্রশ্ন। এমন কি, যখন সর্ব্বোচ্চ সীমা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করিতে হইবে তখন যদি আপনি কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের উপর কর ধার্য্য করেন, তবে সংগৃহীত অর্থ পল্লীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হইবে। কারণ আপনি এক-এক গ্রামে বেশী সংখ্যক ধনী ব্যক্তি পাইবেন না। যদি আপনি বেশী কর বসাইবার জন্য দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট যান, তবে আপনি তাহাদের নিকটে নির্দ্দয় ও নিপীড়ক হইয়া দাড়াইবেন। আমি নৈতিক দিক দিয়া বিশ্বাস করি যে, এই আইন অনুসারে গ্রামে-গ্রামে কর-ভার বৃদ্ধি হইলে, ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এমনভাবে দরিদ্র হইয়া পড়িবে যাহা আমাদের এখনও অজ্ঞাত। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিশ্বে সকল সমাজের মেরুদণ্ড-বিশেষ। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখের পাত্র ইতিপূর্ব্বেই কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যথাসময়ে তাঁহাদের মেয়েদের বিবাহ দিতে পারেন না। তাহারা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদিগকে যথোচিত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁহারাই শেষ পর্য্যন্ত এই আইন অনুসারে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সেজন্য আমার মনে হয় উন্নয়নের নামে আপনারা দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধ্বংস করিতে থাকিবেন।

আমি এই আইন প্রচলনের বিরুদ্ধে শেষবারের মত আমার প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং ইহাও বলিতেছি যে, এই আইন অনুসারে কোন কর দেওয়ার আমার ইচ্ছা নাই।

পরিশেষে জানাইতে চাই যে, দেশের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট এই পত্রের এক একখানি অনুলিপি পাঠাইবার আমার ইচ্ছা আছে।

মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বীরেন্দ্রনাথের আপন ভাষায় এখানে বিবৃত করিতেছি।—[স্রোতের তৃণ (১৯২২ খৃষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ১৫]

"বামনগর থানায় কোন এক ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি তাঁর অধীন কয়েক জন করদাতার বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ ও গৃহ ভগ্ন করা ইত্যাদির দাবীতে ফৌজদারী আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। তাঁর উপর উপদ্রবের কারণ এই বলে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাঁর ইউনিয়নের অন্তর্গত ফতেপুর নামক একটি গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফতেপুর গ্রামের উল্লিখিত আসামিগণ ধর্ম্মঘট করে' সে ট্যাক্স তো আদায় দেয় নি। অধিকন্তু ফরিয়াদীর উপর উক্ত প্রকার অত্যাচার করেছে। বিচারে সাতজন আসামীর ১৫ দিন করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

"এখন, এই মোকদ্দমায় আসামিগণ আমাকে যেমন তাদের জমিদার বলে স্বীকার করতো, তেমনি এই মোকদ্দমার ফরিয়াদীও আমার একজন প্রজা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রায় বেরোবার পূর্ব্বে, এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও আমি জানতে পারি নি। কারণ এই সময় কিছু দিন আমি তমলুক মহকুমায় এবং কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলাম। যখন সাতজন ফতেপুরবাসীর এক পক্ষ করে কারাদণ্ডের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম আমি শুনেছিলাম তখন তাদের খালাস হতে বোধ হয় ছ'দিন বাকী ছিল। অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম, তারা এক মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কাঁথি জেল থেকে খালাস পাবে। ইউনিয়ন বোর্ডের নামে কাঁথি মহকুমায় তারাই সর্ব্বাগ্রে কারারুদ্ধ হয়েছিল বলে, তাদের খালাসের সময় কাঁথিতে একটি শোভাযাত্রা ও সেইদিন বৈকালে সেখানে একটি সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তৎপূর্ব্বে আমি যেখানেই থাকি না কেন সেই মঙ্গলবার ভোর ছটার সময় আমাকে কাঁথিতে উপস্থিত হয়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে—সেজন্য আমি অনেকের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। লাঞ্ছিতের সম্মান কাঁথিতে এই নূতন বলে আমি নিজেও সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করতে কম উদ্বিগ্ন ছিলাম না। পরিণামে সকলের আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করতে গিয়ে আমাকে যেমন বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল, তেমনি

কৌশলময়ের মহাকৌশলের নিকট মানবের সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধি যে নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর তাহাও সে ব্যাপারে অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম।

"যে মঙ্গলবার প্রাতে পক্ষান্তরে ফতেপুরের লাঞ্ছিতগণের খালাস হবার কথা ছিল, তার পূর্ব্ব শুক্রবারে আমি আমাদের "বীরকুলে"র কাছারী বাড়ীতে যাই। এই কাছারী বাড়ী থেকে ফতেপুর গ্রাম পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। শনিবাব সকালে আমি ফতেপুর গ্রামে গিয়া স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করেছিলাম এবং গ্রামের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে নানা কথাব আলোচনা হয়েছিল। আসামীদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের সঙ্গেও দেখা করে' বিস্তৃত বিবরণ অবগত হয়েছিলাম। ফবিয়াদীও কি জানি কেন সেই শনিবাব বৈকালে, আমাদের দুর্গাপুর হাটে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কবেছিলেন। তাঁকেও যে তখন আমি বহুলোকের সম্মুখে ঘটনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা কবি নি এমন নয়।

"আমি স্থির কবেছিলাম—রবিবাব দিন বিকালে আমাদের বীবকুল কাছাবী বাড়ী থেকে পাল্কী কবে কাঁথি বওনা হব এবং যত রাত্রি হোক্ সেই দিনই কাঁথি পৌঁছবো। কিন্তু রবিবার ভোর থেকে সোমবার বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এমন অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হতে থাকে যে তাব মধ্যে নরবাহনে কোন স্থানে যাত্রা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছিল। (এখানে বলা আবশ্যক মনে কবি যে, শাসমল অত্যন্ত স্থূল ছিলেন বলিয়া দীর্ঘ কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রমের জন্য পাল্কী দরকাব হইয়াছিল) আমাদের বীরকুল কাছাবী বাড়ী থেকে কাঁথি পর্য্যন্ত রাস্তা সুদীর্ঘ বাইশ মাইল। পরদিন মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় কিরূপে কাঁথিতে পৌঁছে শোভাযাত্রায় যোগদান করতে পারবো, সেই চিন্তায় আমি বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। অনেক কষ্টে বেহারাগণ প্রায় সাড়ে তিনটার সময় এসে বলে, তারা আমাকে সে-দিন কিছুতেই কাঁথি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না। তবে কাছারী বাড়ী থেকে প্রায় ১২ মাইল নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে দেউলির ডাক বাংলায় সে-দিন রাত্রে অবস্থান করবে এবং পরদিন মঙ্গলবার বেলা নটার সময় নিশ্চয়ই আমাকে কাঁথি পৌঁছে দেবে। আমার কিন্তু মঙ্গলবার সকাল ছ'টায় কাঁথিতে না পৌঁছলে চলবে না বলে আমি তা'দিগকে বলি যে, তারা আমাকে দেউলির ডাকবাংলায় সে-দিন সন্ধ্যায় পৌঁছে দিলে, আমি সেখান থেকে সঙ্গে-সঙ্গে

গরুর গাড়ী করে' কাঁথি রওনা হব এবং মঙ্গলবার সকাল ছ'টার পূর্ব্বে কাঁথি পৌঁছতে পারব।

"বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা দেউলি রওনা হই। পথিমধ্যে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় এবং প্রায় সিকি রাস্তা দু'দিনের বারিপাতে জলমগ্ন হওয়ায় বেহারাগণের দেউলি পৌঁছতে রাত্রি প্রায় ৮টা বেজে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গরুর গাড়ী না পাওয়ায় অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বেহারাগণ আমাকে আর দুই মাইল পথ নিয়ে গিয়ে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ইস্‌লামপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে কোনও ভদ্রলোক আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে আগে থেকে কিছু আহার্য্য ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁর ওখানে আহাবাদি কবে শয়নের উদ্যোগ করছি, এমন সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলাম যে, যে গরুর আশায় বেহারাগণকে এত কষ্ট দিয়ে দেউলি থেকে ইস্‌লামপুর পর্য্যন্ত এনেছিলাম সেই গরুর গাড়ী এত দুর্য্যোগে এখানেও পাওয়া যাবে না। এদিকে রাস্তার দুর্গতিতে বেহারাগণের দুর্গতি দেখে তা'দিগকে আর কোনও অনুরোধ করব না যেমন স্থির করেছিলাম, তেমনি পরদিন সকাল ছ'টায় যে করে হোক কাঁথিতে পৌঁছবো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করে' দেখলাম ভগবান-প্রদত্ত পৈতৃক দু'খানি শ্রীচরণ-কমল ব্যতীত সে কর্দ্দমাক্ত চারক্রোশব্যাপী পথ-সমুদ্রে আমার আব অন্য কোনও উপায় বা ভরসা ছিল না।

"কাজে কাজেই সঙ্গের জিনিষ-পত্রের বন্দোবস্ত করে দিয়ে, শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সহ রাত্রি আন্দাজ ২টাব সময় অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পদব্রজেই কাঁথি রওনা হয়েছিলাম। ইস্‌লামপুর থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রায় দেড় মাইল এসে পথিকগণকে পিছাবনীর খাল পেরোতে হয়। রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় যখন পিছাবনীর খালেব তীরে এসে আমরা উপস্থিত হই তখন দেখেছিলাম তাতে বন্যা হয়েছে এবং যে খাল সাধারণত চল্লিশ হাতের বেশী প্রশস্ত ছিল না, তাকে বন্যার জলে আজ প্রায় দেড়শ' হাত প্রশস্ত দেখাচ্ছে। তার উপর অনুসন্ধানে ইহাও অবগত হয়েছিলাম যে, পারাপারের নৌকাখানি ঘাটমাঝির অতি সাবধানতায় বন্যার স্রোতে আমাদিগের খেয়াঘাটে পৌঁছবার পূর্ব্বেই জলমগ্ন হয়েছিলেন। সংবাদ শুনে' স্বীকার করছি, মুহূর্ত্তের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কি জানি কেন

হঠাৎ মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছিল—লাঞ্ছিতের সম্মানের জন্য শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যাচ্ছি, তাতে এত বাধা পড়ছে কি জন্য? কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, পরদিন সকাল ছ'টার সময় যে করে হোক কাঁথিতে পৌছবো বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম, অতএব অনতিবিলম্বে স্থির করেছিলাম, সন্তরণের দ্বারাই বন্যাপ্লাবিত খাল অতিক্রম করবো। সহযাত্রী স্নেহের স্বেচ্ছাসেবকগণের তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না, বরং তাদের আগ্রহই পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাদিগকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'জন লোক ও একখানি নৌকা এনে আমাদিগকে পিছাবনী খালের পরপারে পৌছে দিয়েছিলেন।

"আমরা পুনরায় যখন কাঁথির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করি তখন আবার পিটপিট করে বৃষ্টি পডতে আরম্ভ করে। একে ত পল্লীগ্রামের সনাতন কাঁচা রাস্তার অবস্থা এদিকে নূতন মাটি ও দু'দিনের বৃষ্টির কৃপায় ভয়ঙ্কর আকাব ধারণ করেছিল। তাব উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে অনুভব করেছিলাম, বসুন্ধরা বুঝি সত্যই বায়ুশূন্যা হয়েছেন। শেষে কেবল পরণের ধুতি ব্যতীত অন্য সর্ব্ব-প্রকাবের আবরণ গবমে বাধ্য হয়ে শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলাম। যা হোক, কাঁথি পৌছতে যখন চার মাইল বাকী আছে এবং ভোর হতে যখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না, তখন কাঁথির দিক থেকে দু'জন পথিককে আমাদের দিকে আসতে দেখতে পাই। দূর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনামাত্রই কে যেন আমার কাণে কাণে বলে দিয়েছিল, এদেব ভিতর আমাদেব ফতেপুরের আসামী থাকলেও থাকতে পারে—এদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গী-দিগকে সে কাজ কবতে অনুবোধ করেছিলাম এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, হয়ত আমাদের শোভাযাত্রা ও সভার কথা জানতে পেরে রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রি থাকতেই তাদিগকে ছেড়ে দিয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ সন্দেহ কেন যে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল তা এক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারবেন না।

"এই দু'জন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সাতজন পুরুষ এক সঙ্গে আসছে দেখে তাদের একজনকে তাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে এবং পরে পরে

তার অন্য সহযাত্রিগণ আমাদের কাছে তাদের পরিচয় দিতে যথেষ্ট দ্বিধা বোধ করছে দেখে শেষে তাদের কাছেই প্রথম আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। তখন তারা আমাদের অত্যাবশ্যক ফতেপুরের আসামী বলেই কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে স্বীকার করেছিল এবং বলেছিল যে রাত্রি আন্দাজ দু'টার সময় জেলের একজন জমাদার তাদের ঘুম ভাঙিয়ে পথে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে এবং বলে দিয়েছে—তারা যেন পথে কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না বলে ভোর হবার পূর্ব্বেই পিছাবনীর খাল পার হয়ে যায়।

"এই আবিষ্কার ও সংবাদে, বলব কি, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার দুটি সংযুক্ত কর আমার অবনত মস্তকের দিকে আপনা হতেই উত্থিত হয়েছিল। গোপন প্রাণের নিভৃত কন্দরে আমার সত্যকার লোকটি চীৎকার করে বলে উঠেছিল—

'বুঝেছি হে দয়াময়! তোমার লীলা এতক্ষণে বুঝেছি, পাল্কীতে এলে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না বলে বারিবর্ষণে আমার পাল্কীতে আসা অসম্ভব করেছ। গরুর গাড়ীতে এলেও এদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বলে, তোমার পথের ভয়ে গরুর গাড়ীও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পদব্রজে ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে এলে এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না বলে পদব্রজেই আজ তুমি আমাকে তোমারই এক লীলাভূমির দিকে এইরূপে টেনে নিয়ে চলেছ।'

"ফতেপুরের সাতজন কয়েদ খালাসীকে সঙ্গে করে', যখন স্থানীয় জেলের ঘড়িতে ঠিক ছ'টা বেজেছিল, তখন আমি কাঁথি সহরের পোষ্ট অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাহাদিগকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি নাতিক্ষুদ্র শোভাযাত্রা গঠন এবং বিকেলে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়েছিল।"

ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ের জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ কাঁথিতে কয়েক জন বন্দুকধারী পুলিস আমদানি করিয়াছিলেন এবং কাঁথির প্রায় চার হাজার কর-দাতা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তার তিন চার গুণ মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি অসঙ্কোচে গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেই মাল বহিয়া আনিবার জন্য সমগ্র কাঁথি মহকুমায় যেমন কুলি, মজুর, গরুর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় নাই, তেমনি সে মালের কিয়দংশ প্রথমে দশ টাকা, পরে চার টাকা এবং শেষে এক টাকায় নিলাম খরিদ করিতে সমগ্র মেদিনীপুর

জেলায় একজনও খরিদ্দার পাওয়া যায় নাই। এই মাল ক্রোক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের লোকের হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দিয়া অনেক গরীব লোককে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে—দরিদ্র নিঃসম্বল বিধবা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ না দেওয়ার জন্য ট্যাক্স্ আদায়কারী পুলিসসহ তাহার বাড়ীতে মাল ক্রোক করিবার জন্য হানা দিয়াছে, আর সেই বিধবা পাতের ভাত ফেলিয়া একমাত্র সম্বল থালাখানি পর্য্যন্ত সগর্ব্বে ক্রোক্‌কারী পুলিস কর্ম্মচারীব সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে। মেদিনীপুরবাসীর সাহস, স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সহনশীলতার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার কথা। মেদিনী-পুরবাসীর উপর যে শাসমলের অসাধারণ প্রভাব তাহা দেশের সকলেরই, এমন কি, বিরুদ্ধ পক্ষেরও বুঝিতে বাকী রহিল না। বীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাবের উল্লেখ করিয়া একবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাকে মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথেব রাজার মত অর্থ ছিল না যে তাঁহাকে রাজা বলা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয় মহান্ ও প্রাণ বিরাট ছিল, সেই জন্য তিনি মেদিনীপুরের হৃদয়েব রাজা ছিলেন। কাঁথির দুর্দ্দশাগ্রস্ত কিন্তু বীরহৃদয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য, কাঁথিতে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকিবে ততদিন বীরেন্দ্রনাথ পাদুকা ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া পাদুকা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মালপত্র কিছুমাত্র নীলাম না হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী প্রত্যেকের বাড়ীতে সমূহ মাল ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হইয়া একদিনে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড মেদিনীপুর হইতে উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া গেল। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রারম্ভে অনেকেই বীরেন্দ্রনাথকে অবিবেচক মন্দবুদ্ধি বলিয়া অপযশ করিয়াছিল। আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়াও তাহারা মেদিনী-পুরবাসী বা সেই আন্দোলন-পরিচালককে সম্যক মর্য্যাদা দান করে নাই। দেশবাসী বীরেন্দ্রনাথের কাজের মর্য্যাদা না দিলেও তিনি দেশের সেবক, তিনি আপন কর্ত্তব্যে অটল। তিনি একাকী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে—এ একটা বীরের মত বীর বটে। যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ

আন্দোলনের কোন কল্পনাই করা হয় নাই, তখন বাংলাদেশের মেদিনীপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হইল। এই আন্দোলন অর্থে মেদিনীপুরবাসীর অভিমতের সহিত প্রবল-প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারের আইনের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ হইতে নেতৃত্বের গুরুভার, লক্ষ-লক্ষ বীরহৃদয় মেদিনীপুববাসীর জীবন-মরণের দায়িত্ব বীরেন্দ্রনাথই আপনার সবল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেস-সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ

মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের পর বীরেন্দ্রনাথের নিকট অন্য কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের আহ্বান আসিল। চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তাঁহার নিকট সংবাদ গেল, তিনি (১৯২১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে) বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে কলিকাতা আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। বীরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া মেদিনীপুব হইতে কলিকাতায় আসিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের বিপুল কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হইলেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কাজে বীরেন্দ্রনাথকে গুরু পরিশ্রম করিতে হইত। কংগ্রেসেব নিয়মানুসারে তখন সম্পাদকের কাজের জন্য মাসিক একশত টাকা পাবিশ্রমিক লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদকের বিরাট দায়িত্ব পালন করিতেন। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ করিতে গিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই সময় দেশের নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাড়া পড়িয়া যায়। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—আমাদের দেশে এত দিন যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহার দোষে, তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মনীতি, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে যে-প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল, তাঁহারা সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগের জাতীয় বা নিজস্ব মঙ্গলজনক যাহা কিছু তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রাপ্ত শিক্ষা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে বটে, কিন্তু সে বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতর পাই নাই। বস্তুতঃ, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিতদের তুলনায় ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকিলে তাঁহাদের বিদ্যাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইত। বীরেন্দ্রনাথ এই তথ্য

অন্তরে উপলব্ধি করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দিকে বিশেষ মনোযোগী হন। তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সহরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাঁথির কয়েক জন বীরহৃদয় কর্ম্মী সুখসাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলিয়া কেহ বিনা বেতনে, কেহ বা নামমাত্র বেতনে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ইহাকে এক আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এই বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকগণ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম আমার জানা নাই। কয়েক জনের নাম জানি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মাইতি, শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীঅঘোরনাথ দাস, শ্রীভূতেশ্বর পড়্যা। জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি সহরস্থিত তাঁহার স্বীয় প্রকাণ্ড বাড়ী ও তৎসন্নিহিত জায়গা ছাড়িয়া দেন। তাঁহারই চেষ্টায় প্রথমতঃ কিছুদিন্ যাবৎ এই বিদ্যালয় ভালভাবে চলিতে থাকে। কয়েক বৎসর পরে শ্রীহরিপদ পাহাড়ী প্রদত্ত ভূমিখণ্ডেব উপরে বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইলে বিদ্যালয় সেখানে উঠিয়া যায় এবং বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কংগ্রেস অফিস চলিতে থাকে। এই সময় তিনি কংগ্রেসের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ বরণ করেন, তাহা বাংলার যে কোন নেতার ত্যাগ ও ক্লেশ অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই সময় মেদিনীপুর জেলার কলাগেছিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ জমিদাব স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের বদান্যতায় আর একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জগদীশবাবু এই বিদ্যালয়টিব জন্য সে-সময় প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, এম. এ, শ্রীগিরীশচন্দ্র মাইতি, বি.এ, শ্রীপরেশনাথ মাইতি, বি. এ. প্রভৃতি শিক্ষকগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ যখন একেবারে প্লাবিত, তখন চারিদিকে খদ্দর পর, কংগ্রেস কর, সরকারী-আধা-সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়—এই সব বুলি ছাড়া আর কোন কথাই কংগ্রেসীদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়েব বক্তৃতার মধ্যে দুই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে বলিতেছি। তিনি যেখানেই বক্তৃতা করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি দেশবাসীকে সমষ্টিগতভাবে তাঁহার বক্তব্য শুনাইয়াছেন। দেশবাসী হইতে পৃথক করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুবক সম্প্রদায়কে আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন নাই। তিনি দেশের প্রকৃত

অবস্থা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উত্তমরূপে বিবৃত করিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্যক্‌রূপে তাহা বুঝিয়া দেখিতে উপদেশ দিতেন। তারপর তাঁহাদের বিবেকানুযায়ী কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইতে বলিতেন। কেবলমাত্র দেশোদ্ধারের নামে, অথবা দলপুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুবক সম্প্রদায়কে তাহাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্র হইতে বক্তৃতার বলে ছিনাইয়া লইয়া যান নাই। বীরেন্দ্রনাথ বলিতেন, যাঁহারা দেশের জন্য অপরের সাহায্য-সহানুভূতির আশা-অপেক্ষা না করিয়া আন্দোলনে কায়মনঃপ্রাণে যোগদান কবিতে ও আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছুক, শুধু তাঁহারাই যেন আন্দোলনে যোগদান কবেন। তিনি জানিতেন, কতকগুলি ছাত্র বা যুবককে বক্তৃতাব চাতুরীতে মুগ্ধ কবিয়া দলে টানিয়া আনিলে চলিবে না। কারণ যখন আন্দোলনের ভাব-প্রাবল্য হ্রাস পাইবে, তখন সেই সমস্ত যুবকেব অদম্য প্রাণ-শক্তির সম্মুখে করিবার মত উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ থাকিবে না। কাজেই তাহারা যাইবে কোথায়? তাহারা ভাব-স্রোতের প্রতিকূল হইবে। লজ্জায় তাহাদের আর স্কুল-কলেজে ফিরিয়া যাইবার পথ থাকিবে না। পবিবারের মধ্যে তাহাবা 'নিষ্কর্ম্মা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তাচ্ছিল্য ও অনাদবের মধ্যে জীবন কাটাইবে এবং তাহাদের অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা যে না হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে। কেহ-কেহ যে নীতিবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিবে না তাহাতে স্থিরতা কি? বলা বাহুল্য, বীরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

"হে বাংলার ছাত্র ও যুবকগণ, তোমরাই দেশের একমাত্র আশা ও ভরসা-স্থল। তোমরা এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বাগ্রে ঝাঁপাইয়া পড়, মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর"—এই প্রকার বাক্যচ্ছটায় যখন বাংলার অন্যান্য নেতা অপরিণামদর্শী ছাত্র ও যুবকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন হাজার-হাজার ছাত্র ও যুবক তাহাদের বিদ্যালয় ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। তখন দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এক প্রকার খালি হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন সেই নায়কগণ ছাত্র ও যুবক-সম্প্রদায়কে আর মাতাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কাজেই বহু ছাত্র ও যুবক অকর্ম্মা হইয়া সংসারের বোঝা হইয়া রহিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের মজা এই

যে, আন্দোলনে যোগদানকারীদিগের মন ইহাতে এমন চঞ্চল হইয়া উঠে যে, আন্দোলনের পরও কিছুকাল যাবৎ তাহাদের সে চঞ্চলতা আর দূর হয় না। অপর কোন কাজে মন আর তেমন সহজে নিবিষ্ট হইতে চায় না। আর বিশেষভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আরও মজা ছিল এই যে, যে সমস্ত যুবক স্বদেশোদ্ধারেব নামে দেশবাসীর সেবার নামে জল-তোলা, ঘব-ঝাঁট-দেওয়া প্রভৃতি কাজ কবিত, তাহারাই আবাব সংসাবে ফিরিয়া ঐ সমস্ত কাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। যাহারা একদিন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবার পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ কবিত, তাহাবাই আবাব পরে আপনাদেব মধ্যে সামান্য কাবণে বৃহৎ ব্যবধানের সুউচ্চ প্রাচীর দৃঢভাবে গাঁথিয়া তুলিত। কিন্তু মুখের আস্ফালন আব বন্ধ হইত না। আব কোথাও যদি বা দুই-চাবটি মহৎ-প্রাণ যুবক পল্লীসেবা-পল্লীসংস্কার কাজে লাগিয়া যাইতেন, তবে তাহারা সরকারেব বোযকষায়িত লোচন হইতে রক্ষা পাইতেন না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কয় জনই বা দেশোদ্ধাবে মাতিয়া থাকিতেন। না থাকিবাব অর্থনীতি-গত সমাজ-কষাঘাতও প্রবল। তাহাবা বেকাব। সমাজে তাহাদেব স্থান কোথায়। আমরা দেশের কথা মুখস্থ করিয়া বলি, বড কথা বড জায়গায় খাপ খাওয়াইয়া চলি। কিন্তু সেগুলি আন্তরিক নীতি নয় বলিয়াই ছোট জায়গায়—সমাজে, সংসাবে, দাম্পত্য জীবনে—তাহাদের ছন্দছাড়া জীবন কটুতিক্ত সমালোচনায় উৎকট আকাব ধারণ করাইয়া ছাড়ি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার নেতা হইয়াছিলেন। বাংলার এই বাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। আর সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। উভয়ে একই ভাবে অনুপ্রাণিত। বাংলায় এই রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশপ্রাণ শাসমল চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত। পরে স্বরাজ্যদল গঠন ও পরিচালনে দেশপ্রাণের অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা ও বিচিত্র সংগঠন-শক্তি দেশবন্ধুব কাজের দিক্ দিয়া যে কতখানি সহায় হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

হরতাল

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আগমন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছিলেন যে, যুবরাজের

ভারতে আগমনের দিন সমগ্র ভারতে হরতাল করিতে হইবে। তাঁহারা পূর্ণ হরতাল সাধিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে আদেশ দিয়াছিলেন। দেশপ্রাণ শাসমল তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক। বাংলায় যাহাতে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয় সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটি ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে ১৭ই নভেম্বর হরতাল পালন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটিকেও এ সম্বন্ধে পৃথক পত্র লিখিয়াছিলেন। বাংলার সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কাজেই বাংলার সর্ব্বত্র যুবরাজের ভারতে আগমনেব দিন (১৭ নভেম্বর, ১৯২১) পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাষ্ট্রীয় সমিতির প্রচার বিভাগের সম্পাদক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। হরতাল সম্পর্কিত প্রচাব কার্য্যে সমধিক কৃতিত্ব ছিল সুভাষচন্দ্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও খিলাফৎ কর্ত্তৃপক্ষের।

পরদিন হইতে সকলে অনুমান করিল, এইবার চিত্তরঞ্জন, বীবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃগণের গ্রেপ্তার নিশ্চিত। দেশমান্য এই নেতৃগণ গ্রেপ্তাব হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ইহার পর কয়েক দিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভায় (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) অনেক বিষয় আলোচনা হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহাদের গ্রেপ্তারের দিন ঘনাইয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথের কারাবরণ

১৯২১ খৃষ্টাব্দ, ১০ই ডিসেম্বর। দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই সকলে চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তার লইয়া কানাঘুষা করিতেছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে শাসমল প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন। ৯ ই ডিসেম্বর রাত্রে চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী বীরেন্দ্রনাথের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে জানান যে, তিনি বোধ হয় সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার হইবেন। তখনও শাসমল অন্নপথ্য গ্রহণ করেন নাই। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি গ্রেপ্তারের জন্য অন্তরে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা তাঁহাব বাড়ীর কাহাকেও জানিতে দেন নাই। তাঁহার আশু গ্রেপ্তার হইবার সংবাদ যখন তাঁহার বাড়ীর সকলে জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শাসমলও তাহাব বেগ অনুভব কবিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি চিবদিন কর্ত্তব্যে কঠোর ও আকস্মিকতায় অক্ষুব্ধ, তিনি এই চাঞ্চল্যের মধ্যেও আপনাকে দৃঢ় ও সংযত রাখিলেন।

১০ই ডিসেম্বব বৈকালে শাসমল চিত্তবঞ্জনের বাড়ীতে অসুস্থাবস্থায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই সদলবলে পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতি। তারপর বিদায়ের পালা শেষ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে সভাপতি ও যে সম্পাদক আন্দোলনের প্রায় প্রারম্ভ হইতে একাত্মভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহারা আজ সেইভাবেই কারাগারের পথে চলিলেন।

কয়েক দিন প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া সেদিন অন্নপথ্য গ্রহণ করিলেও বীরেন্দ্রনাথের শরীর সুস্থ ছিল না। তাহার উপর ডিসেম্বরেব শীত। সেজন্য তিনি সেদিন মোজা ও বহুদিন নগ্নপদে থাকার পর চটিজুতা পায় দিয়া এবং একখানি শাল গায়ে জড়াইয়া চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে উপস্থিত হন। পুলিশের গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি মোজা ও চটিজুতা চিত্তরঞ্জনের অফিস ঘরে খুলিয়া রাখিয়া যান এবং শালখানি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের রমেশবাবু নামে এক আত্মীয়ের হাতে দিয়া তাহার পট্টুখানি গ্রহণ করেন।

এই ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও কলিকাতা খিলাফৎ কমিটির সভাপতি মৌলানা আবদুর রউফও গ্রেপ্তার হন।

প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ শাসমলকে লালবাজার থানায় এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদিগকে সেখান হইতে প্রেসিডেন্সি জেলে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় বীরেন্দ্রনাথ সংসারের সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই তাঁহার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননীর কথা। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জননী ও জন্মভূমির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার বিচার সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—(স্রোতের তৃণ, ৮০নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"৯ই জানুয়ারীতে 'পি' 'পি' অর্থাৎ 'পাব্লিক প্রসিকিউটার' অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু ম'শায় আমার মোকদ্দমার 'ওপ্‌নিং' বা মুখবন্ধটা অতি সংক্ষেপেই শেষ করেছিলেন। তিনি বলে'ছিলেন—আমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের কেবল এই অভিযোগ যে, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৭শে নভেম্বরে গৃহীত চারটী প্রস্তাব ছাপাবার জন্য সংবাদ-পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং সেগুলি ১লা ডিসেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং 'সার্ভ্যাণ্টে' প্রকাশিত হ'য়েছিল। 'পত্রিকা' আফিসে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি ইংরেজী নোটিশও তিনি আদালতকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন :—

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২৭শে নভেম্বর রবিবার ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী প্রস্তাবে, প্রথম দুইটী একের অসম্মতিতে এবং শেষের দুইটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল :—

প্রথম প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে, গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্রে বাংলার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে, সাধারণের উপর এবং গভর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপর ভয় প্রদর্শন এবং আইন ভঙ্গ ইত্যাদির যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। এই কমিটী বলিতেছেন যে,

স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্ব্বদা শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে কার্য্য করিতেছেন এবং সেই হেতু এই কমিটী নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যে-হেতু এই কমিটীর মতানুসারে স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনারের প্রকাশিত নূতন ঘোষণা-পত্রগুলি অন্যায়, অবিচার-প্রসূত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও তৎসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের সমূহ কার্য্যতৎপরতা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোষিত হইয়াছে, সেই হেতু এই কমিটী সাধারণকে শান্তিতে ও নিরুপদ্রব ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরি-চালনার জন্য কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হইতে আহ্বান করিতেছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা সমীপেষু—
এই বিজ্ঞাপনটী অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় ছাপাইলে বাধিত হইব।
বি. এন. শাসমল

তৃতীয় প্রস্তাব

এই কমিটীর অভিমত এই যে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যে সকল সভা ও শোভাযাত্রা এত দিন শান্তিতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলিকে বিনা কারণে ও অন্যায্যভাবে বন্ধ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেসের শত্রুপক্ষের দ্বারা উত্তেজনা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং যেহেতু যত দিন না সর্ব্বসাধারণ সেই সকল উত্তেজনা ও প্ররোচনাকে অতিক্রম করিতে শিখিবে, তত দিন কোন সভা হওয়া উচিত নহে, সেই হেতু এই কমিটী স্থির করিলেন যে, যে সকল স্থানে এইরূপ হুকুম দিয়া শোভাযাত্রা বন্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থান এই কমিটী কিম্বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির মতানুসারে যত দিন না সম্পূর্ণরূপে সংযত ও নিরুপদ্রব হইয়াছে, ততদিন সে সকল স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রহিল।

চতুর্থ প্রস্তাব

স্থির হইল যে, এই প্রদেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল বিধায়, এই কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ ম'শায়কে বঙ্গীয়

প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর সহিত যুক্তি করিয়া এই কমিটীর তরফে কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার সমুহ ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

বি. এন. শাসমল

সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

"রায় বাহাদুর ম'শায় বিজ্ঞাপনখানা পড়া শেষ ক'রলে, বিচারকের হুকুমে সেটা আমার কাছে আনা হ'য়েছিল। আমিও সেটা আদ্যন্ত দেখে ফিরিয়ে দিলে, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীর জবান-বন্দী করাতে স্বরু করেছিলেন। প্রথম সাত জন সাক্ষী 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'সার্ভ্যাণ্ট' অফিসে যে ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে খানাতল্লাসি হ'য়েছিল এবং 'পত্রিকা' অফিসে অন্যান্য জিনিষেব সঙ্গে যে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনখানি পাওয়া গিয়েছিল মোটের উপর কেবল সেই মর্ম্মেই জবান-বন্দী দিয়েছিলেন। অবশ্য ১লা ডিসেম্বরের দু'খানি 'পত্রিকা' এবং 'সার্ভ্যাণ্ট' সংবাদপত্র যে প্রমাণ করা হ'য়েছিল না এমন নহে।

"আট নম্বরের সাক্ষী (কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট) স্বয়ং মিঃ সুইনহোব দপ্তরখানা থেকে, আমি যে তাঁকে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র লিখেছিলাম, সেইখানা আদালতে দাখিল করেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল, তা' বোধ হয় কা'কেও খুলে বলে দিতে হবে না। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ কি ছিল। আমি যে বিজ্ঞাপনখানা সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তা' কেবল দু' উপায়ে প্রমাণ হতে পারতো। প্রথমতঃ, এমন যদি কোনও লোক পাওয়া যেতো, যে শপথ করে বল্‌তো, সে আমাকে বিজ্ঞাপনখানা লিখে সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিতে দেখেছ, তা' হলে আর কোন গোলমালই থাক্‌তো না। কিন্তু এমন কোন সাক্ষী গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করতে পারেন নি। সুতরাং, দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনের যে অংশগুলি হাতে লেখা ছিল, সেগুলি যে আমার হাতের লেখা, তাই প্রমাণ করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

"এখন হাতের লেখা প্রমাণ করবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই যে, একজন লোক এসে বলবে যে, সে আমার হাতের লেখা চিনে এবং বিজ্ঞাপনের হাতে লেখা অংশগুলি আমারই হাতের লেখা বটে। কিন্তু সে তারিখে যে এমন কোন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত ছিল না, তা একটু

পরে দেখাচ্ছি। ৯ই জানুয়ারীর আট নম্বরের সাক্ষীটি কেবলমাত্র আমার হাতের লেখা উল্লেখে একখানা পত্র আদালতে উপস্থিত করেছিলেন; কিন্তু সে পত্র যে বাস্তবিক আমারই হাতের লেখা তা' তিনি বলেন নি, কারণ তা' তিনি জানতেন না। সে দিনের শেষ সাক্ষী একজন শ্বেতকায় সার্জেণ্টকে দিয়ে প্রথমে এই প্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে বলে আমি অনুমান করেছিলাম যে, সে গ্রেহাম বনাম লাহিড়ীর মোকদ্দমায় আমার উপর এক সমন জারি করেছিল এবং সেই সমনের পিঠে তারই সম্মুখে আমি আমার নাম দস্তখত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু একথা আমাকে আজ স্পষ্ট স্বীকার করতেই হবে, সার্জেণ্টটি শেষ পর্য্যন্ত সত্য কথা বলেছিল এবং এতদিন পরে আমাকে সনাক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে' সে তার সততার পরিচয় দিয়েছিল। সুতরাং সে-দিন কেবল বিজ্ঞাপনের হাতের লেখা অংশগুলি এবং হাতেব লেখা একখানা পত্র ও একখানা সমনের পিঠের হাতের লেখা আদালতে তস্‌দিক করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক কার হাতের লেখা, তা' সে-দিন কেউ বলে নি। এখানে বলে রাখি, বিজ্ঞাপনের প্রায় নিরানব্বই ভাগ টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল; বিজ্ঞাপনের পাশে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে বিজ্ঞাপনটি ছাপাবার জন্য যে অনুবোধ ও তার নীচের দস্তখত এবং বিজ্ঞাপনের সর্ব্বনিম্নভাগে যে আর একটি দস্তখত দেখা গিয়েছিল, কেবল সেইগুলিই টাইপের অক্ষরে লেখা ছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞাপনটিতে গভর্ণমেণ্টের উকীল মশায় কেবল দুটি দস্তখত্‌ এবং আন্দাজ দেড় ছত্র হাতেব লেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটিকে ৯ই জানুয়ারীতে অর্থাৎ আমাকে গ্রেপ্তার কববার ঠিক একমাস পরেও গভর্ণমেণ্ট আদালতে প্রমাণ করতে পারেন নাই এবং সেজন্য রায় বাহাদুর মশায় আবার ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিন নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

"১৬ই জানুয়ারীতে কেবল যাওয়া আসাই সার হয়েছিল, কারণ তারক-বাবু সে-দিন একজন সাক্ষীরও জবানবন্দী না করিয়ে পুনরায় ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোহলত নিয়েছিলেন। ২০শে জানুয়ারীতে আবার সেই ঘটনা ঘটেছিল এবং এবারে দিন পড়েছিল ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। ২৪শে জানুয়ারীতে প্রথম মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গালার খানসামাকে দিয়ে তার ডাক বাঙ্গালার বই থেকে, আমার কয়েকটা দস্তখত ও কিছু হাতের লেখা প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছিল। খানসামার কথাবার্ত্তায় মনে করেছিলাম, সেও সেগুলি

প্রমাণ করবার জন্য অসম্মত ছিল না। কিন্তু সে ইংরেজী জানে না বলে প্রকাশ পাওয়ায় তার জবানবন্দী শেষ পর্য্যন্ত কারু কোন কাজে লাগে নি। তারপর একজন সাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার বই থেকে তাঁর হাতের লেখা কতকটা কেন যে আমার এই মোকদ্দমায় প্রমাণ করা হয়েছিল, ভগবান তারকনাথ জানেন।

"যা' হোক্, ২৪শে তারিখে শেষ যে সাক্ষীর জবানবন্দী হয়েছিল, তাঁর নাম মিঃ ক্রষ্টাব—যিনি গভর্ণমেণ্টের বিরোধীয় হস্তলিপির পরীক্ষক বলে সারা আর্য্যাবর্ত্তে সুপরিচিত। তিনি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমার হাতের লেখা জানতেন না, সেই জন্য তিনি শুধু 'এক্সপার্ট' বা হাতের লেখার পরীক্ষকরূপে আমার মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন— সেই সর্ব্বনেশে বিজ্ঞাপনটার পাশের 'বি. এন. শাসমল' দস্তখতটি যে হাতের লেখা, মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে সে বইর কয়েকটা 'বি এন শাসমল' দস্তখতও সেই হাতের লেখা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, রায় বাহাদুর মশায় এই সাক্ষীটিকে কতকগুলি আবশ্যক কথা জিজ্ঞেস করা উচিত বলে মনে করেন নি।

"প্রথমতঃ, মিঃ ক্রষ্টার যে সকল দস্তখস্ত সম্বন্ধে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সে সকল দস্তখতের ফটোগ্রাফ তিনি নিয়েছিলেন কি না, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না, অথচ একথা আইন-ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন যে, বিনা ফটোগ্রাফে কোনও 'এক্সপার্টের' মতামতের উপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। সময়াভাব হয়েছিল বলে আপত্তি তুল্‌বারও কোন কারণ দেখি না, কারণ আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবাব জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঠিক দেড়মাস সময় নিয়েছিলেন। বিশেষতঃ ২০শে জানুয়ারীতে দেশবন্ধু মশায়ের মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিয়ে, আমার মোকদ্দমার জন্য মিঃ ক্রষ্টারকে যে ২৪শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করতে হয়েছিল, তা রায় বাহাদুর মশায় বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তবুও কেন যে দস্তখতগুলির ফটোগ্রাফ তোলা হয় নি, তা আমি জানলেও যাঁদের জানা উচিত তাঁরা জানেন আশা করি। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই তারিখে মিঃ স্থইন্‌হোকে আমি যে পত্র লিখেছিলাম, মিঃ ক্রষ্টাবকে সেটা যে কেন দেখান হয় নি, তা বলতে পারি না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, এই পত্রখানির

লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের লেখার সামঞ্জস্য দেখাবার জন্যই, এই পত্রখানিকে আমার মোকদ্দমার নথির সামিল করা হয়েছিল। কিন্তু শেষে গভর্ণমেণ্টের 'হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকে' কেন যে এ পত্রখানি দেখান হলো না, তা রায় বাহাদুর মশায়ই বল্‌তে পারেন। তৃতীয়তঃ, একজন শ্বেতকায় সার্জ্জেণ্টকে দিয়ে একখানা সমনের পিঠের খানিকটা লেখাকে আমার লেখা বলে প্রমাণ কর্‌বার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটাও মিঃ ক্রষ্টারকে কেউ দেখান নি। চতুর্থতঃ, 'অমৃত বাজার পত্রিকাকে' অনুরোধ করে বিজ্ঞাপনের পাশে যে দেড় ছত্র হাতের লেখা ছিল, গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তাও মিঃ ক্রষ্টারকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে আমার নামের যে দস্তখতটা ছিল, সে-দিন তার প্রতিও কারু দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ফলতঃ বিজ্ঞাপনের কোন লেখাই আমার হাতের লেখা বলে সে-দিনও প্রমাণ না হওয়ায়, একেবারে পনর দিনেব পর ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার মোকদ্দমার দিন পড়েছিল।

"৭ই তারিখে বেলা প্রায় বাবটার সময় স্থইন্‌হো সাহেবের দোতলার বারান্দায় পৌছলে শুনেছিলাম, ব্যারিষ্টার মিঃ বি. কে. লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমল মহাশয়কে আমার হাতের লেখা প্রমাণ কর্‌বার জন্য পাশের একটি ঘবে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং শীঘ্রই আমার মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আদালতের কে একজন এসে বলে গিয়েছিলেন, দু'টোর জলযোগের পর স্থইন্‌হো সাহেব আমার মোকদ্দমা ধরবেন। এব প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে আর একজন কে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল, মেদিনীপুর থেকে বাবু পি এন মুখার্জ্জি বলে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য এইমাত্র পৌছেছেন।

"যা' হোক, স্থইন্‌হো সাহেবের জলযোগের পর, মেদিনীপুরেব পুলিস কর্ম্মচাবী বাবু, পি এন মুখার্জ্জিকেই সাক্ষীর বাক্সে দেখতে পাই। তিনি শপথ করে বলেছিলেন—প্রায় ন' মাস পূর্ব্বে তিনি কাঁথিতে ডেপুটি পুলিস 'সুপার' কিম্বা নায়েব পুলিশ সাহেব ছিলেন এবং বিগত ন' মাস ধরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্য জায়গায় সেই কাজই করে আসছেন। তিনি আরো বলেছিলেন, তিনি আমাকে পনর কুড়ি বার লিখতে দেখেছেন এবং সেই জন্য তিনি আমার হাতের লেখা চিনেন। বিজ্ঞাপনের সমূহ হাতের লেখা মায়

ছুটি দস্তখত আমার লেখা বলে তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন, তবে বিজ্ঞাপনের শেষের দস্তখতটি সম্বন্ধে তিনি ততটা নিশ্চিন্ত ছিলেন না—এ কথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। রায় বাহাদুর মশায় পরে পরে পূর্ব্বকথিত সমনের পিঠের হাতের লেখা এবং মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলায় যে বই থাকে তার কয়েকটা দস্তখত ও লেখা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, সেগুলি সমস্তই আমার হস্তলিপি।

"আমি কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, মিঃ সুইন্‌হোকে আমি যে ১৯২১-এর ২১শে জুলাই তারিখে একখানি পত্র নিজের হাতে লিখেছিলাম, এই সাক্ষীকে'ও কি জানি কেন গভর্ণমেণ্টের উকীল মশায় সেটা দেখান আবশ্যক বোধ করেন নি। শুধু এই নয়, তিনি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর পর আদালতকে জানতে দিয়েছিলেন, তিনি আর মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের জবানবন্দী করাবেন না। তাঁরা যে এই সময়ে মিঃ সুইনহোর এজলাসেই বসেছিলেন, তা' অনেকে দেখেছেন। এর পর একখানি টাইপ-করা 'চার্জ্জ শীট' আমার কাছে উপস্থিত কবা হয়েছিল। এতে আমার নাম পর্য্যন্ত আগে থেকে টাইপ কবা ছিল দেখেছিলাম এবং আরো দেখেছিলাম যে, চার্জ্জের সঙ্গে দাশ ম'শায়, মৌলানা আব্দুর বোউফ ও পণ্ডিত বাজপৈ প্রভৃতির চার্জ্জের কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের জন্য সকলকেই এক ভাষায় চার্জ্জ করা হয়েছিল। প্রভেদ ছিল কেবল তারিখের, কেননা অন্য সকলকে অন্য তারিখের অপরাধের জন্য চার্জ্জ করে, আমাকে ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের অপরাধের জন্য চার্জ্জ করেছিলেন।

"চার্জ্জ-শীট্' পড়া শেষ হ'লে মিঃ সুইন্‌হো আমাকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, আমি মুখার্জ্জিকে কোনও কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই কি না। তখনও মুখার্জ্জি ম'শায় সাক্ষীর বাক্সে অধিষ্ঠান ক'র্‌ছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলাম—

I decline to have anything to do with the evidence of this witness for two reasons—firstly, because I am a no-co-operator and I can not therefore take part in these proceedings ; secondly, because I find the prosecution has stooped so low as to fabricate false evidence against me

through the mouth of this witness and for that reason I consider it disgraceful to have anything to do with it.'

অর্থাৎ দুটী কারণে আমি এই সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করি না। প্রথমতঃ, আমি অসহযোগী এবং সেইজন্য এ মোকদ্দমার কোনও ব্যাপারের সঙ্গে আমি সহযোগ ক'র্‌তে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, আমি দেখ্‌ছি এ মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষীব মুখ দিয়ে মিথ্যা সৃষ্টি ক'রতেও কুণ্ঠিত হ'ন্ নি এবং সে কারণে এ সাক্ষীর জবানবন্দীব সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখাকে আমি ঘৃণার কাজ বলে মনে করি।

"মিঃ সুইন্‌হো আমার কথাগুলি বোধ হয় এই সাক্ষীর জবানবন্দীর নীচে লিখে নিয়েছিলেন এবং শেষে চার্জ্জের উত্তরে আমি কোনও মৌখিক জবাব দিতে চাই না, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যে একখানা লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিব ব'ল্লে, রায়ের জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতুবি হ'য়েছিল।

"দু'তিন দিন পরে কিন্তু আমি মিঃ সুইন্‌হোকে লিখে জানিয়েছিলাম, আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'রব না; কারণ কংগ্রেস লিখিত জবাব দাখিল ক'র্‌বার অধিকার দিয়ে থাকৃলেও, কংগ্রেস কাউকে তার মোকদ্দমায় কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে হুকুম দেন নি। আমি আমার লিখিত জবাব প্রস্তুত ক'রতে গিয়ে উপলব্ধি ক'রেছিলাম যে, কোন না কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে লিখিত জবাব প্রস্তুত করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার এবং সেই জন্যই আমি কোনও লিখিত জবাব দাখিল ক'র্‌ব না ব'লে শেষে স্থির ক'রেছিলাম। লিখিত জবাব দাখিল ক'র্‌লে আমাকে কেন যে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে হ'তো, তা' পরে ব'ল্‌বো।

"এখন, এই যে আমার মোকদ্দমায় বাদী পক্ষ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সৃষ্টি ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হন্ নি ব'লে আমি মিঃ সুইন্‌হোকে ব'লেছিলাম, সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা এখানে ব'ল্‌বো। ১ম, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন এমন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন মেদিনীপুর ডাক বাঙ্গলার ইংরেজী-অনভিজ্ঞ একজন খানসামাকে প্রথমে মেদিনীপুর থেকে এখানে আনান হ'য়েছিল কেন? একথা কেউ ব'ল্‌তে পার্‌বেন না যে, প্রমোদ-বাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদের গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে অহরহ দেখা হয় নি। কারণ আমি শুনেছি,

এই দু'মাসে মেদিনীপুরে যত রাজনৈতিক মোকদ্দমা দায়ের হ'য়েছিল, তার প্রায় সকলগুলিতেই প্রমোদবাবু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হাজির হ'য়েছিলেন। ২য়, এটাও কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, যখন অবশেষে এই সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা হ'য়েছিল, তখন তিনি বিনা সমনে সেদিন সকালের মাদ্রাজ কিম্বা বোম্বাই মেলে মেদিনীপুর থেকে কলিকাতায় এসেছিলেন—যে কারণে কলিকাতায় পৌছ্‌তে বিলম্ব হওয়ায় আদালতকে জলযোগের পর পর্য্যন্ত আমার মোকদ্দমা মুলতবি রাখ্‌তে বোধ হয় বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল। শুনেছি, তাঁকে সে-দিন আনবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হয় এবং সে টেলিগ্রাফে মিঃ স্থইন্‌হোর নাম ছিল না। ৩য়, ব্যারিষ্টার মিঃ লাহিড়ী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁ'দেরই সমনে সে-দিন ঠিক সেই সময়ে আদালতে উপস্থিত থাকা সত্বেও, তাঁ'দিগকে বাদ দিয়ে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর জবানবন্দী করান কতদূর শোভনীয় হ'য়েছিল, তা' নিবপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বিশেষতঃ, আমি যখন মিঃ স্থইন্‌হোর প্রশ্নের উত্তবে তাঁকে জান্‌তে দিয়েছিলাম—বাদী পক্ষ মিথ্যা সৃষ্টি ক'রেছেন, তখনও মিঃ লাহিড়ী ও আমাব জ্যেষ্ঠ সহোদর আদালতে উপস্থিত থাকায় এবং তখনও গভর্ণমেণ্টের উকীল ম'শায় তাঁদের জবানবন্দী না কবায়, দৃশ্য সত্যই বড় অপ্রীতিকর হ'য়েছিল। ৪র্থ, আমি আজ সাত আট বৎসব ধ'রে কলিকাতায় বসবাস ক'রে কলিকাতা হাইকোর্টেই ব্যাবিষ্টারি ক'র্‌ছিলাম, প্রমোদবাবু আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায়?

"যখন ব্যারিষ্টারি ক'র্‌তাম তখন মক্কেল টাকা দিয়ে না নিয়ে গেলে বৎসরে একবারও কখনও কাঁথি গিয়েছি কি না সন্দেহ। ব্যাবিষ্টাবি পরিত্যাগের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমি কলিকাতাতেই বাস ক'র্‌তাম এবং তারপর কাঁথি ও তমলুকের মফঃস্বলেই মাসে গড়ে ২৫ দিন ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি। স্থতরাং তিনি যে আমাকে লিখ্‌তে দেখেছিলেন কোথায়, তা, আমি কল্পনাতেও আন্‌তে পার্‌ছি না। বলা বাহুল্য যে, আমি আমার জীবনে কখনো তাঁর বাড়ীতে যাই নি এবং তিনিও কখনো আমার বাড়ীতে এসেছেন বলে আমার স্মরণ হয় না। আমি কখনো আমার জীবনে তাঁকে বা তাঁর বাড়ীর কাউকে কোন দিন পত্রাদি লিখি নি, তিনিও কখনো আমাকে কোন পত্র দিয়েছেন বলে তিনি বল্‌তে পারেন না। বল্‌তে কি, তাঁর সঙ্গে মোট পনর কুড়ি বার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি না সন্দেহ, পনর কুড়ি বার

আমাকে লিখ্‌তে দেখা তো দূরের কথা। যতদূর স্মরণ হয়, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল ম'শায়ের বাড়ীতে তিন চার বার, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় ম'শায়ের ওখানে পাঁচ ছ'বার, মেদিনীপুরের ডাক বাঙ্গলায় একবার, কাঁথির অসহযোগ সভায় দু'একবার এবং পথে ঘাটে এখানে ওখানে বড় জোর চার পাঁচ বার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে কখনো লিখতে দেখেছিলেন কি না, তা যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই নির্দ্ধারণ করবেন।

"তবে একথা আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার কর্‌ছি, বিজ্ঞাপনখানার পাশে যে হাতের লেখা ও দস্তখত ছিল, তা আমারই হাতের লেখা বটে; কিন্তু বিজ্ঞাপনখানার শেষ ভাগে যে দস্তখতটি ছিল, সেটা আমার হাতের লেখা কিনা আমার সন্দেহ হয়। যা' হোক্, সে দস্তখতটিরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার বলেই আমি আজ স্বীকার করে নিচ্ছি, কারণ আমারই অনুমতিতে আমারই আফিস থেকে সকল বিজ্ঞাপন এক সময়ে সংবাদপত্রে পাঠান হয়েছিল। আমি একখানি বিজ্ঞাপনে যা কিছু নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলাম, আমার আফিসের কর্ম্মী বন্ধুগণ কেবল সংবাদপত্রের নাম আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করে অন্য সকল কথা ও আমার দস্তখতগুলি অন্য সকল বিজ্ঞাপনে নকল করে দিয়েছিলেন। যতদূর সম্ভব পাতা গাঁথ্‌বার সময় আমার হাতের লেখা সংযুক্ত প্রথম পাতার সঙ্গে, কোনও কর্ম্মীর হাতের লেখা সংযুক্ত একটা দ্বিতীয় পাতা ভুলে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

"কিন্তু বল্‌ছিলাম কি যে—ধর্ম্মাধিকরণে কোনও কারণে সত্যকে মিথ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা কর্‌বার চেষ্টা করা কারু উচিত নয়—বিশেষতঃ, আসামী যেখানে যে কারণেই হোক্ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। একথা ইংলণ্ডের আইনব্যবসায়ীদের কাছেই আমরা বাল্যকালে শিখেছিলাম। কিন্তু ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতির ভারতশাসন সময়েই এ ঘটনা আজ আমার চোখের সমুখে আমারই মোকদ্দমায় ঘটলো দেখ্‌লাম। তবে একথা একেবারেই বল্‌ছি না যে, সে জন্য আমি বিস্মিত হয়েছি, কারণ এর চেয়ে অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার আমার এই মোকদ্দমাতেই ঘটেছে।

"আমি স্বীকার করে নিলাম, সংবাদপত্রে আমিই বিজ্ঞাপনখানি পাঠিয়েছিলাম; তা হলেই কি ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্ য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২)

ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হতে পারি? পূর্ব্বেই বলেছি, আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলাম; সুতরাং সেই সমিতির ২৭শে নভেম্বর তারিখে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে আমি না পাঠালে পাঠাবে কে? একথাও বোধ হয় কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বেআইনি সমিতি ব'লে গভর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন নি। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ২৭শে নভেম্বর তারিখে এই সমিতির যে অধিবেশন হয়েছিল, তার জন্যও আজ পর্য্যন্ত কেউ কারু উপর হস্তক্ষেপ করেছে বলে জানি না। এমন কি, এ সভায় উপস্থিত থেকে যাঁরা বিজ্ঞাপনলিখিত চারটি প্রস্তাব মঞ্জুর করেছিলেন, তাঁদের কাউকেও সে কাজের জন্য গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত পাকড়াও করেন নি, কেবল আমি সমিতির সম্পাদকরূপে সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বলেই যত অপরাধ হয়েছিল আমার।

"প্রস্তাবগুলির মধ্যেও যদি ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধের কোন কথা থাকতো, তা' হলেও' না হয় বুঝতাম, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও কোন অপরাধের চিহ্নমাত্র ছিল না। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র ভিত্তিহীন এবং কংগ্রেসের কাজ পূর্ব্বের মত চলবে বল্লে, কিম্বা স-কাউন্সিল গভর্ণর ও কলিকাতার পুলিস কমিশনার অনেক অন্যায় কার্য্য করেছেন এবং সেই জন্য শান্তিতে ও নিরুপদ্রব ভাবে কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার জন্য সকলের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া উচিত বল্লে, আজ পর্য্যন্ত এদেশে কেউ কখনো দণ্ডনীয় হয় নি। এ ঘটনাও এর পূর্ব্বে আর কখনো এদেশে ঘটেনি যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একমত হয়ে সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করলে কিম্বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর দেশের গুরুতর সময়ে কংগ্রেসের সকল কাজের ভার অর্পণ করলে, ক্রিমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে লোকে জেলে যেতে পারে। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় এর বেশী অন্য কিছুই ঘটে নি। রায় বাহাদুর মশায়কে সেজন্য একদিন আমি আদালতের জ্ঞাতসারে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, চারটে প্রস্তাবের কোন্ প্রস্তাবটি আইনবিরুদ্ধ হয়েছে? তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বলেছিলেন, সকলগুলি প্রস্তাবের সমবেত ফল আইনবিরুদ্ধ হয়েছিল। অথচ ২৭শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে অপরাধী হয়েছি বলে, বোধ হয় তাঁরই যুক্তিতে আমার চার্জ্জশীটে সেই দু'তারিখের উল্লেখ দেখেছিলাম। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় অবগত ছিলেন, এই

দু' তারিখের মধ্যে কলিকাতায় আদৌ কোন স্বেচ্ছাসেবক বেরোয়নি ; এবং একথাও বোধ হয় কতৃপক্ষের অগোচর ছিল না যে, ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হতে যে সময় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় সেই সময়, আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণই দেওয়া হয় নি যে, আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক কিম্বা কোনও স্বেচ্ছা-সেবক সমিতি কিম্বা অন্য কোনও বেআইনি সমিতির সভ্য ছিলাম কিম্বা তা' কোন প্রকারে পরিচালনা করেছি। আমার বিরুদ্ধে এই একমাত্র অভিযোগ ছিল যে, আমি বিজ্ঞাপনের লিখিত চারটি প্রস্তাব খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমার বিরুদ্ধে প্রমাণও ছিল কেবল সেই এক অভিযোগের পোষকতায়—অর্থাৎ প্রমোদবাবুর উক্তি।

"তথাপি ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিঃ স্যুইন্‌হো আমাকে ক্রিমিন্যাল ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে, ৬ মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন। এই তারিখেই আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের ঠিক দু'মিনিট পূর্ব্বে দেশবন্ধু মশায়কেও ৬ মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। আমরা রায় শুনবার জন্য দু'জন এক সঙ্গে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতে কোর্টে গিয়েছিলাম এবং এক সঙ্গে এক রায় শুনে দু'জনে এক বন্ধ হাওয়া গাড়ীতেই প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরে এসেছিলাম।

"আমার এমনি সৌভাগ্য যে, গ্রেপ্তার হবার দিন যেমন আমি সাত দিন জ্বরের পর প্রথম কিছু পথ্য করেছিলাম, তেমনি আজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার দিনেও চার দিন জ্বরের পর প্রথম কিছু পথ্য করে আমাকে আদালতে যেতে হয়েছিল। সৌভাগ্য বললাম এই জন্য যে, শরীর সম্পূর্ণরূপে পূতঃ না হলে বিধাতার কোন যজ্ঞেই তাকে উৎসর্গ করা যেতে পারে না—তাতে যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অপবিত্রতা সংসাধিত হয়। আমার উপর যজ্ঞেশ্বরের বিশেষ করুণা আমি আজ হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করেছিলাম, কেননা তিনিই আজ আমাকে তাঁর অপরিসীম করুণায় জ্বর ও উপবাসের দরুণ শারীরিক দুর্ব্বলতা দিয়ে আহুতির জন্য পবিত্র ও অনাবিল ক'রে নিয়েছিলেন। বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শুনে সেই জন্যই বুঝি জন-বহুল আদালত-গৃহে আজ আমার হাসবার শক্তি কোথা থেকে ভেসে এসেছিল এবং সেই জন্যই বুঝি লজ্জার খাতিরে গোপনে বিচারক থেকে আরম্ভ করে সাক্ষী ও এমন কি রায়

বাহাদুরের মঙ্গলের জন্যও ভগবানের কাছে নির্মল হৃদয়ে প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

"আশা করি, এখন আর কাউকে খুলে বলে দিতে হবে না, কেন আমি লিখিত জবাব দাখিল করি নি। লিখিত জবাবে সকল কথা খুলে লিখতে হলে আমাকে নিশ্চয়ই লিখতে হতো যে, বিজ্ঞাপনখানা আমিই প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রে পাঠিয়েছি বলে স্বীকার করে নিলেও, আইন অনুসারে ক্রিমিন্যাল্ ল য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টের ১৭ (১) ও (২) ধারার অপরাধে আমি অপরাধী হতে পারি নে। প্রমোদবাবুর জবানবন্দী বা প্রমাণ সম্বন্ধেও আমার সকল কথা খুলে বলা উচিত হতো। কিন্তু তা হলে আমি যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতাম, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য বিজ্ঞাপনখানি আমিই সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কথা কটা স্বীকার করলে করতে পারতাম; কিন্তু তার মানে এই দাঁড়াতো যে, আমাকে 'কন্‌ফেসিং' বা একরারী আসামী বলে সকলে ধরে নিতেন। অথচ আমি মনে জ্ঞানে ভগবানের কাছেও এ কথা বলতে পারি নে যে, আমি কোনও অপরাধে অপরাধী হয়েছি।"

বীরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন ১০ই ডিসেম্বর (১৯২১) গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আর তাঁহাদের বিচার ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী শেষ হইল। ফল ৬ মাস বিনাশ্রম কারাবাস। মেয়াদ শেষ হইলে ৬ মাস পরে আগষ্ট মাসের মাঝামাছি ভারত-মাতার এই দুই অকৃত্রিম সেবক একসঙ্গে কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় বীরেন্দ্রনাথ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। দুই জনে এক সঙ্গে দেশবন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথ এখনও কি ভাবে এক সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারা আরও কত দূর এইভাবে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও পাঠক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর কয়েকখানি জীবন-চরিতের মধ্যে দুই একবার ব্যতীত আর বীরেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই। আবার দেশবন্ধুর কোন-কোন জীবনচরিতে শাসমলকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে।

কারাগৃহ হইতে মুক্তি লাভের পর বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি গমন করেন। তখন দুই লক্ষ নরনারী তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার জেলাবাসী কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা

যায়। এই সময় মেদিনীপুর-জেলাবাসী বীরেন্দ্রনাথকে 'দেশপ্রাণ' আখ্যায় ভূষিত করেন। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় বীরেন্দ্রনাথ পাদুকা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া যাওয়ায় বীরেন্দ্রনাথ বিজয়ী বীরের ন্যায় কাঁথি গমনের পর পুনরায় পাদুকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুব সহরেব অধিবাসিগণ স্থানীয় জমিদার শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব সভাপতিত্বে সমবেত হইয়া ধান্য, দূর্ব্বা ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা ভারত-মাতার সুসন্তান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তাঁহাকে সম্পূর্ণ চরকায় কাটা সূতার দ্বাবা তৈয়ারী একখানা চাদর উপহার দেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বরাজ্য দল

১৯২২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া শাসমল দলীয় চক্রান্তের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের পদ পান নাই। বীরেন্দ্রনাথের যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠন-শক্তি ইউনিয়ন বোর্ড ও তিষ্ঠা-প্রতিরোধ-আন্দোলনে প্রকাশ পাইয়াছিল, কংগ্রেসে তাহার মর্য্যাদা হইল না। তিনি আপন কর্ত্তব্যে অটল রহিলেন। তিনি কংগ্রেসের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। অসহযোগের মন্ত্রে যখন কংগ্রেস চলিতেছিল তখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক পরিত্যাগের কথাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সব প্রতিষ্ঠান অধিকার করিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ প্রতিযোগিতা করিবার ও দেশবাসীর অধিকতর মঙ্গল সাধন করিবার একটা সুযোগ হারাইতে হইবে। সেই জন্য তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা বহুবিধ অবাঞ্ছনীয় আইন সৃষ্টি করিয়া দেশের অনিষ্টোৎপাদন করিতেছে। এই সমস্ত সভায় প্রবেশ করিয়া সভাগুলির সংস্কার সাধান করিতে হইবে এবং সরকারের প্রস্তাবে বাধা দিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে অসহযোগ মন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হয় না। কংগ্রেসে যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। দেশবন্ধু পরাজিত হইলেন। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলেও দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে এক নূতন দল গঠন করিলেন। তাহার নাম হইল 'স্বরাজ্য দল'। নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি ও বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি উহার অন্যতম ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হন।

স্বরাজ্য দলের নিয়মাবলী

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে স্বরাজ্য দল যে কর্ম্মসূচী অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি বলিতে এই বুঝাইবে যে, এক দিকে আমাদের জাতীয় দাবী বলবৎ করিবার জন্য জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য দ্বৈত শাসন অচল করিতে প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং অন্য দিকে তদুদ্দেশ্যে, এদেশের লোকেব যে সহযোগিতা ব্যতীত দ্বৈত শাসন অসম্ভব সেই সহযোগিতা ক্রমশঃ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করা ;

দ্বৈত শাসনের বিভিন্ন মনোভাবেব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে স্বরাজ্য দলেব নীতি প্রয়োগ অর্থে এই বুঝাইবে যে, আমাদের জাতির সুষ্ঠু অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক সকল কার্য্যে আত্মনিভর্শীল হওয়া এবং আমাদের স্বরাজ্য লাভেব পবিপন্থী দ্বৈত শাসনেব প্রতিরোধক কার্য্যেব অনুষ্ঠান করা ;

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বিভিন্ন আইন সভায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে এবং ভাবতের রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে উক্ত নীতিব দিকে লক্ষ্য বাখিয়া দেশের স্বার্থে স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্ম্মসূচী বিশদভাবে পুনরায় বিবৃত কবা একান্ত আবশ্যক হইয়া পডিয়াছে।

এখন স্বরাজ্য দল ঘোষণা কবিতেছেন যে, দলের প্রধান নীতি অর্থে এই বুঝাইবে যে, জাতীয় উন্নতির পরিপোষক ও স্ববাজ্য লাভের জন্য জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী দ্বৈত শাসনেব প্রতিরোধক সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যে স্বাবলম্বন।

এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে স্বরাজ্য দল নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুমোদন করেন :

১। আইন সভার মধ্যে

(ক) যদি আমাদের অধিকারেব স্বীকৃতি হিসাবে অথবা ভারতবাসী ও সংসদের মধ্যে মীমাংসা হিসাবে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা না হয়, তবে সম্ভব হইলে, সরবরাহ বন্ধ কবা এবং আয়ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব বাতিল করা ;

(খ) যে সকল আইন পাশ করিলে দ্বৈত শাসন দৃঢ়মূল হয় এমন আইনের প্রস্তাব বাতিল করা ;

(গ) জাতির উন্নতির পোষক ও ফলে দ্বৈত শাসনের নাশক প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করা এবং সেই ধরণের বিল প্রবর্ত্তন ও সমর্থন করা।

(ঘ) ভারতীয় জাতীয় মহাসভার গঠনমূলক কার্য্যসূচী রূপায়ণে সাহায্য করা।

(ঙ) ভারতের অর্থ যাহাতে শোষিত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে শোষণমূলক সর্ব্ব-কার্য্য দমনের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতি অনুসরণ করা এবং ভারতের জাতীয়, অর্থনৈতিক, শিল্প-বিষয়ক ও ব্যবসায়গত স্বার্থ যাহাতে পুষ্ট হয় সেজন্য অনুরূপ অনুষ্ঠান করা।

(চ) কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করা এবং প্রজা ও জমিদার—শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্য দূর করা।

২। বৈতনিক বা অবৈতনিক ভাবে অথবা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বরাজ্য দলের কোন সভ্য সরকারের দানে পুষ্ট কোন পদ বা চাকরী গ্রহণ করিবেন না।

৩। স্বরাজ্য দলের কার্য্য ফলদায়ক করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে কোন পদে বা কমিটিতে নির্ব্বাচনের জন্য স্বরাজ্য দলের সভ্যগণ স্বাধীনতা পাইবেন। তবে কোন সভ্যই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা প্রাদেশিক আইন সভায় দলের সভ্যদের দ্বারা রচিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৪। য়্যাসেমব্লি বা আইন-সভাসমূহে নির্ব্বাচিত হইয়া দলভুক্ত সভ্যগণ নিজেদের নিয়মাদি মানিয়া চলিবেন। ঐ সব নিয়ম অনুমোদনের জন্য কার্য্যকরী পরিষদের নিকট পেশ করা হইবে। কার্য্যকরী পরিষদ কোন নিয়ম অনুমোদন না করিলে, তাহা সভ্যদিগকে জানাইবার সময় হইতে কার্য্যকরী হইবে না।

আইন সভার বাহিরে

৫। স্বরাজ্য দল নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন :—

(ক) ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, ভারতীয় খৃষ্টান (য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাসিন্দা সহ) এবং ভারতবাসী অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমান আর ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাদ ও বৈষম্য দূরীকরণ ;

(খ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অবনত শ্রেণীদিগের উন্নয়ন সাধন।

(গ) গ্রাম-সংস্কার ;

(ঘ) কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং স্বরাজ-সংগ্রামে তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সংঘ গঠন ;

(ঙ) শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নয়ন সহ দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ;

(চ) নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদীদিগের দ্বারা অধিকার।

(ছ) স্বদেশী খদ্দর, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, জাতীয় শিক্ষা এবং শালিসী আদালত প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বরাজ্য দল যেমন আবশ্যক মনে করেন তদনুযায়ী কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যসূচী অনুসরণ করা।

(জ) স্বরাজ্য লাভের জন্য রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহাবের উদ্দেশ্যে একটি সমিতির উপদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন।

(ঝ) এশিয়ার কৃষ্টি বিস্তার কবিবার ও এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে পরস্পরের সাহায়তা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়ার জাতিসমূহের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতির ফেডারেশন গঠন।

(ঞ) যথার্থ তথ্য পবিবেশন ও এদেশের স্বরাজ্য সংগ্রামে বিভিন্ন দেশের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভেব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশে ভারতীয় বিষয়ের প্রচার চালাইবার এজেন্সি গঠন।

শাসমল যে স্বরাজ্য দল গঠনে চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী ছিলেন, এমন কি, শাসমলেব সংগঠন-শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা না পাইলে স্বরাজ্য দল যে এতখানি অগ্রসব হইত না, তাহা দেশবন্ধুর জীবন-চরিত-কাবগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীও একথা ভুলিয়া গিয়াছেন, শাসমল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে মেদিনীপুব জেলার কাঁথি-তমলুক ও ২৪ পরগণা জেলাব ডায়মণ্ড হারবার এই দুই কেন্দ্র হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেশবন্ধুকে মেদিনীপুরের আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি দেশবন্ধুকে সভাপতি করিবার জন্য নিজে সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। দেশবন্ধু সভাপতি হন। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ যে কোন দিন চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করিতে পারেন, তাহা একমাত্র পক্ষপাতদুষ্ট, অবিবেচক ও

চক্রান্তকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বলিবেন না। এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে, চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ্য দল' নাম দিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিলেও কেহ কখনও তাঁহাকে 'কংগ্রেস-বিদ্রোহী' বলিয়া অভিহিত করেন নাই।

এই সময় (১৯২২ খৃষ্টাব্দে) বাংলার কংগ্রেসে এক নূতন জিনিষের সূত্রপাত হয়। তাহার ফলে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের গতি বহুধা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইখানে চিত্তবঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতিনিষ্ঠার পরীক্ষা, আর বীরেন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠা ও নির্ভীক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। কারাগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের মধ্যে এক নূতন জিনিষ আমদানী করেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবীদিগকে ডাকিয়া কংগ্রেসের মধ্যে স্থান দেন এবং সেই সঙ্গে গান্ধীপন্থীদিগকে কংগ্রেসের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করেন। শাসমল চিত্তরঞ্জনের এই ব্যবস্থায় আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। এই ব্যাপার হইতে অহিংস কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে থাকে।

নবম পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডে বীরেন্দ্রনাথ

স্বরাজ্য দল হইতে কেবল যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার নির্দ্দেশ ছিল, তাহা নহে, স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশের নির্দ্দেশ ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের নির্ব্বাচনে মেদিনীপুর জেলাব কংগ্রেসকর্ম্মিগণ বীরেন্দ্রনাথকে নায়ক করিয়া জেলাবোর্ড অধিকার করেন। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এ সময়ও যে সরকার পক্ষের কেহ-কেহ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝিতে পাবা যায়।

General and Revenue Departments, Bengal
Darjeeling
3rd May.

Dear Mr. Sasmal

I have received your letter of the 27th. April. To be honest, I can not say that I welcome your appointment as Chairman of the D. Bd, Midnapore.

Personally I think that the proper development of a democratic form of Govt. in India must be based on representative village institutions and you will, I am sure, understand that I write in no unfriendly spirit, when I say that one finds it difficult to forget your work in bringing village self-govt. into disfavour and so setting back the clock. The non-co-operation movement could have been carried on without attacking these infant institutions whose potentialities most people admit. But I need not say any thing more about that.

You have been elected now to an important position and if the Minister confirms your election, you have a wide field of work in Midnapore and I shall be only too glad to give you all the help I can in discharging your duties.

26. 6. 23

I laid this aside waiting for the Minister's orders confirming you and then forgot about it. But I ought to have

written before to acknowledge your letter. I expect you find a great deal to do on the D. Bd. and I hope you will be able to give the work the time of needs. I am leaving Darjeeling to-morrow. It looks as though the monsoon has come at last.

Yours sincerely
(Sd) S. W. Goode

অর্থাৎ

বাঙ্গালাব সাধারণ ও রাজস্ব বিভাগ

দার্জ্জিলিঙ্
৩রা মে

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আমি আপনার ২৭শা এপ্রিল তারিখের পত্র পাইয়াছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমি একথা বলিতে পারি না যে, আমি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডেব চেয়াবম্যান পদে আপনার নিয়োগ পছন্দ করি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে কবি, ভারতের প্রকৃত গণতন্ত্র, প্রতিনিধিমূলক গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের উপর অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি নিশ্চিত জানি, আমি যে কোন প্রকার অপ্রীতিকব ভাব লইয়া ইহা লিখিতেছি না তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতেছি, আপনি গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনকে অশ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তুলিবার এবং একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারকে অনির্দ্দিষ্ট করিবাব পক্ষে যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা লোকে স্বীকাব করে। সেগুলিকে আক্রমণ না করিযা অসহযোগ আন্দোলন চালান যাইতে পারিত। কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাই না।

আপনি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনাব নির্ব্বাচন সমর্থন কবেন, তাহা হইলে আপনি মেদিনীপুবে কাজ কবিবার এক বিশাল ক্ষেত্র পাইবেন। আমি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতিশয় আনন্দের সহিত সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিব।

২৬।৬।২৩

আপনার নিয়োগ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনের আদেশের অপেক্ষা করিয়া এই পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং ইহার কথা ভুলিয়া

গিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বেই আপনার পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ লেখা আমার উচিত ছিল। আশা করি, আপনি জেলা বোর্ডে অনেক কাজ করিতে পারিবেন, এবং কাজের জন্য আবশ্যক সময়ও দিতে পারিবেন। আমি আগামী কল্য দার্জ্জিলিঙ পরিত্যাগ করিব। মনে হয় যেন এতদিনে বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়াছে।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষর) এস. ডব্লিউ. গুড

বীরেন্দ্রনাথের নিজ মুখে শুনিয়াছি—মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া তিনি প্রথমে ছয় মাস কাল জেলা বোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ও নিয়ম অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং জেলা বোর্ডের পুরাতন কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। পূর্ব্বতন জেলা বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাগণ কি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, কত টাকাই বা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, ব্যয় করিতে না পারিয়া সরকারকে তাঁহারা কত টাকাই বা ফেরৎ দিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি জানিতে পারেন। তিনি পুবাতন কাগজপত্র হইতে এই তথ্য জানিয়া বিশেষভাবে বিস্মিত হন যে, বিদেশী বৃটিশ সরকার জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়ের জন্য যে-অর্থ জেলা বোর্ডের হাতে দিতেন, পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ অনেক সময় তাহার সবটা জনকল্যাণে ব্যয় করিতে না পারিয়া অব্যয়িত অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিতেন। অথচ জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগেব প্রাদুর্ভাব ছিল, যথেষ্ট পানীয় জলের অভাবে লোকে কষ্ট পাইত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রয়োজনানুরূপ ছিল না। কাজেই জেলা বোর্ডের পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে কিরূপ মন লইয়া কতটা জন-কল্যাণ কবিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা যে আত্মপোষণ ও সরকার-তোষণে সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন তাহা বলাই বাহুল্য।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া নিরলস পরিশ্রম ও স্বার্থশূন্য সেবা দ্বারা মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা এক কথায় অতুলনীয়। ইহার পূর্ব্বে প্রায় ৪০ বৎসর কাল জেলা বোর্ড[১] ও লোক্যাল বোর্ড প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও জেলাবাসীর শতকরা ৯৫ জন লোক ইহার কাজকর্ম্ম ও আয়ব্যয় সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় অদ্ভুত কার্য্যক্ষমতা ও কর্ম্ম-কৌশলের বলে মেদিনীপুরের নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকেও জেলা বোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন।

(১) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা বোর্ড স্থাপিত হয়।

লোক্যাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কি, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কাহাদের, তাহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হয়, ভোট গ্রহণ কি—এই সব ব্যাপারে জেলাবাসী সকলেরই একটা ধারণা জন্মিয়াছে। নিরক্ষর কৃষককুল তাহাদের সুখ-সুবিধা দাবী করিতে শিখিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—জেলা বোর্ড তাহাদেরই প্রতিষ্ঠান। জেলা বোর্ডের অর্থ তাহাদেরই হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। জনসাধারণের মধ্যে এই যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হইয়াছে ইহার মূল শাসমলের যাদুকরী শক্তি। এখানেও আবার বলিতেছি, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন জনসাধারণের দরদী নেতা—আপন জন। জেলা বোর্ডের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য, দেশের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবাব উদ্দেশ্যে জেলার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবাব জন্য তিনি গ্রামে-গ্রামে ঘুবিয়া বেড়াইয়াছেন। কোথায় কত পরিমাণ রাস্তা প্রস্তুত করিলে সাধাবণেব সুবিধা হইবে, কোথায় বিদ্যালয় স্থাপন করিলে গ্রামবাসীর মঙ্গল হইবে, কোথায় কূয়া ও পুষ্করিণী খনন করিলে জলাভাব প্রকৃতই বিদূরিত হইবে, কোথায় ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে জনসাধারণের অসুবিধা হইবে না—তাহাবা ম্যালেবিয়া, কলেবা প্রভৃতি ব্যাধিব কবল হইতে রক্ষা পাইবে—এই সমস্ত বিষয় বীবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কেবলমাত্র জেলা বোর্ডের কর্ম্মচাবীদিগেব প্রদত্ত বিবরণেব উপর নির্ভব না কবিয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্ব বিষয়ে অনুসন্ধান কবিয়া দেখিতেন। জেলা বোর্ডের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত পুস্তক প্রচলন করিলে বালক-বালিকাগণের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহারা জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এমন পুস্তক প্রচলনেব জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। শিল্প শিক্ষার জন্য তিনি জেলা বোর্ড হইতে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে জাতীয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের কার্য্যকালে জেলা বোর্ডের কোন কর্ম্মচাবী অসন্তুষ্ট ছিলেন না। বীবেন্দ্রনাথ নিয়মশৃঙ্খলা উত্তমরূপে পালন করিয়া চলিতেন। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগ্রত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে দিকে তাঁহাব সতত দৃষ্টি থাকিত। জেলা বোর্ডের অর্থ জনসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য, কিসে জনসাধারণের এই অর্থ তাহাদের হিতের জন্য ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে পারেন বীরেন্দ্রনাথ সেজন্য নব-নব উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তিনি জেলা বোর্ডের আয় ও ব্যয় উভয়ই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা কালে বোর্ড কি কি কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার যে বিশদ বিবরণ আমার নিকটে ছিল তাহা বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ পুলিশের কবল হইতে রক্ষার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সহিত নানা স্থানে সরাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতেও সব কাগজপত্র অক্ষত রাখা সম্ভব হয় নাই। যে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নে একটা হিসাব দেওয়া গেল। ইহা দ্বারা বীরেন্দ্রনাথের সময়ের মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের কাজের সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকা একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

জেলা বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল (১) স্বাস্থ্যরক্ষা, (২) পানীয় জল সরববাহ, (৩) শিক্ষা বিস্তার ও (৪) রাস্তাঘাটের উন্নতি।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শাসমল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। তৎপূর্ব্বে ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র জেলায় জেলা বোর্ডের অধীনে (১) গেঁওখালি, (২) লালগড়, (৩) শালদা, (৪) এগরা, (৫) কেশিয়াড়ী, (৬) দাসপুব ও (৭) কোলা এই সাতটি মাত্র ডাক্তারখানা ছিল। কিন্তু শাসমল চেয়ারম্যান হওয়ার পর ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে (১) দাঁতন, (২) নন্দীগ্রাম, (৩) জনকা, (৪) পিংলা, (৫) রামনগর, (৬) নারায়ণ গড়, (৭) ভগবানপুর, ও (৮) প্রতাপপুর এই আটটি এবং ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে (১) প্রতাপদিঘী, (২) ময়না, (৩) মুরাদপুর, (৪) গড়বেতা, (৫) সুতাহাটা, (৬) সাহসপুব এবং আরও কয়েকটি স্থানে ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়।

১৯২৫-২৬ সালের হিসাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ

১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ শাসমল চেয়ারম্যান হওয়ার পূর্ব্ব বৎসরে) সমগ্র জেলায় ৪টি নূতন পুষ্করিণী মঞ্জুর ও খনন করা হয়, ২টি নূতন কূপ মঞ্জুর হয়। তাহার ১টি প্রস্তুত হয় এবং ৪৭টি কূপ মেরামত করা হয়। এই বৎসর পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৭১ হাজার টাকা খরচ বরাদ্দ করা হয়। অথচ ব্যয় করা হয় মাত্র ৮৬৮৪ টাকা।

শাসমলের নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডে প্রবেশের পর সম্পাদিত কাজের হিসাব পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল—

১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে নূতন পুষ্করিণী ৮৯টি মঞ্জুর করা হয়, ৮৬টি খনন করা হয়; নূতন কূপ ৫৩টি মঞ্জুর করা হয়, ৩৮টি খনন করা হয়; পুরাতন কূপ ৫১টি সংস্কার করা হয়।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে নূতন পুষ্করিণী ২১৫টি মঞ্জুর করা হয়, ১৯৬টি খনন করা হয়, নূতন কূপ ১৮২টি মঞ্জুর করা হয়, ১৩০টি খনন করা হয়; ৫৫৮টি পুরাতন পুষ্করিণী ও ৮৬টি পুবাতন কূপ সংস্কার করা হয়।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং উপদেশ দেওয়া হয় যে, বরাদ্দ টাকা নিঃশেষে ব্যয়িত হইলে প্রয়োজন মত অধিক অর্থ দেওয়া হইবে। তদনুসারে ঐ বৎসর এই বিভাগে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ২১৩ টাকা ব্যয় করা হয়।

শিক্ষা বিভাগ

শাসমলের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডে প্রবেশের পূর্ব্বে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দেব বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৫১ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। কংগ্রেস দল জেলা বোর্ডে প্রবেশের পব প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের জন্য ববাদ্দ হয় ৭১ হাজার টাকা এবং ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের জন্য বরাদ্দ হয় এক লক্ষ টাকা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহকে গৃহ নির্ম্মাণেব জন্য দেওয়া হয় ৬০ হাজার টাকা।

জেলা বোর্ড হইতে পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোলগুলিকে কিছুমাত্র সাহায্য দেওয়া হইত না। কংগ্রেস দল টোলগুলিকে বার্ষিক প্রায় আড়াই হাজাব টাকা সাহায্য দিতেন।

ব্যবহারিক ও তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে মাসিক ২০ টাকা হিসাবে প্রতি বৎসর ২০টি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শাসমল-চালিত কংগ্রেস দলের পক্ষে কিরূপে মাত্র তিন বৎসরে এত কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা বোর্ডের অর্থ অপব্যয়ের কিছুমাত্র সুবিধা বাখেন নাই, সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা নানা ভাবে জেলা বোর্ডের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে অব্যয়িত অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহারা ব্যয় করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা তিন বৎসরের আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যকলাপ হইতে তাঁহাদের

এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের কার্য্যকালে জন-কল্যাণে আয়ের অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া যান, তবে পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা জেলা বোর্ড দখল করিতে না পারিলেও, সে সময়ের জেলা বোর্ডের পরিচালকবর্গ তাঁহাদের সময়ের দেনা শোধ করিতে বাধ্য হইবেন।

বীরেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, সেই সময় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট লর্ড লিটনের সেক্রেটারী চেয়ারম্যানকে জানাইলেন—গভর্ণর বাহাদুর মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাইবেন। বীরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে জানাইলেন—"আমারও ভ্রমণ-তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ঐ সময় আমি বাহিরে থাকিব।" কিন্তু রায় বাহাদুর শীতলপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সরকারের একান্ত অনুগত কয়েকজন সদস্য জেলা বোর্ডের সভায় প্রস্তাব আনিলেন—গভর্ণরকে অভিনন্দন দেওয়া হউক। চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বহু পূর্ব্বে একবার এইরূপ অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু য়্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল ঐ খরচ না-মঞ্জুর করায় সদস্যবর্গকেই উহা বহন করিতে হয়।" রায় বাহাদুর প্রভৃতি সদস্যগণ বলেন—"বেশ এবারেও আমরাই দিব"। তখন চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"তাহা হইলে আর বোর্ডের সহিত উহার সম্পর্ক কি? প্রস্তাব বাতিল হইল। অন্য কাজ আরম্ভ হউক"। রায় বাহাদুর প্রভৃতি সদস্যগণ বোর্ডের সভা ত্যাগ করিলেন। মেদিনীপুরে লাট সাহেবের আগমন সম্পর্কে মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হিউবার্ট গ্রেহাম ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

গ্রেহামের পত্র

Midnapore
4. 10. 23.

Dear Mr. Sasmal

I should esteem it a great favour if you could come and see me now or as soon as convenient to you before 10 a. m. to-day. I wish to discuss with you the subject of calling a public meeting in the matter of His Excellency's visit. Kindly excuse this short notice.

Yours sincerely
(Sd) Hubert Graham

অর্থাৎ

মেদিনীপুর,
৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ শাসমল

আপনি যদি এখন অথবা আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বে আপনার সুবিধা মত সময়ে আসিয়া আমার সহিত দেখা করেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। গভর্ণর বাহাদুরের আগমন সম্পর্কে একটি সাধারণ সভা আহ্বান বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা কবিতে ইচ্ছা করি। অল্প সময় দিয়া আপনাকে জানাইবার জন্য ক্ষমা করিবেন।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) হিউবার্ট গ্রেহাম

বীরেন্দ্রনাথের পত্র

Midnapore
4 10. 23

Dear Mr. Graham,

Kindly do not misunderstand me as to what I am writing below. I did not want to tell anybody about my own mentality regarding the visit, but you have forced me to do so at this stage. The duties are coming and one ought to be very careful about his own future.

I am sorry I can not personally take part in His Excellency's visit to this place. My reason is obvious. The government which sent me to jail without any evidence whatever can not expect co-operation from me on an occasion like this. I say "personally", because you have addressed me not as Chairman. I would beseech you to consider my personal feeling in this matter and excuse me for my inability to go to your place now.

Yours sincerely
(Sd) B. N. Sasmal

অর্থাৎ

মেদিনীপুর,
৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ গ্রেহাম

আমি নিম্নে যাহা লিখিতেছি তাহা হইতে আমাকে ভুল বুঝিবেন না। (গভর্ণর বাহাদুরের) আগমন সম্বন্ধে আমার নিজের মনোভাব কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আপনি আমাকে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। কর্ত্তব্য সমাগত, প্রত্যেকেরই তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত।

গভর্ণর বাহাদুরের এখানে আগমনে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিতে পাবি না, এজন্য দুঃখিত, কারণ সুস্পষ্ট। যে গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা প্রমাণে জেলে পাঠাইয়াছিলেন সেই গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার নিকট হইতে কোন প্রকার সহযোগিতা আশা করিতে পাবেন না। 'ব্যক্তিগতভাবে' এই কথা বলিবার কারণ এই যে, আপনি আমাকে চেয়ারম্যান হিসাবে পত্র লিখেন নাই। বর্ত্তমান বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মনোভাব বিবেচনা করিতে এবং এখন আপনার নিকটে যাইতে না পারায় ক্ষমা করিতে অনুরোধ করি।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) বি. এন. শাসমল

গ্রেহামের পত্র

Midnapore
4. 10. 23

Dear Mr. Sasmal,

I am obliged to you for your note in which you have placed your views and your position before me. I assure you that I appreciate very much the courteous manner in which you have placed your refusal. Under the circumstances no useful purpose would be served by our meeting at the present stage,

Yours sincerely
(Sd) Hubert Graham

অর্থাৎ

মেদিনীপুর
৪।১০।২৩

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আপনার পত্র পাইয়া বাধিত হইলাম। আপনি পত্রে আপনার মনোভাব ও অবস্থার কথা বিবৃতি করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, আপনি যে প্রকার সৌজন্য সহকারে আপনার অসম্মতি জানাইয়াছেন তাহা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এই অবস্থায় আপনার ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎ হইলেও ফললাভ হইবে না।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) হিউবার্ট গ্রেহাম

এই সময় মেদিনীপুর জেলায় যে কয়জন আই. সি এস সরকারী অফিসার ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ছিলেন ইউরোপীয়। ইঁহারা সকলেই জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জেলা বোর্ডের এক সভায় একটি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ঘটনার পর সরকার-মনোনীত সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী চেয়ারম্যানের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জেলার মধ্যে ৭৮টী সভায় বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। নির্দিষ্ট দিনে সভা আরম্ভ হইলে ভাদুড়ী বলেন, "আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি।" চেয়ারম্যান বলিলেন, "তাহা এখন কিরূপে সম্ভব ?"

অবশেষে ভাদুড়ী আর কখনও এরূপ প্রস্তাব আনিবেন না প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি পান। যখন জেলা বোর্ডে এইরূপ ব্যাপার, তখন একদিন মেদিনীপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে (বীরেন্দ্রনাথকে) তাঁহার বাংলায় কোন কারণে আহ্বান করেন। বীরেন্দ্রনাথ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় দেখা করিতে যান নাই। অধিকন্তু তিনি পত্র লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে যাহা জানাইয়াছিলেন তাহার অর্থ এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি দরকার মনে করেন তবে তিনি চেয়ারম্যানের অফিসে আসিয়া বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে দেখা করিতে পারেন। পরাধীন জাতির কয়জন পুরুষ এরূপ ভাবে স্বীয় তেজস্বিতার

পরিচয় দিয়াছেন! যে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়াছিল সেই মেদিনীপুর বীরেন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়াছে। ধন্য মেদিনীপুর! কিন্তু দুঃখ এই যে, তুমি এখনও তোমার প্রতিবেশী কর্তৃক উপেক্ষিত-ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছ। তোমার অপরাধ—তোমার সরলপ্রাণ, স্বাধীনচিত্ত, বীরহৃদয় সন্তানগণ অপরের তোষামোদ করিতে পারে না, তাহারা চালাকী দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে ও অতি-সস্তায় নাম জাহির করিতে অক্ষম এবং সর্ব্বোপরি উচ্চশির অবনত করিতে একেবারে বিমুখ।

বাংলার কেন্দ্রস্থল ঐ মেদিনীপুর। ইহাকে শাসমল শিশুর মত লালন-পালন করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী ইহা ভুলিলেও কাল ভুলিবে না। মেদিনীপুর শাসমলকে পাইয়াছিল। মেদিনীপুবেব ক্ষুব্ধ অন্তর শাসমলেরই আত্মাব জন্য গুম্‌রাইতেছে। বাংলার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মেদিনীপুরে আগুন জ্বালাইয়া গিয়াছে। কত প্রাণ সেই শিখায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরেব অন্তর-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আরও কত প্রাণ বিলীন হইয়া যাইবে। মেদিনীপুরের অতীত উজ্জ্বল, বর্ত্তমান চঞ্চল—ভবিষ্যৎ নিশ্চিতই সুখময়। সেখানকাব পটভূমিতে বৈচিত্র্যময়তায় ছন্দ চলিতেছে। মেদিনীপুর আজ গুম্‌রাইবে, কিন্তু ইহাব মধ্য হইতেই সে শক্তির বিকাশসাধন করিবে।*

* আমার এই মন্তব্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের। উহার তিন বৎসর পরে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আগষ্ট বিপ্লব নামে বিখ্যাত যে গণ-আন্দোলন জাগিয়া উঠে, তাহাতেও মেদিনীপুর তাহার শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু তাহার ইতিহাস একদল পরশ্রীকাতর বাঙালী বিকৃত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বীরেন্দ্রনাথ

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে আবার এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। কংগ্রেসীগণ প্রায় সকলেই স্বরাজ্য দলের মনোনীত ব্যক্তিকে সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার জন্য ভোট সংগ্রহে মাতিয়া গেলেন। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ জেলা মেদিনীপুরের কাঁথি-তমলুক যুক্তকেন্দ্র হইতে সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। আর তিনি সেই সঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবাব কেন্দ্র হইতেও সভ্যপদপ্রার্থী হইলেন। যখন ভোট গণনার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, বীরেন্দ্রনাথ উভয় কেন্দ্র হইতেই সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে দুই বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথের মত আর কেহ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতে জানিতেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনকে লইয়া যাইতে হইবে। সেজন্য তিনি তাঁহার নিজ জেলার আসনখানি চিত্তরঞ্জনকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথের যে কেবল রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তিনি যে চিত্তরঞ্জনকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ প৾ওয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মেদিনীপুর হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন, কাজেই চিত্তরঞ্জনকে মেদিনীপুরের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিবার অধিকার মেদিনীপুরবাসীর আছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন চালিত স্বরাজ্য দলের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে একটা ভীষণ ভ্রান্তি বা অন্যায় ঘটিয়াছিল মনে করি। উহাকে চিত্তরঞ্জনের বিজয় বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও, পরবর্ত্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করিতেছে যে, উহা চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব। ঐ নির্বাচনের সময় তিনি ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর নির্বাচন কেন্দ্রে স্যার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে স্বরাজ্য দলের মনোনয়ন দেন। তখন চিত্তরঞ্জনের যেরূপ প্রতিপত্তি, তাহাতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ ভারতে রাষ্ট্রীয় চেতনা বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার অগ্রদূত ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রধান নেতা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার মানিয়া লইয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনে বাংলার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সেজন্য তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট হইতে অনেক তিরস্কার ও লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল। সে-সময় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজের (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ছাত্রগণ তাঁহার উপর পাদুকা নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ছাত্রগণ তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথকে যাহারা লাঞ্ছিত করিয়াছিল বা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার প্ররোচনা দিয়াছিল, তাহারা আদৌ উচিত কাজ ত করে নাই, অধিকন্তু গর্হিত কাজ করিয়াছিল বলিতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথ যে-সময় বিদেশী সরকারের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ১৮ বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে অসহযোগী গান্ধীজী তাঁহার প্রিয় অনুচর-দিগকে সেই বিদেশী অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মহামতি গোখেল যে বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আজ যাহা চিন্তা করে, অন্যান্য ভারতবাসী পরদিন তাহা চিন্তা করে (What Bengal thinks to-day, the rest of India thinks to-morrow), সেকথা এক্ষেত্রেও সত্য। ভারতে বৃটিশ সরকারের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজীর বহু পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কেবল বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকার করা হইবে না বলিয়া বাঙ্গালীর রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিকে দল বাঁধিয়া নস্যাৎ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে স্বরাজ্য দলের মনোনয়ন না দিলেই ভাল করিতেন। সুরেন্দ্রনাথকে নির্বাচনে পরাজিত করায় তাঁহার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হইয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে কলিকাতা কর্পোরেশনে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং চেয়ারম্যানের পদের পরিবর্ত্তে মেয়রের পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই কলিকাতা কর্পোরেশনই পরে বাংলার বিশেষতঃ কলিকাতার অনেক কংগ্রেস নেতার বহুবিধ কলহ-বিবাদ, মারামারি এমন কি ইতরামির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গালী আজ যে-সব কারণে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান কারণগুলির দুইটি হইল সুরেন্দ্রনাথকে অপমান ও চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথকে সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার সৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে উৎসাহী হইয়াছিলেন—তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বীরেন্দ্রনাথের উপর স্বরাজ্য দলের কাজ পরিচালিত করিবার ভার ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি স্বরাজ্য দলেব হুইপ ছিলেন। স্বরাজ্য দল পরিচালনে বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের উপযুক্ত সহকর্ম্মী। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদিগের সহিত যে চুক্তি করেন, একমাত্র শাসমলই তাহার পোষকতা করিতেন এবং এইজন্য তাঁহাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার একদল লোক বলিত—"শাসমল, ও মুসলমানের সামিল, ও মুসলমানের সঙ্গে চুক্তি করবে এ আর আশ্চর্য্য কি?" বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না। কোন কারণে কোন সময়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে মতভেদ হইলে বীরেন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা অপরের মনঃপূত বা প্রীতিকর হইবে কিনা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুস্পষ্ট অথচ দৃঢ়ভাবে সেই সত্য প্রকাশ করিতেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি ব্যবহারেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের মত নেতাকেও বীরেন্দ্রনাথ আপনার পরিচ্ছন্ন অভিমত জ্ঞাপন করিতে অথবা আবশ্যক হইলে তাঁহার ত্রুটি প্রদর্শন কবিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি চিত্তরঞ্জনের কথা মানিয়া চলিতেন। কিন্তু কোন সময় তাহা বিবেক-বিরোধী বোধ হইলে তিনি সেই কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভুলিতেন না। তৎকালে একমাত্র বীরেন্দ্রনাথই চিত্তরঞ্জনের কথার বিরোধিতা করিতে বা তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে সাহসী ও সমর্থ ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশে স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা প্রদর্শন করিবার জন্য নায়ক চিত্তরঞ্জনকে নানা ফন্দী-ফিকির অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের ভক্ত, তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্যদল-মনোনীত সভ্য ৺হেমন্তকুমার সরকার 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"দেশবন্ধু ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট ন্যাশ্‌ন্যালিষ্ট দল ও মুসলমান দলের কয়েকজনের

সহিত রফা করিয়া তিন-তিন বার মন্ত্রিগণের বেতন নাকচ প্রস্তাব পাশ করেন। এই অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া তাঁহাকে কত প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনুরোধ, উপরোধ, আবদার তো ছিলই, এমন কি, রংপুরের একজন সভ্যের পায়ের নিকটে হাত রাখিতেও দেখিয়াছি।" চিত্তরঞ্জনের এইভাবে জোড়াতালি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টার মধ্য দিয়া স্বরাজ্য দলে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়াড' কাগজের সম্পাদক হওয়ার কথা বীরেন্দ্রনাথকে জানান। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সুভাষবাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হইয়া কংগ্রেসের নীতিবিরোধী লোকদিগের প্রতি নানাভাবে রাজনৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করায় শাসমল বুঝিতে পারেন যে, সুভাষবাবু 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক হইলে তাঁহার পক্ষে ঐ কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কবা সম্ভব হইবে না। সেই জন্য তিনি স্বেচ্ছায় 'ফরোয়াড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদ ত্যাগ করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন নূতন সংস্কৃত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংস্কৃত আইনে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির 'কলিকাতা কর্পোরেশন' নাম হয় এবং চেয়ারম্যানের পবিবর্ত্তে নূতন মেয়রের পদ সৃষ্টি হয়। এই মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনেও স্বরাজ্য দল চিত্তরঞ্জনকে পুরোভাগে রাখিয়া কর্পোরেশন দখল করে। চিত্তরঞ্জন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেব ১৬ই এপ্রিল মেয়র নির্ব্বাচিত হন। কর্পোরেশন অধিকার করার পর চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথকে কর্পোরেশনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার (Chief Executive Officer) পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেহ-কেহ শাসমল 'মাহিষ্য' বলিয়া আপত্তি তুলিতে থাকেন এবং চিত্তরঞ্জনের নিকট সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদেরই প্ররোচনায় চিত্তরঞ্জনও সুভাষচন্দ্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। এই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিয়োগ ব্যাপার লইয়া কেহ-কেহ শাসমলকেই দোষান্বিত করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে শাসমল চিত্তরঞ্জনকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশনে

এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন চিত্তরঞ্জন কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। ইহার দিন কয়েক পরে বীরেন্দ্রনাথের বাসায় তাঁহার পরিচিত দুই তিনটি যুবক উপস্থিত হইয়া বলে, "মশায়, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি একটু শোনেন, ভাল হয়।" শাসমল পূর্ব্ব হইতেই ঐ যুবকদের মতি-গতি জানিতেন। তিনি বলেন—"তোমরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাচ্ছ তা আমার কাছে গ্রহণীয় নয় জেনেও এসেছ। তবে বল্‌তে চাও বল।" তখন জনৈক যুবক বলে, "কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফের পোষ্ট নিয়ে গোলমাল চলেছে, তা'ত আপনি শুনেছেন। আমাদের দলের একজন মাসিক পাঁচ শত টাকা নিয়ে বাকী টাকাটা আমাদের দলের ফাণ্ডে দিতে রাজী আছেন। এখন আপনি যদি মাসে পাঁচ শত টাকা নিয়ে বাকী টাকাটা আমাদের ফণ্ডে দিতে রাজী হন, তা'হ'লে আমবা দেশবন্ধুর কাছে আপনার নাম প্রস্তাব করি। দেশবন্ধু নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজী হবেন। তা হলেই গোলমাল চুকে যায়।"

ইহাতে বীবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া যুবকদিগকে কিল-চড মাবিযা গলা ধাক্কা দিয়া তাঁহার বাসা হইতে তাডাইয়া দেন। আমাদেব মনে হয়, এই যুবকেবা কেবলমাত্র বীবেন্দ্রনাথের মন ও মত পবীক্ষা কবিবার জন্য একটা অজুহাত অবলম্বন কবিয়া আসিয়াছিল। তাহাবা ভালভাবেই জানিত—বীরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে কখনই রাজী হইতে পারেন না। তবু যাই একবাব জ্বালাতন কবিয়া আসি। এই যুবকেব দল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগব অধিবেশনে সভাপতিব (বীরেন্দ্রনাথের) অভিভাষণেব মিথ্যা ত্রুটি উল্লেখ করিয়া কুৎসিত কলহ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং পবে তাঁহার উপব অন্যায়ভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পরে আইন সভাব সভ্য, কেহ বা অহিংস কংগ্রেসের তথাকথিত নেতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা শাসমলের নামে জলগ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। কারণ সব পার্থক্যের সহিত আপোষ সম্ভব হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জাতিবিদ্বেষ মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিয়া বলেন —"আপনি বিপ্লবী (revolutionary)-দিগকে কংগ্রেসে আসিতে দিতেছেন। তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের দলের কাজ করিতেছে।"

চিত্তরঞ্জন বলেন—"তাহারা চারি আনা চাঁদা দিয়াছে, সুতরাং তাহারা থাকিবে।" (বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য হওয়ার চাঁদা চারি আনা) তখন শাসমল বলেন,—"ইহার জন্য যদি কংগ্রেস কখনও জাহান্নামে যায় তখন আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।" ইহার পর শাসমল চলিয়া যান।

সে-দিন রাত্রে যুবকগণ বীরেন্দ্রনাথকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা তিনি শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রভৃতি সহকর্ম্মীদিগকে জানান। অনিলবাবু বলেন—"এখানে (অর্থাৎ কংগ্রেসে) merit অর্থাৎ গুণের স্থান নাই।" তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। অনিলবাবু অনুসন্ধানের পর বীরেন্দ্রনাথকে জানান যে, ৬।৭টি দল সুভাষবাবুকে দাঁড় করাইয়াছে। অনিলবাবু সকল দলকে শাসমলের অনুকূলে রাজী করাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একটি দলকে রাজী করাইতে পারেন নাই, তাহা revolutionary (বিপ্লবী) দল।

এই সব ব্যাপার চিত্তরঞ্জনের কর্ণগোচর হয়। তিনি পরলোকগত আবুল কালাম আজাদকে দিয়া শাসমলকে ডাকিয়া পাঠান। শাসমল চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, "তুমি Chief Executive Officer (প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা) হইবে ঠিক হইয়া রহিয়াছে, তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন?" তখন শাসমল বলেন—"বড় বড় কাউন্সিলার (সভ্য) আমাকে বলিয়াছেন, আপনি সুভাষবাবুকে ভোট দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।" চিত্তরঞ্জন বলেন—"উহা মিথ্যা কথা।" তখন বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"তাহা হইলে আপনি party meetingএ (অর্থাৎ স্বরাজ্য-দলের সভায়) বলিয়া দিবেন যে, আপনি সুভাষবাবুর পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তাহার পর যাহা হয় হইবে।" এই প্রস্তাবে চিত্তরঞ্জন সম্মত হন।

ইহার দুই-এক দিন পরে (তৎকালে জীবিত এখন পরলোকগত) নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে স্বরাজ্য-দলের সভা হয়। তাহাতে রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদের জন্য শাসমলের নাম প্রস্তাব করেন এবং নসিম আলি[১] তাহা সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের যে statement (অর্থাৎ বিবৃতি) দেওয়ার কথা ছিল তাহা তিনি দেন নাই। ভোটের সময়

(১) ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ইনি এখন পরলোকগত।

বীরেন্দ্রনাথের নাম টিকিল না। সুভাষবাবু স্বরাজ্য-দলের পক্ষ হইতে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাপদে মনোনীত হইলেন। ইহার পর ২৪শা এপ্রিল কর্পোরেশনের সভায় মাসিক ১৫০০ (পনর শত টাকা) বেতনে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন।

চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত হেমন্তকুমার সরকার তাঁহার "দেশবন্ধু-স্মৃতি" পুস্তকের ৫০তম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সে-বার নদীয়া জেলার ভেড়ামারা গ্রামে নদীয়া জেলা প্রজা কন্‌ফারেন্‌সের (অর্থাৎ প্রজা সম্মেলনের) অধিবেশন ছিল। আমি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং দেশবন্ধু সে সভায় উপস্থিত হওয়াতে বিস্তর জনসমাগম হইয়াছিল। ভেড়ামারায় যেখানে দেশবন্ধু ছিলেন, মিঃ এ. সি. ব্যানার্জ্জিও সেইখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কথায়-কথায় বুঝা গেল, মিঃ ব্যানার্জ্জি কর্পোরেশনের চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসারের পদপ্রার্থী হইয়া এই সুযোগে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আসিবার আগে শ্রীযুক্ত বীরেন শাসমল আমায় বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনের ঐ পদে দেশবন্ধু যদি তাঁহাকে মনোনীত করেন, তাহা হইলে তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা মাত্র য়্যালাউয়েন্‌স্ লইয়া কাজ করিতে রাজী আছেন।[১] মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবের পব সুযোগ বুঝিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের কথা জানাইলাম। দেশবন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, বীরেন দরখাস্ত করলে আমি বাঁচি। হরিধন দত্ত, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ও জে. সি মুখার্জ্জী তিনজনে ধরেছে। বীরেনের নাম প্রস্তাব হলে এদের আমি সাফ জবাব দিতে পাবি। ভেড়ামারা হইতে ফিবিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলকে দেশবন্ধুর মনোভাব জানাইলাম। কিন্তু এই কথা প্রচার হইবামাত্র কলিকাতার দলের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়া গেল। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' এসে কলিকাতায় বাজত্ব করবে?—একথাটাও দলের একজন পাণ্ডার মুখে শুনা গেল। শাসমলকে হঠাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে নানা ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টিতে ভোটের সময় শাসমলের নাম টিকিল না। দেশবন্ধুও দলভঙ্গের ভয়ে আর জোর করিতে পারিলেন না।"

(১) শাসমল যে মাসিক মাত্র পাঁচশত টাকা মাহিনা লইয়া কলিকাতা করপোরেশনের চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসারের কাজ করিতে রাজী ছিলেন, তাহা তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের কলিকাতার ক্যাপিট্যাল (Capital) পত্রিকা কলিকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে স্বরাজ্য দলের মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

On the command of Mr. C. R. Das, the Mayor, the Swarajists in the Calcutta Corporation at the meeting last week elected Mr. Subhas Chandra Basu, his well-behaved disciple, as Chief Executive Officer on Rs. 1500 per mensem.

There have been many farces played in the hall of Calcutta Corporation, but none so droll as this. It had been originally decided by the Swarajist caucus to reward the services of Mr. Sasmal with the glittering job of Chief Executive Officer. Later on it was discoursed that his preferment would offend the 'Kayastha clique', a risk Boss-Dass could not afford to run. So the strong man of Midnapore was pushed out of the way to make room for the Ex-Civil Servant who boldly left the celestials to become a non-co-operator.

অর্থাৎ মিঃ সি. আর. দাশের আদেশে গত সপ্তাহে করপোরেশনে স্বরাজ্য-দলের সভ্যগণ এক সভায় তাঁহার সুশীল শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসুকে মাসিক পনর শত টাকা বেতনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতা কবপোরেশনের কক্ষে অনেক প্রহসন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন হাস্যকর ব্যাপার আর ঘটে নাই। প্রথমে স্বরাজী সভ্যগণ মিঃ শাসমলকে লোভনীয় চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কর্ম্মের পুবস্কার দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে যে, মিঃ শাসমলকে চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে নিয়োগ করিলে মতলববাজ কায়স্থগণ চটিয়া যাইবেন। দলপতি দাশ এই বিপদের সম্মুখীন হইতে অপারগ। যে পূর্ব্বতন সিভিলিয়ান অসহযোগী হইবার জন্য দিব্য আরামের চাকুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই উক্ত পদে বসাইবার জন্য মেদিনীপুরের বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে সজোরে সরাইয়া দিয়া কোণঠাসা করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

উল্লিখিত প্রকারের অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি বাংলার শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রে নহে, অন্যান্য বহু জনহিতকর ব্যাপারে তুষের আগুনের ন্যায় ধূমায়িত হইতে

থাকায় বাংলার অবস্থা আজ এমন কাজিযাময়। এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তবে যদি কখনও এই বিশাল ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উল্লিখিত-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অর্জিত হয়, তবে তাহাতে নিষ্পেষিত ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখ আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহাদের দুঃখরজনী প্রভাত হইবে না। তাহারা আজ যে তিমিরে কাল হরণ করিতেছে[১] তাহাদিগকে সেই তিমিরে কত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিমজ্জিত থাকিতে হইবে।

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবনে শাসমল যে কিরূপ জড়িত ছিলেন তাহা পাঠক-পাঠিকাগণকে একে-একে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া একটা মুখের কথা বলিতে পারিলেন না। কি অবস্থা-বিপাকে পতিত হইয়া তিনি এরূপ বিসদৃশ আচরণ করিতেছেন, সে-বিষয়ে একবার সহকর্মী শাসমলের সহিত পরামর্শ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন। তিনি যাঁহার সহিত অহিংস আন্দোলনের প্রারম্ভ বা পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, যিনি অবিচার পাইয়াও প্রতিহিংসা পোষণ না করিয়া নীরবে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যান, তাঁহাকে একটা কথা বলা তিনি দরকার মনে করিলেন না। চিত্তরঞ্জন শাসমলকে একখানি পত্র লিখিয়া করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের (প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার) পদে সুভাষচন্দ্রের নিয়োগের কথা জানাইয়া দিলেন। তিনি যে বীরেন্দ্রনাথের সহিত আর এক যোগে কাজ করিতে পারেন না বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, এই কথাটাই যেন দেশবন্ধুর পত্র লেখার রীতির মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। চিত্তরঞ্জন তথা স্বরাজ্য দলের উপর কোন্ দুষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইল? দলের প্রাধান্য ও জাতি-বিদ্বেষের প্রাধান্য।

জাতি-বিদ্বেষের কথায় কেবলমাত্র বলিতে পারি, বিবেকানন্দ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে দিউমানজি সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ঈর্ষ্যাক্রান্ত জাতি। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, এই ঈর্ষ্যার উৎপত্তি সভ্যতার চাপে।

(১) ইহা ১৯৩৯ সালের মন্তব্য। খণ্ডিত ভারতের শাসনশক্তি বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীদের হাতে আসার পরে আজ ১৯৬১ সালে এই মন্তব্য পরিবর্ত্তনের আদৌ প্রয়োজন নাই।

ইহা যৌনক্ষুণ্ণ বাঙ্গালী হিন্দুর অস্থিরাত্মক মনের উপর অপরিবর্ত্তনীয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যক্তিকরণ। শ্রেণীউচ্চতার পরিচয় কি এই সর্পিল গতিতে ?

বীরেন্দ্রনাথের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি এই জন্য ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইলেন যে, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহাকে জাতিতে ছোট বলিয়া ও মতভেদের জন্য দলাদলি করিয়া তাড়াইয়া দিল। এই ব্যাপারে চালাকী বা কৌশলজাল যে কোথায় তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর চলিয়া গেলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতে তিনি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরের রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন।

শাসমলের প্রতি অবিচারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনোবেদনা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১১শা সেপ্টেম্বর তারিখে বীরেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রের এক স্থানে বলিয়াছেন—"আপনার Public Life (জনসেবার ক্ষেত্র) হইতে বিদায় গ্রহণ দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্য। তবে একথাও বলি স্বরাজ্য দল যেরূপ নৈতিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার বলে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞান-বিশিষ্ট লোক ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না। আমি কাঁথির জনসাধারণের সভায় বলিয়াছিলাম যে, দেশবন্ধুর পরই আপনার স্বার্থত্যাগ—স্বয়ং ঋণজালে জড়িত এবং পুনরায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন কিনা জানি না। আপনি যদি Practice (আইন ব্যবসায়) না করেন, তবে সংসার কি প্রকারে চালাইবেন বুঝি না। কলিকাতা করপোরেশনের Chief Executive Officer (চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার)-এর পদ আপনারই প্রাপ্য জানিতাম। কিন্তু স্বরাজ্য দলের কি অভিসন্ধি ছিল জানি না। আপনাকে চালাকী করিয়া ignore (উপেক্ষা) করিল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্ব ও বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি অর্থাভাবে কিছু-কিছু পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বাংলার বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনের মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নিকট অনুরোধ আসে। তিনি মন্ত্রীর পদ গ্রহণে অসম্মত হন। এই সময় বীরেন্দ্রনাথের দারুণ অর্থাভাবের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার কোন-কোন বন্ধু তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে জিদ করেন। কিন্তু শাসমল আপন কর্ত্তব্যে অটল, সেখানে বন্ধুত্বের প্রশ্ন নাই, আত্মীয়তার কথা নাই, আছে নৈতিক কঠোরতা ও নির্ম্মম সংযম। এই ভাবে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া যেমন তিনি একদিকে তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হইয়াছিলেন এবং আর্থিক দুর্গতি দূরীকরণের সহজ উপায় পরিহার করিয়া পারিবারিক দৈন্য ও ঋণজাল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি আপনাকে কঠোর পরীক্ষাগ্নির মধ্যে তিলে-তিলে দগ্ধ করিয়া মহীয়ান্ ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সহজ পথের পথিক নয়, দুর্গম বন্ধুর পথের তিতিক্ষা-পরায়ণ অক্লান্ত যাত্রী। ইহা বীরেন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন স্বরাজী গ্রেপ্তার হন। তখন চিত্তরঞ্জন সিমলায় ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল—তিনিও গ্রেপ্তার হইবেন। তিনি সিমলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য শাসমলকে একখানি পত্র লিখেন। স্বর্গীয় ডাঃ জে. এম্ দাশগুপ্ত সেই পত্র লইয়া মেদিনীপুরে শাসমলের নিকট যান।

চিত্তরঞ্জনের পত্র

148, Russa Road South
1 11-24

Dear Sasmal,

We are now face to face with a crisis and want you very badly. I expect you to forgive and forget and rise to the

occasion. I may be taken away any day. Now that the conservatives have come in to power Bengal expects you to lead. Das Gupta is going with this letter and will explain everything to you.

Yours affectionately
(Sd) C. R. Das.

অর্থাৎ

১৪৮, রসা রোড সাউথ
১।১১।২৪

প্রিয় শাসমল,

আমরা এখন সঙ্কটের সম্মুখীন এবং তোমাকে আমাদের নিতান্ত দরকার। আমি আশা করি, তুমি পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া ক্ষমা করিবে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করিবে। আমাকে যে কোন দিন ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। রক্ষণশীল দল শক্তিশালী হইয়াছে, বাংলাদেশ তোমার নেতৃত্বের আশা করে। দাশগুপ্ত এই পত্র লইয়া যাইতেছেন। তিনি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন।

স্নেহাসক্ত
(স্বাক্ষর) সি. আর দাশ

চিত্তরঞ্জনের পত্র পাঠ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই সময় দাশগুপ্ত মহাশয়ের একজন সঙ্গী বলেন—unless you connive with the revolutionaries, it will not be a bed of roses অর্থাৎ যদি আপনি বিপ্লববাদীদের সহিত মিলিত না হন, তাহা হইলে আপনার পক্ষে কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ আদৌ সুখদায়ক হইবে না। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের কথামত বাংলার কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আর কলিকাতা গেলেন না, এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া বিষণ্ণভাবে সরলান্তঃকরণে ডাঃ দাশগুপ্তকে বিদায় দিলেন।

স্বরাজ্য দল ও আইন সভা ত্যাগ এবং পুনরায় ব্যবসায়ে যোগদান

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শাসমলের জীবনে কয়েকটি ব্যাপার দেখা যায়। এই সময় তিনি এক সঙ্গে স্বরাজ্য দলের সদস্য পদ ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য

পদ ত্যাগ করেন। আর বাংলায় আইন সভায় সদস্য পদ-ত্যাগ এই প্রথম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে অর্থাভাব মোচনে নিরুপায় হইয়া তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

চিত্তরঞ্জনকে সহায়তা দান

বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের গলদ বুঝিয়া ও আইন সভায় দলের সদস্যদের মতিগতির অবনতি দেখিয়া স্বরাজ্য দল পরিত্যাগ করিলেও ব্যক্তিগতভাবে চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার কোন প্রকারের মনোমালিন্য হয় নাই বা তিনি চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে স্বরাজ্য দলকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শাসমল বঙ্গীয় আইন সভায় তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিলে পরলোকগত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডায়মণ্ড হারবার হইতে আইন সভার সভ্যপদ-প্রার্থী হন। সেই সময় চক্রবর্ত্তীর দল ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে সভা করিতে গিয়া দেখিতে পান, সভার জন্য লোকজন সমবেত হয় না। চক্রবর্ত্তী স্বরাজ্য দলভুক্ত না হইলেও তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে সেখানে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের পোষকতা করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কাজেই বে-গতিক দেখিয়া চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া কয়েক দিবস অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাচন কার্য্যে সাহায্য করেন। ফলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আইন সভার সভ্যপদ লাভ করেন।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার কথা হয়। অধিকাংশ ভোটে বীরেন্দ্রনাথ সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সংবাদ যখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বীরেন্দ্রনাথের কাছে পৌছে, তখন তমলুকে স্বদেশী মেলা বসিয়াছিল। তাহাতে ফরিদপুরের কর্ম্মী ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়[১] যোগ দেন। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ প্রতাপ-বাবুকে বলেন—"আমি ফরিদপুরে সভাপতি হইলে বলিব যে, কংগ্রেসে

(১) বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান।

ex-revolutionary (ভূতপূর্ব বিপ্লবী)-গণ কার্য্য করিতেছে। কংগ্রেস হইতে তাহাদের সরিয়া দাঁড়ান উচিত। ইহাতে দেশবন্ধু ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি যদি রাজী হন, তবে আমি সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিব, নতুবা নহে।"

এ সম্বন্ধে পরে বীরেন্দ্রনাথকে কেহ কিছু অবগত করান আবশ্যক বোধ করেন নাই।

তারপর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণে বীরেন্দ্রনাথের মতামত জানিবার জন্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির নিকট হইতে তাঁহার নিকট পত্র আসে। শাসমল প্রতাপ-বাবুর নিকট যে-কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কোন জবাব না পাইয়া অবস্থা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই তিনি সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। বাংলার ইতিহাসে মতভেদের জন্য এই প্রকার সম্মানজনক পদ প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন যে, যে কারণে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হইতেছেন তাহা প্রকাশ পাইলে কংগ্রেস ও সেই সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের শত্রুপক্ষের নিকট তাহা প্রীতিকর হইবে ; সেইজন্য তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়া জানান যে, তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া সভাপতির পদ গ্রহণে অক্ষম। এই সময় মেদিনীপুরের ৺রামসুন্দর সিংহ প্রভৃতি কয়েক জন কংগ্রেস-কর্ম্মী বীরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—আপনাকে shot dead (অর্থাৎ গুলি করিয়া হত্যা) করা উচিত।

চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হন। সেখানে ভূতপূর্ব বিপ্লবীদের সহিত তাঁহার তুমুল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। চিত্তরঞ্জন বলেন—আমি যে সকল political prisoner (রাজনৈতিক বন্দী)-কে revolutionary (বিপ্লবী) বলিয়া জানি না, কেবল তাহাদের release (অর্থাৎ মুক্তি)-এর জন্য resolution (প্রস্তাব) করিতে পারি। তাঁহারই আহূত revolutionary (বিপ্লবী)-গণ জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কাহাকে revolutionary (বিপ্লবী) বলিয়া জানেন? চিত্তরঞ্জন শচীন সান্যালের নাম করেন, এবং সেই জন্য সকলের মুক্তির সম্বন্ধে প্রস্তাব করিতে অসম্মত হন। Subject Committee-র (অর্থাৎ বিষয়-নির্ব্বাচনী-সমিতির) সভায় তাঁহার মত অগ্রাহ্য হয় এবং ex-revolutionary (ভূতপূর্ব বিপ্লবী)দের প্রস্তাই ঠিক থাকে। তখন চিত্তরঞ্জন কাঁদিয়া সভাপতির আসন ত্যাগ করেন।

তারপর ex-revolutionary (ভূতপূর্ব বিপ্লবী)-গণ চিত্তরঞ্জনের অভিমত স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনা হয়। এইভাবে সভার কার্য্য শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, চিত্তরঞ্জন এই সময় হইতে কিছু-কিছু বুঝিতে পারেন যে, তিনি ex-revolutionary (ভূতপূর্ব বিপ্লবী)-দিগকে কংগ্রেসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কি ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও বলি, তিনি ফরিদপুর সম্মেলনের পর বীরেন্দ্রনাথের সহিত এ-বিষয়ে পরামর্শ করেন নাই বা তাঁহাকে ডাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরাগমনের কথা বলেন নাই। কাজেই তাঁহার ভ্রম উপলব্ধির মধ্যে আন্তরিকতা কতখানি বা ভাবপ্রবণতা কতখানি তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। সেই সময় গান্ধীজী পাকিস্তানভুক্ত খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া চিত্তরঞ্জনের শব সৎকারাদির পর বাংলায় কে নেতা হইবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কেহ-কেহ তাঁহাকে বীরেন্দ্রনাথের নাম ও কেহ-কেহ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নাম বলেন। বীরেন্দ্রনাথের নাম উঠিলে কেহ-কেহ বলেন যে, তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, আর আসিবেন না। গান্ধীজী বলেন—"তিনি আসিবেন, সে ভার আমার উপর। আমি গিয়া তাঁহাকে আনিব, তাঁহাকে আপনারা চান কি?" তখন যতীন্দ্রমোহন ও আরও দুই এক ব্যক্তি বলেন—"আপনাকে যাইতে হইবে না। আমরা দুই-তিন জন গিয়া দুই-তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব। তাঁহাব সম্মুখে সকল কথা ঠিক হইবে।" কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেনগুপ্ত মহাশয় অথবা কোন কংগ্রেসসেবী বীরেন্দ্রনাথের নিকট যান নাই। সেনগুপ্ত মহাশয়ের ক্লার্ক সুখেন্দু-বাবু গিয়াছিলেন। তিনি কাহারও চিঠিপত্র লইয়া যান নাই। সুখেন্দু-বাবু বীরেন্দ্রনাথকে মুখে বলিয়াছিলেন যে, সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান। বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"কি কারণে সেনগুপ্ত মহাশয় আমার সহিত দেখা করিতে চান তাহা তিনি লিখিয়া জানাইলে আমি যাইতে পারি।" কিন্তু তারপর বীরেন্দ্রনাথকে কিছু না লিখিয়া গান্ধীজীকে জানান হয় যে, সেনগুপ্ত মহাশয় ও আরও দুই-একজন বীরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়াছিলেন, তিনি আসিতে সম্মত হন নাই। এই সময় গান্ধীজীও বীরেন্দ্রনাথকে কোন পত্র লিখা বা টেলিগ্রাম করা দরকার মনে করেন নাই। বীরেন্দ্রনাথ তখন

মেদিনীপুরে একটা বড় দায়রা মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই কথা গান্ধীজীকে তার করিয়া জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় tripple crown (ত্রিমুকুট) লাভ করেন অর্থাৎ এক সঙ্গে তিনি স্বরাজ্য দলের নেতা, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র হন।

এই সময়ে যদি শাসমল কলিকাতায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তৎকালের মত বাংলার নেতার আসন লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন নেতৃত্ব করিতে হইত না। বাংলাদেশে তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন ছিল না, কাজেই তাঁহার নেতৃত্ব ও বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির মধ্যে নিশ্চিতই সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। গান্ধীজীর প্রভাবে শাসমল হয়ত দুইদিন স্বরাজ্য দলের দলপতি, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকে কাজ করিতে হইত না। আর একথাও বোধ হয় সকলেব জানা আছে যে, নেতৃত্ব বজায় করিয়া চলিবার জন্য তিনি কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না।

স্বাধীনভাবে আইন সভায় পুনঃ প্রবেশ

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যপদ শূন্য হইলে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মনোনয়ন না লইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে আইন সভায় প্রবেশ করেন। এই সময় আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি, তমলুক ও ২৪ পরগণা জেলার নানা স্থানে গমন করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে সভার অনুষ্ঠান করেন এবং বিলের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, আর তাহাতে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে, প্রজাদের কি ক্ষতি হইবে তাহাও জানাইয়া দেন। এইভাবে নানা স্থানে সভা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বিল সম্বন্ধে জন-সাধারণের অভিমত সংগ্রহ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদের স্বার্থের অনুকূলেই ভোট দেন। এখানে একথাও বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করি যে, সে সময়ে বাংলার আইন সভায় যে সমস্ত কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ দুই চারি জন ব্যতীত অধিকাংশ সদস্য প্রজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে

ভোট দিয়াছিলেন। জন-সাধারণের ভোটে যে সকল ব্যক্তি আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁহাদের উচিত দেশব্যাপী সকলের বিশেষতঃ তাঁহাদের নিজ-নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের কল্যাণের কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করা। ভোটারদের সম্মিলিত স্বার্থ যে সকল বিষয়ের সহিত গভীরভাবে জড়িত, সেই সকল বিষয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত অভিমত অনুসরণ না করিয়া ভোটারদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে কাজ করা। এ দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, শাসমলের মত মহেন্দ্র-বাবু ছাড়া আর কোন সদস্য কোন বিষয়েই সে সময় ভোটারদের মতামত লইয়া কাজ করেন নাই, এবং তাহার পরেও করিতেছেন না। দেশ বিভাগের মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—জীবন-মরণ সমস্যা—দেখা দিল। সাবালক দেশবাসীর এমন কি ভোটারদেরও অভিমত লওয়া হইল না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশ্য জনগণের প্রচণ্ড প্রতিবাদের চাপে সে প্রস্তাব কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর অভিমত লওয়া হয় নাই। ভোটারগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে আইন সভায় তাঁহাদের মাথা কাটিবার ব্যবস্থা করিতে পাঠান না। কিন্তু প্রতিনিধিদের এমনই দাম্ভিকতা যে, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভোটারদেরই মাথা কাটার সমান কাজ করিয়া বসেন। ইঁহারা দলীয় স্বার্থ তথা ব্যক্তিগত স্বার্থকে সকলের উর্দ্ধে রাখিয়া নরাধমের পর্য্যায়ে নামিয়া আসেন। কেবলমাত্র ভোট সংগ্রহের সময় প্রজাসাধারণের দরদী সাজা ও আইন সভায় প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে মৃত্যুদ্বারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা বা তদুদ্দেশ্যে সাহায্য করা—এই প্রকার জঘন্য আচরণকে জাতীয়তা বলে না, বিজাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলাই সঙ্গত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর জেলা বোর্ড

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে পুনরায় মেদিনীপুরে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির সভ্য নির্ব্বাচন হয়। ইতিপূর্ব্বেই জেলা বোর্ডের মধ্য দিয়া বীরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের প্রভাব জনসাধারণের উপর এরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে, এই নির্ব্বাচনের সময় তাঁহারা লোক্যাল বোর্ডসমূহের ৭৮টি নির্ব্বাচনীয় সদস্যপদের মধ্যে ৭৭টি এবং জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনীয় ২২টি সদস্যপদের মধ্যে ২২টি সদস্যপদই কংগ্রেসপক্ষীয় প্রার্থীদিগের দ্বারা অধিকার করিতে সমর্থ হন। শাসমল সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষে দ্বিতীয় বার মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন।

ভারতের তৎকালীন বিদেশী সরকার বহুদিন হইতে মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসসেবীদিগের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারপর শাসমলের তেজস্বিতাও তাঁহাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক, জেলা বোর্ড স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের অধীন। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের নিয়মানুযায়ী এবার বীরেন্দ্রনাথ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেও সরকারী কলমের এক খোঁচায় তাঁহাকে চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসৃত করা হয় এবং সেই শূন্য আসনে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে সরকারের সহিত কংগ্রেসী নামধেয় কোন-কোন দেশদ্রোহী ও দুর্নীতি-গ্রস্ত ব্যক্তির সহযোগিতা থাকা স্বাভাবিক। শাসমল যথারীতি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেও তাঁহাকে যে-ভাবে অপসৃত করা হইল, তাহাতে সর্ব্ব-সাধারণেরও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপারে দেশবাসীকে কিছু অধিকার দান করা হইলেও তাহার চাবী গভর্ণমেণ্টেরই হস্তে রহিয়াছে এবং তাঁহারা যথার্থ স্বাধীনতার দাবী সহ্য করিতে অপারগ। বীরেন্দ্রনাথ লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে না পারিয়া, ২৬ লক্ষ মেদিনীপুর-বাসীর প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়া, জেলা বোর্ড হইতে স্তাবকগণের দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া, শিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তিস্থাপন করিয়া, বে-সরকারী জাতীয় বিদ্যালয় ও আধাসরকারী স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিল্প শিক্ষার জন্য সাহায্য করিয়া এবং তাঁহার সমগ্র কর্ম্মপন্থার মধ্য দিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস-

সেবিগণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন মনে হয়। কিন্তু সরকার যে কারণেই বীরেন্দ্রনাথের উপর অপ্রসন্ন থাকুন না কেন, তাঁহাকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ হইতে অপসৃত করিবার পক্ষে আর একটি বিষয় তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল মনে করি। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগ সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার পূর্ব্বে ২১শা মে (১৯২৬) বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতির (বীরেন্দ্রনাথের) অভিভাষণের মধ্যে হিংসাবাদীদের সম্বন্ধে মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া শাসমল-বিরোধী দল তাঁহার উপর সেই অধিবেশনেই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে। তৎপূর্ব্বে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা করপোরেশানের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োগ লইয়া অহিংসাবাদী ও শাসমল-বিরোধী আর একদল কংগ্রেসী তাঁহার প্রতি কুৎসিত আচরণ করে। ইহাতে সরকার পক্ষের উপলব্ধি করা স্বাভাবিক যে, কংগ্রেসের মধ্যে আজ যে ভাঙ্গন একেবারে বিবস্ত্র হইয়া বাহির হইয়াছে, ইহাব উপর জোড়াতালি দেওযা এখন বহু দিনের মধ্যে সম্ভব হইবে না এবং শাসমল-বিরোধী-দল যখন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় ও অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহার কোন তীব্র সমালোচনা সুরু বা তাহার প্রতিকারের জন্য কোন প্রকার প্রবল ও অবাঞ্ছনীয় আন্দোলন সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নিয়োগ লইয়া বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ও তাঁহার মধ্যে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Office of the Commissioner, Burdwan Division.

Chinsura

The 26th May, 1926

Confidential

D. O. No 437C

Dear Mr. Sasmal,

The question of the confirmation of your election as Chairman of the Midnapore District Board is pending with Government. Certain grounds have been urged which would

go to justify government in refusing to approve of your election. Government has directed me to ask you to come and see me in this connection at a very early date. Would you be kind enough to let me know what date will be most convenient for you within the next 10 days? I have given you a short date on account of the fact that, as you will agree, the question of Chairmanship should be settled as early as possible.

Yours sincerely
(Sd) A. N. Cook.

B. N. Sasmal, Esq.
Midnapore.

অর্থাৎ

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের কার্য্যালয়

চুঁচুড়া
২৬শা মে, ১৯২৬

গোপনীয়

ডি ও নং ৪৩৭ সি

প্রিয় মিঃ শাসমল,

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আপনার নির্ব্বাচন অনুমোদনের বিষয়টি এখন সরকারের দপ্তরখানার মুলতুবী আছে। সরকারের পক্ষ হইতে আপনার নির্ব্বাচন অনুমোদন না করিবার কতকগুলি যুক্তি আছে। সরকারের নির্দ্দেশানুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, এ সম্পর্কে আপনি শীঘ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আগামী দশ দিনের মধ্যে কোন্ তারিখে আপনার আসা সুবিধাজনক হইবে তাহা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন কি? আপনাকে অল্প সময় দেওয়ার কারণ এই যে, আপনি সম্মত হইলেই যথাসম্ভব শীঘ্র চেয়ারম্যানপদে নিয়োগ ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা হইবে।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) এ এন কুক

বি. এন. শাসমল, এস্কোয়ার
মেদিনীপুর

বীরেন্দ্রনাথের পত্র

Midnapore,
30. 5. 26.

Dear Mr. Cook,

I returned to Midnapore only this morning and received your D. O. no 437 c dated 26. 5. 26.

You have asked me to come and see you at Chinsurah by the 5th of June next, but I am sincerely sorry I can not do so, as I shall be very busy here and possibly in Calcutta during the next 20 or 25 days. I shall, therefore, be obliged, if you would kindly write to me the grounds which stand in the way of my confirmation and which I am to explain to you personally at Chinsurah. I beg to add that I prefer this course to any verbal discussions, as I have been misunderstood in the past more than once. I hope and trust, no body would pass judgement against me without giving me the opportunity to say my say.

Yours sincerely,
(Sd.) B. N. Sasmal.

অর্থাৎ

মেদিনীপুর,
৩০. ৫. ২৬.

প্রিয় মিঃ কুক্

আমি মাত্র আজ সকালে মেদিনীপুরে ফিরিয়াছি এবং আপনার ২৬৷৫৷২৬ তারিখের পত্র (ডি. ও. নং ৪৩৭ সি) পাইয়াছি। আপনি আগামী ৫ই জুনের মধ্যে চুঁচুড়া গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি গিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব না বলিয়া সত্যই দুঃখিত, কারণ আমি আগামী ২০৷২৫ দিন যাবৎ এখানে এবং সম্ভবতঃ কলিকাতায় অতিশয় ব্যস্ত থাকিব। কাজেই যে সমস্ত কারণ চেয়ারম্যান পদে আমার নির্ব্বাচন সমর্থনে সরকারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যেগুলি আমায় চুঁচুড়া গিয়া ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বুঝাইতে হইবে, সেগুলি যদি আপনি দয়া করিয়া লিখিয়া জানান তাহা হইলে আমি বাধিত হইব। মৌখিক

আলোচনা অপেক্ষা এই পন্থাই আমি ভাল বিবেচনা করি, কারণ অতীতে আমার সম্বন্ধে একাধিকবার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আশা করি, আমাকে আমার বক্তব্য বলিবার সুযোগ না দিয়া কেহই আমার বিরুদ্ধে রায় দান করিবেন না।

একান্ত আপনার
(স্বাঃ) বি. এন. শাসমল

কমিশনারকে বীরেন্দ্রনাথ পত্র লিখার পর কলিকাতা গেজেটের এক সংখ্যায় চেয়ারম্যান পদে বীরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন নাকচ করার ও নাড়াজোলের জমিদার কুমার দেবেন্দ্র লাল খানকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিক যোগ্যতার সহিত কোন সরকারী বা বে-সরকারী চেয়ারম্যান বাংলা তথা ভারতের কোন জেলা বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহার এই যোগ্যতার কথা বাংলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বাংলার কংগ্রেসের অবস্থা কি প্রকার ছিল এবং শাসমলও কংগ্রেসের সহিত কিরূপ জড়িত ছিলেন, তাহা বীরেন্দ্রনাথকে লিখিত ৺তুলসীচরণ গোস্বামীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে কিছু উপলব্ধ হইবে।

Serampore
15 January, 1926.

Dear Sasmal,

The meeting of the B. P. C. C. which will be held in Calcutta on the 24th instant, is very important. As you are probably aware, Sen Gupta approves of the list of names drawn up by us (including Akhil-babu) for the election selection committee. We mean to insist on that list at the B. P. C. C. meeting, as something essential for our being party to the continuance of the present B. P. C. C. Your advice and guidance is very necessary, and I wish you could come to Calcutta a day or two before the date of the meeting.

Akhil-babu, Harendra-babu, Tarak-babu, Kumar Debendra and Dr. Bidhan have joined the party. There is nothing to make us despair, though I agree with you that there is much to depress true workers, especially in our

province of Bengal. The natural reaction after the intensive and abnormal Non-co-operation movement must be gone through.

Looking forward to a favourable response to this appeal to you.

I am,
Yours very sincerely,
(Sd.) T. C. Goswami.

অর্থাৎ

শ্রীরামপুর
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায় বি. পি. সি. সি-র যে সভা হইবে তাহা খুব জরুরী। আপনি বোধ হয় জানেন—অখিলবাবু[১] সহ আমরা নির্ব্বাচন-নির্দ্ধারণ কমিটিব জন্য নামের যে তালিকা স্থির করিয়াছি তাহা সেনগুপ্ত[২] সমর্থন করিয়াছেন। বি. পি. সি সি-র সভায় সেই তালিকার উপর অধিক জোর দিতে চাই। আপনার উপদেশ ও চালনা বিশেষ আবশ্যক। আপনি সভা হওয়ার দুই-এক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিবেন—ইহাই আমাব ইচ্ছা।

অখিল-বাবু, হরেন্দ্র-বাবু, তারক-বাবু, কুমার দেবেন্দ্র ও ডাঃ বিধান দলে যোগ দিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশে যথার্থ কর্ম্মীদের দমিয়া যাওয়ার অনেক কারণ আছে—এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। তথাপি আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রবল অথচ অস্বাভাবিক অসহযোগ আন্দোলনের পরে যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। আমার আবেদনে আপনি সাড়া দিবেন এই আশায় রহিলাম।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) টি. সি গোস্বামী

(১) মনে হয় পূর্ব্ব পাকিস্তানভুক্ত কুমিল্লার স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত।

(২) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

62, Ballygunge Circular Road,
Calcutta.
16th January, 1926.

Dear Sasmal,

Your letter. It is very necessary that we should meet. Dr. Bidhan Roy suggests Tuesday. If you can come on Tuesday it would be possible to gather together some people to come to certain definite conclusion.

If you can come and if you have not already thought of staying somewhere else in Calcutta, may I ask you to stop with me here ?

I am glad you are not making any public statement of the nature indicated in your letter, just now, as the interests of the party and the country have to be guarded.

Yours sincerely,
(Sd). T. C. Goswami.

অর্থাৎ

৬২, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

আপনার পত্র পাইলাম। আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ডাঃ বিধান রায় মঙ্গলবারের কথা বলেন। যদি আপনি মঙ্গলবার আসিতে পারেন, তবে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য লোক সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।

যদি আপনি কলিকাতা আসেন এবং কলিকাতায় অন্য কোথাও থাকিবার কথা ইতিপূর্ব্বে চিন্তা না করিয়া থাকেন, তবে আপনাকে আমার এখানে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করি।

দল ও দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, আপনার বর্ত্তমান পত্রের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আপনি যে এখনই কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দিতেছেন না, এজন্য আমি আনন্দিত।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) টি. সি. গোস্বামী

Ballygunge, Calcutta.
31st March, 1926.

My dear Sasmal,

Your letter from Midnapore bearing yesterday's date. Yes, I learned on my return from Delhi that you had decided to have nothing to do with the enlarged election committee of the B. P. C. C. I was much concerned to hear it.

Let me, however, congratulate you on your election to be president of the Krishnagar Provincial Conference this year. Of course, that gives you an opportunity of making your views on the present situation widely known............ You know there are many things which I don't like. I am utterly opposed to the present methods of administration in the B. P. C. C. Methods depend to a large extent on the personnel. But for the sake of unity we must put up with a lot.

Dr. Bidhan, Chunder, Nalini-babu, Dr. J. M. Das Gupta and myself are going on a short tour in East Bengal. We are due to return on the 10th April. If you come to Calcutta before the Provincial Conference, do please let me know about it, so that I could see you and talk over matters.

I trust you are well. We want you very much in connection with propaganda work in Burdwan Division.

Yours sincerely,
(Sd). T. C. Goswami.

অর্থাৎ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
৩১শা মার্চ্চ, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

কাল মেদিনীপুর হইতে আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আমি দিল্লী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম যে, আপনি সম্প্রসারিত নির্ব্বাচন কমিটির সহিত কাজ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইহাতে আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম।

আপনি এই বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এজন্য আপনাকে অভিনন্দিত

করিতেছি। সভাপতি হওয়ার ফলে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবার সুযোগ পাইবেন।

আপনি জানেন আমি অনেক জিনিষ পছন্দ করি না। আমি বি. পি, সি সি.র বর্ত্তমান পরিচালন-পদ্ধতির ঘোর বিরোধী। যাহাদিগকে লইয়া প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, কর্ম্মপ্রণালী অনেক পরিমাণে তাহাদিগের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু ঐক্যের জন্যই আমাদিগকে বেশ কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তুর অস্তিত্ব সহ্য করিতে হইবে।

ডাঃ বিধান, চন্দ্র (মনে হয় নির্ম্মল চন্দ্র), নলিনীবাবু, (মনে হয় নলিনী সরকার), ডাঃ জে এম. দাশগুপ্ত, এবং আমি দিন কয়েকের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে যাইব এবং ১০ই এপ্রিল ফিরিব। যদি আপনি প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্ব্বে কলিকাতা আসেন, তবে তাহা আমাকে নিশ্চিতই জানাইবেন। তাহা হইলে আমি আপনার সহিত দেখা করিয়া কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিব।

আশা করি, আপনি কুশলে আছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের প্রচার কার্য্যের সম্বন্ধে আপনাকে একান্ত প্রয়োজন।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) টি. সি গোস্বামী

Ballygunge, Calcutta
20th April, 1926.

My dear Sasmal,

Things are again in a mess in the Congress, Swarajya Party in this Province. Probably you will chuckle and say "Didn't I say so a thousand times ?" You did say so ; and though I do not yet like to feel quite so pessimistic, I am increasingly feeling the strength of your arguments. It is difficult with any amount of good will to deal with people whose only anxiety is to retain their offices for the sake of which they do not mind stooping low in supplication or resorting to intrigue and submarining.

A hundred pities ! aye, a thousand pities !

What I am most worried about is that the elections may suffer, and the party programme be foiled. It may, therefore, be necessary for several of us to keep absolutely silent

on many things we do not entirely approve of. A suggestion which appeals to me, at any rate, in my present state of mind, is that some of us should not attempt to go into the councils and be clear out of the contests.

Are you expected to be in Calcutta shortly ? I do want to see you before you give over your presidential address to the press.

The selection board is not likely to work.

With kind regards,
Yours sincerely,
(Sd.) T. C. Goswami

P. S. Mrs. C. R. Dass is in Calcutta. I do not know if she will be able to restore order in the present chaotic situation She is trying her best.

(Sd.) T. C. G

অর্থাৎ

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
২০শা এপ্রিল, ১৯২৬

প্রিয় শাসমল,

এই প্রদেশের কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলে আবার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ আপনি মনের মধ্যে আমোদ উপভোগ করিয়া বলিবেন—"আমি কি সহস্র বার একথা বলি নাই?" আপনি নিশ্চিতই তাহা বলিয়াছিলেন। আমি যদিও এখনও এতটা দুঃখবাদী হওয়া পছন্দ করি না, তথাপি আপনার যুক্তির দৃঢ়তা আমি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছি। যে-সমস্ত লোক কেবলমাত্র পদ অধিকার করিয়া রাখিতে চাহে এবং যাহারা সেই পদ রক্ষার জন্য নতি স্বীকার করিতে কিম্বা অভিসন্ধি ও গুপ্ত ফন্দির আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কোন পরিমাণ সদিচ্ছা লইয়াও তাহাদের সহিত কাজ-কারবার করা দুরূহ ব্যাপার।

শত দুঃখ, না, না, সহস্র জ্বালা!

পাছে নির্ব্বাচন ব্যাহত হয় এবং দলের কর্ম্মপন্থা ব্যর্থ হয়—এই আমার চিন্তার বিষয়। সেই জন্য আমরা কয়েক জন যে-সব ব্যাপার কোন ক্রমেই অনুমোদন করিতে পারি না, সেই সব ব্যাপারে আমাদের একেবারে নীরব

থাকা আবশ্যক। আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে একটা কথা আমার মনে লাগে। তাহা এই যে, আমাদের মধ্যে কয়েক জন কাউন্সিলে প্রবেশের চেষ্টা করিব না এবং প্রতিযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব।

আপনি শীঘ্র কলিকাতা আসিবেন কি? আপনি সভাপতির অভিভাষণ ছাপিবাব জন্য প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমি অতি অবশ্য আপনাব সহিত দেখা কবিতে চাই।

নির্ব্বাচন-সমিতি সম্ভবতঃ কাজ কবিবে না।

শ্রদ্ধা জানিবেন।

একান্ত আপনাব

(স্বাক্ষর) টি সি গোস্বামী

পুনশ্চঃ—মিসেস সি আব. দাশ কলিকাতায় আছেন। তিনি বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় শান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন কি না জানি। তবে তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

(স্বাক্ষব) টি. সি. জি.

১৯২৬ খৃষ্টাব্দেব প্রথম ভাগে বীরেন্দ্রনাথ বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে গৃহবিবাদ ও তদ্ধেতু দুর্দ্দশাব কথা বর্ণনা করিয়া এবং নিজে স্বরাজ্য দলেব সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কবিবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল প্রত্যুত্তরে বীরেন্দ্রনাথকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখেন। এই একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি ও নেতৃত্ব পণ্ডিত মতিলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

মতিলালের পত্র

14. 1. 26

Dear Mr. Sasmal,

It has grieved me to read your letter and the views expressed. The reasons you give for believing that it is becoming increasingly difficult for you to remain in the Executive, are to my mind precisely the reasons why you should not only remain in the Executive, but take a more active part in it than you have done so far.

Your first reason is that the programme of the Party (Swarajya) is not "sufficiently fighting." I confess, I fail to understand how we can make it more fighting than it is. The suggestion you made at the meeting of the General Council at Cawnpore about repeated resignations and re-elections did not find support even among the members from Bengal and was in its nature wholly impracticable in any part of the country including Bengal, except, perhaps, the Midnapore Division. If, however, you have other suggestions to make, surely the only place for them is the Executive of the party and it is up to you to bring them forward.

Your second reason is that "a class of men have captured the Congress organisations who are determined to see that the Congress is lowered in the estimation of the public so that they may build up their party out of the ashes of the Congress." This again is a strong reason for your remaining in the Executive and helping to purge the party of undesirable element in it.

Your third reason relates to the personal treatment accorded to you by these very undesirable members. I am surprised that you who in the words of Deshabandhu quoted by you are expected to lead Bengal should allow yourself to be so perturbed at the threats of mischief-makers as to think of retiring from the Executive. In fact, I have always been hoping to deal with these men by calling in aid the influence and the resources which I know you possess in Bengal, and it is painful to me to hear from you that "there is none in Bengal to check these things."

I wish I could spend some time in Bengal and study the situation on the spot, but unfortunately it is not possible to do so for some time to come. I am, therefore, asking Tulsi Goswami to go into the matter with you and such others as he may consider necessary and to see if the personal recriminations you complain of can be put an end to by mutual understanding. Tulsi Goswami is above party intrigues in Bengal, and I hope, will be able to render good service. You are, however, the real person I look to for

support in the crisis that has arisen throughout the country and I am sure you will not desert the party at this juncture.

I need some more rest before setting to work in right earnest and am therefore not going to Delhi till the 17th. Hoping to hear from you in the interval.

Yours sincerely,
(Sd.) Motilal Nehru.

অর্থাৎ

১৪।১।২৬

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আপনার পত্র পাঠ করিয়া এবং আপনার অভিমত জানিয়া ব্যথিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতিতে আপনার থাকা ক্রমশঃ অধিকতর ক্লেশকর হইতেছে ইহা বুঝাইবার জন্য আপনি যে-সব কারণ দেখাইতেছেন, আমি সেইগুলিকেই আপনার কার্য্যকরী সমিতিতে শুধু থাকা নহে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে করি।

আপনার প্রথম কারণ এই যে, স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপন্থা যথেষ্ট সংগ্রামশীল নহে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, কি করিলে ইহাকে অধিকতর সংগ্রামশীল করা যায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কানপুরে দলের সাধারণ পরিষদের সভায় আপনি পুনঃ-পুনঃ পদত্যাগ ও পুনর্নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এমন কি, বাংলাদেশের সভ্যগণই সমর্থন করেন নাই, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবতঃ এক মেদিনীপুর ব্যতীত বাংলাসহ সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি আপনার অন্য কোন প্রস্তাব থাকে তবে তাহা দলের কার্য্যকরী সমিতির সভাতেই উত্থাপন করিতে হয়। তাহা উত্থাপন করিবেন কিনা আপনি নিজে বিবেচনা করিবেন।

আপনার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাহারা কংগ্রেসের চিতাভস্ম হইতে নিজেদের দল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সাধারণের দৃষ্টিতে অবনত দেখিতে কৃতসংকল্প, তেমন এক শ্রেণীর লোক কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকার করিয়াছে। ইহাও আপনার কার্যকরী সমিতিতে থাকিবার ও এই সমস্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির সংস্পর্শ ও প্রভাব হইতে দলকে মুক্তকরণে সাহায্য করিবার পক্ষে দৃঢ় কারণ।

আপনার তৃতীয় কারণ—আপনার প্রতি এই অবাঞ্ছনীয় সভ্যদেরই ব্যক্তিগত ব্যবহার। আপনার উদ্ধৃত দেশবন্ধুর কথা হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশকে আপনারই চালিত করিবার কথা—এরূপ ব্যক্তি আপনি অনিষ্টকারীদেব ভয়ে বিচলিত হইয়া কার্য্যকবী সমিতি ছাড়িয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি এই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া কাজ করিবার জন্য সর্ব্বদা যে প্রভাব-প্রতিপত্তির আশা কবিয়া আসিতেছি তাহা বাংলাদেশে আপনার আছে বলিয়া জানি। "বাংলাদেশে এই সমস্ত বিষয় দমন করিবার কেহই নাই"—ইহা আপনার নিকট হইতে জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম।

আমি যদি বাংলাদেশে গিয়া কিছুদিন থাকিতে ও অবস্থা নিবীক্ষণ করিতে পারিতাম, ভালই হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন কিছুদিন আমার পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। আপনাকে ও অন্যান্য যে-সব ব্যক্তিকে তুলসী গোস্বামী পছন্দ করেন তাঁহাদিগকে লইয়া সব বিষয় অনুসন্ধান কবিবার জন্য এবং আপনি যে ব্যক্তিগত প্রত্যপবাদ সম্বন্ধে অভিযোগ কবিয়াছেন তাহাব অবসান ঘটাইবার জন্য আমি তুলসী গোস্বামীকে অনুবোধ কবিতেছি। বাংলাদেশে তুলসী গোস্বামী দলগত অভিসন্ধির উর্দ্ধে। আশা করি, তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পাবিবেন। এখন দেশব্যাপী যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আপনারই দিকে সাহায্যের জন্য তাকাইয়া আছি এবং আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, আপনি এই সঙ্কটে দল ত্যাগ করিবেন না।

আমি আরও কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে সর্ব্ব-প্রযত্নে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব না। ১৭ই তারিখের পূর্ব্বে আমি দিল্লী যাইতেছি না। আপনার নিকট হইতে ইহার মধ্যে পত্র পাইবার আশা করি।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষব) মতিলাল নেহেরু

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

কৃষ্ণনগর অধিবেশন

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ২১শা মে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদীদিগকে কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইতে বলিবার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। কৃষ্ণনগর অধিবেশনে বীরেন্দ্রনাথ কম্বুকণ্ঠে সুদৃঢ় ভাষায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবার কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতেন। সেজন্য তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের বাধা অথবা স্বপক্ষের মনঃকষ্টের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। এই কারণে যদি তাঁহাকে একা থাকিতে হয় তাহাও তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ আপনার অভিমত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেও এবং আপনার মতের অনুকূলে কিছু ফল দেখিতে না পাইলেও দল সৃষ্টি করিতেন না বা হীন চক্রান্ত করিয়া বিরুদ্ধ দলের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রয়াসী হইতেন না। তিনি সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বিপ্লববাদীদিগকে অহিংস কংগ্রেসের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে বলেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, বিপ্লববাদের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু বিপ্লববাদীর কার্য্যের বা সাহসের প্রশংসা করা হইয়াছে—এই বিসদৃশ ব্যাপারের অর্থ কি তাহা জানি না। চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মিঃ ডে সাহেবের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার প্রশংসা করিতে হয়। যে অহিংস প্রতিষ্ঠানের নায়ক থাকিয়া চিত্তরঞ্জনকে হত্যাকারীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ যদি সহিংস বিপ্লবের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তবে তাহা যে একেবারে অমূলক একথা বলা যায় না। ইহাতে যে সমস্ত ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথের উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা কেবল স্বার্থ-সিদ্ধি, দলপুষ্টি ও ফাঁকিবাজীর উদ্দেশ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান বলিতে হইবে।

শাসমল কোন ব্যক্তিবিশেষের নামোচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিপ্লবী আখ্যা দেন নাই। যে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণকে অহিংসপন্থী বলা হয় এবং যে কংগ্রেসের মন্ত্রই অহিংসা, সেই কংগ্রেসের সম্মেলনের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়া বিপ্লববাদের নিন্দা করিলে কিছুমাত্র দোষের হয় না। দুই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া একজনের প্রকাশ্যে ও অপরের গোপনে কাজ করা আদৌ সমীচীন নহে। কারণ তাহাতে কোন পক্ষই সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার অবকাশ পায় না এবং এরূপ স্থলে প্রতিষ্ঠানের নীতি-বিরোধীদিগের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করাই উচিত। আর যদি কেহ সেই বিরোধীদলকে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে বলেন তবে তাহা কিছুমাত্র অন্যায় নহে

সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশ

বীরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও উপলব্ধির সুবিধার্থে এখানে তাঁহার সুখ্যাত অভিভাষণের কিয়দংশ দেওয়া হইল। সমগ্র অভিভাষণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য।

(১) অবিরাম আপোষ মীমাংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন বড় কাজ কখনও সম্পাদিত হয় নাই, ভারতের স্বরাজ্য লাভও কখন তাহা দ্বারা সংসাধিত হইবে না।

(২) বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় স্বরাজ বা politicsকে উৎকৃষ্টতর আধ্যাত্মিক স্বরাজে পরিণত করা বা spiritualise করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং তাহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টার দ্বারা স্বল্প সময়ে সম্পাদিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। জগতের নিকৃষ্ট politicsকে (রাষ্ট্রীয় স্বরাজকে) উৎকৃষ্টতর spirituality (আধ্যাত্মিকতা) দ্বারা সংশোধন করিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর সকল জাতিকে তাহাদের জন্মগত রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের সমস্যা জগতের politicsকে (রাষ্ট্রীয় স্বরাজকে) spiritualise (আধ্যাত্মিক স্বরাজে পরিণত) করা নহে—আমাদের সমস্যা আমাদের সনাতন চির-প্রচলিত সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সময়োপযোগী করিয়া ধীরে-ধীরে politicalise (রাষ্ট্রীয় স্বরাজে পরিণত) করা।

(৩) স্বাধীন জাতির রাজদ্বারে যেমন পরাধীন ব্যক্তি গোলাম বা ক্রীতদাস, তেমনি পরাধীন জাতির ধর্ম্মেও কোন অধিকার নাই। তাহাদের

ধর্ম্মের ধারণাকে তাহাদিগের শাসকগণের শাসন-যন্ত্রের উপযোগী করিয়া গড়িতে হয়। তাহাদের ধারণা কোনও কারণে যদি সেই শাসন-যন্ত্রকে অবহেলা বা অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহারা রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারা বহু স্থানে বহু বার এইরূপ রাজদ্রোহী বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই কোন-কোন স্থলে সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বরাজ সম্ভব হইলেও সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া জাতিগতভাবে আধ্যাত্মিক স্বরাজ লাভ করা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বপ্নের কাহিনী।

(৪) আমার দেহ আমার আত্মার পীঠস্থান। আমার দেহের আষ্টে-পৃষ্ঠে পরাধীনতার যে কঠিন নিগড় সর্ব্বদা আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। তারপর আমার আত্মীয়গণের কথা চিন্তা করিতে আমি অধিকারী হইব। কারণ যে ব্যক্তি তাহার নশ্বর দেহের জ্বালা-যন্ত্রণা বিমোচনে অপরাগ, সে ব্যক্তির মুখে অবিনশ্বর আত্মার মঙ্গলচিন্তার কথা শোভা পায় না। তবে আমি একথা একেবারেই বলিতে চাই না যে, জাতীয় জীবন গঠনে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বা পরলোকের বার্ত্তার আমাদের কোনও আবশ্যকতা নাই। আমি এই বলিতেছি যে, স্বরাজের ব্যাখ্যার সময় সে সকল বিষয়ের অবতারণা না করাই বিধেয়।

(৫) বাংলা তথা ভারতের আদর্শ অন্য কিছুই নহে—কেবল তেত্রিশ[১] কোটি নরনারীর পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন।

(৬) আমি বিশ্বাস করি যে, non-violent non-co-operation (অহিংস অসহযোগ) দ্বারা Union Autonomy (ইউনিয়ন স্বায়ত্তশাসন), District Autonomy (জেলা স্বায়ত্তশাসন), Provincial Autonomy (প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন), এমন কি, হয়ত, Dominion Status (ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস), বা Equal Partnership within the British Empire (বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অংশীদারিত্ব) লাভ হইতে পারে। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জ্জন করা যাইবে না। কারণ যেরূপ বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীর সেজন্য non-co-operation (অসহযোগ) করা

(১) সে সময় অবিভক্ত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা তেত্রিশ কোটি ছিল।

আবশ্যক, যেরূপ non-co-operation আমাদের এই রক্তমাংসের বাস্তব জীবনে একেবারেই সম্ভব নহে এবং কখন বা যদি বহির্ভারতের অচিন্তনীয় কোন অবস্থা-পরম্পরায় অন্তর্ভারতে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল তাহা non-violent (অহিংস) থাকিবে—ইহা নিখুঁৎ আকাশ-কুসুম। এরূপ ঘটনা যদি সত্যই কখন বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমি এই বিশাল ভারতখণ্ডে ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তখন আর আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবশ্যকতা থাকিবে না।

(৭) Terrorism (সন্ত্রাসবাদ) বা Anarchist Conspiracy (এনার্কিষ্ট ষড়যন্ত্র)-র নিকট আমরা কিছু আশা করতে পারি কিনা তাহাও এই স্থানে দেখাইতেছি। ইহার ভিত্তি স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু ইহা নীতি-বিরুদ্ধ ও কুফলপ্রদ। ইহার উপাসক যাহারা তাহাদের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্রে কাপুরুষ হইয়া যান। ইহার মূলমন্ত্র গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করা বিধায়, ইহারা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করে এবং সর্ব্বদাই ধরা না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া দেশ-উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাদের সংখ্যা কোন দিন কোন দেশে মুষ্টিমেয়ের অধিক হয় নাই। এদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া জানি না। সংখ্যায় কম হওয়ায় ইহাদের প্রকৃতি সর্ব্বদা short cut (সংক্ষিপ্ত পথ) অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং short cut (সংক্ষিপ্ত পথ) খুঁজিয়া না পাইলে কিম্বা নিজেদের আবিষ্কৃত কোনও short cut (সংক্ষিপ্ত পথ)-এ বিফল মনোরথ হইলে ইহাদের অনেকে অল্পদিন পরে গৃহধর্ম্মে ফিরিয়া যায় এবং চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সকল প্রকারের কদাচার অনুষ্ঠানে সমাজকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে। প্রকাশ্য পন্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর যে নির্ভীকতা ও অমিত বিক্রম, তাহা গোপন পন্থার অনিশ্চিত মৃত্যুর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ইহারা এমনভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে যে, কিছুদিন পরে ইহারা ব্যক্তিগতভাবে citizen (নাগরিক) পদবাচ্যেরও উপযুক্ত থাকে না। ইহাদের স্বভাব ক্রমান্বয়ে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, ইহারা যত বেশী দেশের কথা ভুলিতে থাকে এবং নিজেদের ভাবনায় ভাবিত হয়, তত বেশী ইহারা নেতৃবর্গের নিকট ইহাদের গোপন অজানিত ত্যাগের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করে এবং কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি তাহাতে অসম্মত হন তবে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পিস্তলের গুলি পাঠাইতে অথবা তাঁহার নামে সর্ব্বৈব মিথ্যা দুর্ণাম রটাইতে ইহারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। No means

is too low (কোন পন্থাই অতি হীন নয়) যাহাদের আদর্শ, তাহাদের নিকট ইহার বেশী আশা করাই অন্যায়। ইহারা দেশ উদ্ধারের নামে নিজ সহোদরের বাড়ীতে যেমন ডাকাতি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমন আবার ধরা পড়িলে অন্য এক সহোদরের বাড়ীতে পুনরায় ডাকাতি করিয়া আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য কৌন্‌সিল নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট মাস-মাহিনায় গোয়েন্দাগিরি করে বা করিয়াছে বলিয়াও শুনিতে পাই। এই সংবাদে অন্য কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত নহি। কারণ বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যাহারা short cut (সংক্ষিপ্ত পথ) -এর দ্বারা অর্জ্জন করিতে চায় কিম্বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গোপন ষড়যন্ত্রে সুসম্পন্ন হইতে পারে বিশ্বাস করিয়া যাহারা কার্য্য আরম্ভ করে, তাহাদের যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণাম। তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারে না যে, তাহাদের মত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টায় এদেশে কখনও যদি স্বরাজ স্থাপিত হয়, তবে তাহাকে প্রচলিত শোষণ ও পেষণ-যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও নামে অভিহিত করা যাইবে না। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ও অমঙ্গল রহিয়াছে তাহা তেমনই থাকিবে এবং মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বা ভারতবাসী তেত্রিশ কোটি নরনারীর জন্য স্বরাজ আনয়ন করিবে—এ দুর্ভাগ্য যেন আমাদের কাহারও না হয়। তারপর ষড়যন্ত্র করিবার বাস্তবিক অধিকারী কাহারা? মনে থাকে যেন ইহা কোন অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে তাহারই উপদ্রুত দুই চারিজন প্রজার ষড়যন্ত্র নহে। ইহা একটা ভীষণ পরাক্রমশালী জাতির বিরুদ্ধে আর একটা অত্যন্ত দুর্ব্বল সঙ্গতিবিহীন জাতির ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রদ করিতে হইলে এদেশের ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্রের আবশ্যক, তাহা terrorism (সন্ত্রাসবাদ) বা Anarchist conspiracy (এনার্কিষ্ট ষড়যন্ত্র)-র মধ্যে থাকিতে পারে না। সুতরাং আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা Terrorism (সন্ত্রাসবাদ) বা Anarchist Conspiracy (এনার্কিষ্ট ষড়যন্ত্র) দ্বারা কস্মিনকালেও অর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৮) Civil disobedience (অসামরিক আইন অমান্য) ন্যায়ানুমোদিত ও আত্ম-নির্ভরশীল। ইহা দুই প্রকারের—Individual civil disobedience (ব্যক্তিগত আইন অমান্য) ও mass civil disobebience (জনগত আইন

অমান্য)। এই পন্থার গোড়ার কথা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহাতে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে না। আমার মনে হয় যে, এই civil disobedience (আইন অমান্য) দ্বারা আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নহে। ইহার দ্বারা হয়ত আমরা equal partnership (সমান অংশীদারিত্ব) পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারি। কিন্তু ইহা দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোনও দৈব দুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়াই, আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ সাধনায় কোন দৈবদুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কাহারও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। Civil disobedience (আইন অমান্য) দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, সে সময়ে ইংরাজ প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণ সে অভিযানে যোগদান করিবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, তাহারা নিমকহারাম হইবার ভয়ে স্বীয় আত্মীয়-কুটুম্ব ও স্বদেশীয়গণের সে অভিযানকে পণ্ড করিবার জন্য হয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এমন কি, আবশ্যক হইলে অথবা বিনা আবশ্যকে হুকুম পাইলেই হয়তো তাহারা নিজ বাসভূমে পরদেশীর মত গুলিগোলা চালাইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। ফলে অভিযাত্রিগণ সকলকেই যে সে সময়ে বাহ্যিক শক্তি প্রতি-প্রয়োগে পরান্মুখ থাকিবে, একথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা যায় না। তখন civil disobedience (আইন অমান্য) আকার অনুসারে কোথাও বা riot (হাঙ্গামা) এবং কোথাও বা revolution (বিপ্লব) এ পরিণত হইবে। ইংরাজ প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণের কথা বাদ দিলেও তাঁহাদের নিজবংশীয় যে ৭০।৮০ হাজার পদাতিক সৈন্য এদেশে বসবাস করিতেছে এবং তাঁহাদের যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ-উদ্গীরণকারী পুষ্পক-রথ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতে আগ্নেয়কাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাঁহাদের শেষ সময়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হইবে না। ফল—এইমাত্র যাহা বলিয়াছি তাহাই ঘটিবে। আর একটি কারণে civil disobedience (আইন অমান্য) দ্বারা আমাদের আদর্শ স্বরাজ লাভ হইবে না এবং সেটি এই যে, আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি—আমাদের নিজেদের army (সৈন্যবাহিনী) এবং navy (নৌবাহিনী) এবং আমাদের তদুপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি—civil disobedience (আইন অমান্য) জয়যুক্ত হইলেও আমরা তৎক্ষণাৎ এদেশে এমন কোন আধার পাইব না যাহাকে

ভিত্তি করিয়া আমরা শীঘ্র আমাদের মধ্যে সেই অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে রচনা করিতে পারি। বিনা রক্তপাতে civil disobedience (আইন অমান্য) জয়যুক্ত হইলে ইংরাজরাজ এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ কবিবেন। তাঁহাদের সহিত ভারতের সৈনিক বিভাগের বড়কর্ত্তাগণকেও সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু তাবপর কে তখন ভারতেব সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার তদনুরূপ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিবে? ইংরাজ-পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যের উপব লাচিরে বিশ্বাস স্থাপন কবা কোন রাজনীতিবিশারদের উপযুক্ত কার্য্য হইবে না। তাহা হইলে স্বাধীন ভাবতের জন্য army (সৈন্যবাহিনী) এবং navyই (নৌবাহিনী) বা কোথায় পাইব? প্রকৃতপক্ষে কিঞ্চিৎ গভীরভাবে চিন্তা কবিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে civil disobedience (আইন অমান্য)-এর লক্ষ্য প্রচলিত শাসন প্রণালীকে সংশোধন করা, তাহাব আমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতরাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে civil disobedience (আইন অমান্য)-এর দ্বারা তাহা অর্জ্জিত হইবে না।

(৯) বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় revolution কিম্বা বিপ্লব বলে। Revolution (বিপ্লব)কে নানা কারণে আমি স্বরাজ লাভের আদর্শ পন্থা বলিয়া মনে করি। এখানে দুইটি কারণের উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ, জগতের সকল স্বাধীন ও পরাধীন জাতির মধ্যে ইহার স্থান এখন অতি উচ্চে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, revolution (বিপ্লব) হিংসামূলক, কেন না, ইহাতে রক্তপাত হয়—মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান কবে না। ল্যাটিমাবের বক্তপাতে তাঁহার নিজের হিংসার কি ছিল! স্বয়ং যীশুখৃষ্টের যে রক্তপাতে তিনি পৃথিবীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সে রক্তপাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও হিংসার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং রক্তপাত-মাত্রই হিংসামূলক নহে। তারপর মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোনও দুর্ব্বল অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি ও

কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্থে জগতের সংপ্রবৃত্তিসমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল যদি আমরা বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে পদে পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। তাহা হইলে গেরুয়া পরিয়া ডাকাইতি করিতে গেলে কিম্বা হরিনাম করিতে করিতে কেহ অর্থলোভে মানুষ খুন করিলে ধর্ম্মের নিকট তাহাকে পাপী এবং আইনের সম্মুখে তাহাকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। আমি একথা শতবার স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সে কারণে revolution (বিপ্লব) হিংসামূলক কে বলিল? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শ-বিরুদ্ধ হইবে কেন? আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি divine right (দিব্য অধিকার) থাকে, revolution (বিপ্লব) সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবারও আমার divine right (দিব্য অধিকার) রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, revolution (বিপ্লব)-এর জন্য এদেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির আবশ্যক হইবে তদ্বারা আমরা revolution (বিপ্লব)-এর পরের সমূহ সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে পরিমাণে ধ্বংসমূলক বলা যায় এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কারণ—short cut (সংক্ষিপ্ত পথ)-এ পৃথিবীর কোন দেশে revolution (বিপ্লব) জয়যুক্ত হয় নাই। এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্য্যে তাহা হইবে না।

(১০) আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে—আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিগকে… …বাংলার সপ্তকোটি নবনারীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এবং যাহাতে বাংলার দুর্ব্বল নরনারী কোন কারণে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুদ্ধের সময় অবসর গ্রহণ না করে, সেইজন্য তাহাদের mentality (মনোবৃত্তি)-কে তদুপযুক্ত করিয়া গঠন করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।*

* শাসমল তাঁহার অভিভাষণে মনোবৃত্তি গঠন সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য।

(১১) আমাদের সকল কর্ম্মী একমনে ও একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখনও কিছু করিতে চেষ্টা পাইবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনি violence (সহিংস পন্থা অবলম্বন) করা উচিত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে হউক্ মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন।

(১২) বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ কল্পনা করা যায় না।

২১শা মে তারিখে সভাপতির অভিভাষণের অনুলিপি বিতরণের পর উহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথকে জানান হয় যে, তাঁহার অভিভাষণে (৭) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশটি আপত্তিজনক হইয়াছে, তাহা তাঁহার পড়া উচিত নয়। বীরেন্দ্রনাথ সভার অভিমত জানিয়া সেই অংশটুকু পাঠ করেন নাই, বাকী সমস্তটা পাঠ করেন।

অনাস্থার প্রস্তাব

পরদিন ২২শা মে সভার অবস্থা অন্য প্রকার দেখা গেল। (১১) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশটুকু প্রত্যাহার করিবার জন্য শাসমলকে অনুরোধ করা হইল। শাসমল অনুরোধের নিকট আপোষের নিকট নীতি ও আদর্শ বলি দিতে অপরাগ। সভাপতির স্বাধীন চিন্তা ও উক্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিয়া তিনি নিজ পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তখন শাসমলের কর্ত্তব্য কার্য্যে আন্তরিকতার বিরোধী মাখন সেন ও অতুল সেন এবং শাসমলের আন্তরিকতা ও নীতি উভয়ের বিরোধী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উপর অনাস্থার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। সেনগুপ্ত[১] তাহা সমর্থন করিলেন। দুই ভোটে শাসমলের উপর অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইল।

বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া ২৩শা মে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। পৃথিবীতে আর কোথাও কখনও সভাপতির অভিভাষণের ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই বুঝি প্রথম। শাসমল অধিবেশন ত্যাগ করিলে তাঁহার বিরোধী দল অন্যতম মডারেট ব্যারিষ্টার ৺যোগেশ চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া সভার কাজ শেষ করে।

(১) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

সেনগুপ্তের কারসাজি

কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া শাসমলের নিকট স্বীকার করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর ১৩ই জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে শাসমল ও সেনগুপ্ত উভয়ের চেষ্টায় কংগ্রেসেব কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইতে ex-revolutionary (ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী)-গণ বিতাড়িত হন।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করা দুরূহ ব্যাপার। রাজনীতি জটিল বিষয়—বাংলার রাজনীতি জটিলতর বিষয়। বাংলাব রাজনীতির আর এক মজা দেখুন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশনে মেদিনীপুব জেলাবোর্ডের প্রতি বৃটিশ সবকারেব অন্যায্য ব্যবহার আলোচিত হইবার কথা, তাহাতে শাসমল ও সেনগুপ্ত ব্যতীত আর কোন সভ্য উপস্থিত হন নাই। সুতরাং মেদিনীপুব জেলাবোর্ডেব প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবহাব কবিযাছিলেন তাহা কংগ্রেস পক্ষ হইতে অনালোচিত থাকিযা গেল।

ইহাব কিছুদিন পবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিব কার্য্যকরী সভায় আব এক মজা দেখা গেল। যতীন্দ্রমোহন পুনবায় ex-revolutionary (ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী)-দিগকে ডাকিয়া আনিয়া কার্য্যকরী সভায় স্থান দিলেন।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর প্লাবন

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছিল। এই বৎসর মে মাসে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। এই বৎসর মেদিনীপুর জেলায় আবার ভীষণ বিপদ দেখা দেয়। প্রবল বারিবর্ষণে এবং যুগপৎ কেলেঘাই, কংসাবতী বা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমস্ত মেদিনীপুব জেলা প্লাবিত হইয়া যায়। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাব স্বাভাবিক-পরোপকার-প্রবৃত্তি-বশে জনসাধারণেব দারুণ দুঃখে আকুল হইয়াছিলেন এবং ব্যথিত প্রাণে অর্থ, আহার্য্য ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ এবং জনসাধারণের মধ্যে সাহায্য দান ব্যাপার লইয়া চারিদিকে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া স্বীয় বিরাট দেহকে অস্বাভাবিক ক্লেশ দিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রিয় জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার আশায় তাহাদের নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দেশপ্রাণের সে ত্যাগ, সে ক্লেশ-স্বীকার, সে কর্ম্মকুশলতা ও সর্ব্বোপরি সে আত্মভোলা ভাব মনে করিলে তাঁহাব চরণতলে মস্তক আপনা হইতে নত হয়; মনের ভুল হয়, বীরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তই ধনীর সন্তান নন্—তিনি নিশ্চিতই বড ব্যারিষ্টার ছিলেন না। তিনি দেশবাসীর একান্ত আপনার লোক, বড় দরদী বন্ধু ছিলেন। অনেক নেতাব নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য অধিকাংশ লোকের হয় না। সহরের লোকে তাঁহাদিগকে দেখে, আর তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করে। যখন সেই নেতাদের দায় ঠেকে অর্থাৎ যখন কাউন্‌সিল বা য়্যাসেম্‌ব্লির সভ্য হওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্য হইতে ভোট সংগ্রহের দরকার হয়, তখন তাঁহাদের কৃত্রিম-করুণ দৃষ্টি পল্লীর দিকে পতিত হয়। যত দূর মোটর গাড়ী ছুটিবার সুবিধা তার বেশী দূর আর তাঁহাদের গতি নাই, কর্ম্ম নাই, দৃষ্টি নাই, ভাবিবার শক্তি নাই। পরোপকার-প্রবৃত্তি লইয়া যাঁহারা কিছুমাত্রও কাজ করেন, তাঁহারা সকলেই নাম-করা না হইলেও শ্রদ্ধার পাত্র। মেদিনীপুর জেলার বন্যা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে আর এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির কথা ভুলিতে পারা যায় না—যিনি স্বয়ং মেদিনীপুরের প্লাবনপীড়িত অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া, দেশবাসীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং

জনসাধারণের উদরের অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বসন সংগ্রহের জন্য আপনার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি সাগ্রহে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আমাদের অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচন

বীরেন্দ্রনাথের জীবনে সংগ্রামের অবধি নাই। প্লাবনের তীব্রতা হ্রাস পাইতে না পাইতেই পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন লইয়া মেদিনীপুর জেলায় একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। এক্ষেত্রেও বীরেন্দ্রনাথের বিরোধীদল মেদিনীপুর জেলার বাহির হইতে, বিশেষভাবে কলিকাতা হইতে তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিই স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীর যোগ্যতা বিচারের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মেদিনীপুরের সভ্য মনোনয়ন ব্যাপারে ব্যতিক্রম দেখা গেল।* একমাত্র শাসমলকে হঠাইবার অভিপ্রায়েই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি বীরেন্দ্রনাথ, তমলুকের প্রসিদ্ধ উকিল ও স্বদেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দান করেন। ইহা দেখিয়া শাসমল-বিরোধী-দলপুষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শাসমলের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান ৺দেবেন্দ্রলাল খাঁকে তাঁহাদের মনোনয়ন দেন। সে সময়ের বঙ্গীয় কংগ্রেসের কর্ণধারগণ জেলার মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাইয়া যেমন নীতি-বিরোধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি জেলা বোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দিয়া শাসমলের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও কুৎসিত স্বার্থপরতার জঘন্য নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলার কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সমিতির সম্পাদক ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আর দেবেন্দ্রলাল খাঁ ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রথমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শাসমলকে বঙ্গীয় আইন সভার নির্ব্বাচনে তাঁহাদের মনোনয়ন দিয়াছিলেন এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ঐ মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কোথায় কি ঘটিয়া যায়।

* ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঢাকার একনিষ্ঠ ত্যাগী কংগ্রেস-কর্ম্মী ৺ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ৺কিরণশঙ্কর রায়ের অনুকূলে এই প্রকার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অবৈধভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এইজন্য এবং ভবিষ্যতে স্বরাজ্য দলের শক্তি নিশ্চিতই হ্রাস পাইবে বলিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ বীরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের ভগিনী উর্মিলাদেবী ও আরও কয়েক ব্যক্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন। শাসমল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের চারি আনার সভ্য, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য থাকেন।

বিধানচন্দ্রের কারসাজি

এই সময় বিধানচন্দ্র দেবেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে একাধিকবার মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। তিনি একদিন মধ্যরাত্রে মেদিনীপুরে শাসমলের নিকট গিয়া প্রস্তাব করেন যে, উত্তর মেদিনীপুরে কুমার দেবেন্দ্রলাল গাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য করিয়া তাঁহাকে কাঁথি যাইতে হইবে।

কুমার দেবেন্দ্রলাল কংগ্রেসেরই সহায়তায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য হইয়াছিলেন এবং সদস্য হওয়ার পরই তিনি কংগ্রেস দলভুক্ত নহেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সরকারী মনোনয়নে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদ লাভ করিয়া জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়-গৌরব পদদলিত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে উত্তর মেদিনীপুর প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দিলে এই জেলার কংগ্রেস এবং যে সকল ভোটদাতা অল্পদিন পূর্ব্বে লোক্যাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় ৭৮ জন কংগ্রেস-প্রার্থীর মধ্যে ৭৭ জনকে অবহেলায় নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গুরুতর অবমাননা করা হইবে বলিয়া শাসমল বিধানচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই।

বে-আইনীভাবে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি দেবেন্দ্রলালকে মনোনয়ন দেন। ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি শাসমলের মনোনয়ন বলবৎ রাখিয়াছিলেন। ২২শা অক্টোবরের সংবাদে দেখা গেল, তাঁহারাও কুমার দেবেন্দ্রলালের মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়াছেন। বে-আইনীভাবে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি দেবেন্দ্রলালকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মনোনীত করায়, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস

কমিটি উহাতে দৃঢ় আপত্তি জ্ঞাপন করেন এবং শাসমলকেই তাঁহাদের মনোনয়ন দান করেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রলাল সরকারের পক্ষে ও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কতকগুলি কাজ করিয়াছিলেন :

(১) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী দেবেন্দ্রলাল মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠে গোপ প্রাসাদে বাংলার তৎকালীন লাট লর্ড লিটনকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

(২) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের সময় দেবেন্দ্রলাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধুর মতানুসারে কাজ কবিবেন। সেই হেতু উত্তর মেদিনীপুব কেন্দ্রেব জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শাসমলেব সতীর্থ শ্রীসাতকড়িপতি রায়কে সেখান হইতে সরাইয়া আনিয়া কলিকাতায় বডবাজারে সতীশবঞ্জন দাশের বিরুদ্ধে দাঁড় কবান হয় এবং দেবেন্দ্রলালকে উত্তর মেদিনীপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াই তিনি সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হন এবং সেখানে দেশবন্ধুব কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ কবেন।

(৩) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শা জানুয়াবী ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির কুমার শিবশেখবেশ্বর রায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং আইনের বন্দিগণের মুক্তি প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। দেবেন্দ্রলাল উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

(৪) ঐ দিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেবেন্দ্রলাল তাহার বিরুদ্ধেও ভোট দেন।

(৫) ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির নেতা ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ২৮শা জানুয়ারী দমননীতিমূলক আইনগুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেবেন্দ্রলাল সেই প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হন নাই।

(৬) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দিগণের মুক্তি প্রস্তাব ও দমননীতি-মূলক আইন প্রত্যাহার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সরকার তদনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় স্বরাজ্য ও ন্যাশন্যালিষ্ট উভয় দল একত্র বাজেট প্রত্যাখ্যান করিতে সংকল্প করেন এবং তদনুসারে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শা মার্চ্চ দেশপ্রিয়

সেনগুপ্ত ভূমি-রাজস্ব বাবদ ব্যয় না-মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেবেন্দ্রলাল ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

(৭) ঐ দিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় আবগারি বিভাগের খরচ না-মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেবেন্দ্রলাল এই প্রস্তাবেব পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন নাই। প্রস্তাবটি এক ভোটে নষ্ট হইয়া যায়।

(৮) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২০শা মার্চ্চ স্বরাজ্য দলেব হেমন্তকুমাব সরকার বাংলার লাটের মিলিটারি সেক্রেটারির ঢাকা ও পাহাড়ে যাইবাব খরচ না-মঞ্জুর করার প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেবেন্দ্রলাল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। প্রস্তাবটি সভাপতির কাষ্টিং ভোটে নষ্ট হয়।

(৯) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শা মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণ শাসন সংক্রান্ত ব্যয় ও বিচার সংক্রান্ত ব্যয় না-মঞ্জুর করিবার প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধেও দেবেন্দ্রলাল ভোট দিয়াছিলেন।

(১০) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শা মার্চ্চ জেল খরচ, গোবা সার্জেণ্টদের বেতন ও পুলিশ পর্য্যবেক্ষণ খরচ হ্রাস করিবার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রলাল ভোট দিয়াছিলেন।

(১১) ঐ বৎসর ২৬শা মার্চ্চ দেবেন্দ্রলাল গোয়েন্দা পুলিশের ব্যয় কমাইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও ভোট দিয়াছিলেন।

(১২) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসী হিসাবে মেদিনীপুর লোক্যাল বোর্ড ও জেলাবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেবেন্দ্রলাল সরকারী মনোনয়নে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রলালের পিতা ৺রাজা নরেন্দ্রলাল খা দেশসেবাব পুরস্কার হিসাবে বৃটিশ সরকারের হাতে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার দানে ও তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত উকিল ৺উপেন্দ্রনাথ মাইতির উদ্যোগে মেদিনীপুর সহরে জলের কল স্থাপিত হয় এবং জনসাধারণের পানীয় জলের কষ্ট দুরীভূত হয়। তাহা ছাড়া তিনি স্বাধীনতা অর্জন আন্দোলনেও বহু অর্থ দান ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রলাল ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ভদ্র ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। দুঃখীর দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিত। পরবর্ত্তী কালে তিনিও কংগ্রেসের স্বাধীনতা অর্জন আন্দোলনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় তিনি আন্দোলনকারীদিগকে নানাভাবে সাহায্য

করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পিতার লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া কেন যে বৃটিশ সরকারের পোষকতা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কেহ-কেহ বলিতেন—বৃটিশ সরকারকে তোষামোদ করিয়া রাজা উপাধি লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়—দেবেন্দ্রলালের কার্য্যকলাপের সবটার জন্য তাঁহার নিজের বুদ্ধি দায়ী ছিল না। আমার আরও মনে হয় যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে বুদ্ধি দিতেন, তাঁহারা যথার্থতঃ তাঁহার বা দেশের আদৌ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তাঁহারা তেজস্বী জননায়ক শাসমলের প্রভাব-বিস্তৃতি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং সেই হেতু তাঁহার সহিত উদারহৃদয় ও বিত্তবান দেবেন্দ্রলালের হৃদ্যতা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন শাসমল ও দেবেন্দ্রলাল মিলিত হইলে মেদিনীপুরই বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবে যাহা তাঁহাদের অসহ্য। দেবেন্দ্রলাল অত্যন্ত বিলম্বে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে তাঁহার তথাকথিত বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও শাসমলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই।

যাহা হউক, ও-দিকে কাঁথির প্রমথ-বাবুর বিরুদ্ধে মুগবেড়িয়ার বিপুল-বিত্তশালী জমিদার স্বর্গীয় গঙ্গাধর নন্দকে দাঁড করান হয়। গঙ্গাধর-বাবু প্রথমে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হন নাই। তাঁহাকে সম্মত করাইবার জন্য শাসমলের বিরোধীদল তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মাইতিকে মুগবেড়িয়া পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। তমলুকের মহেন্দ্র-বাবুর বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার রেবতীনাথ মাইতি দাঁড়াইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহেন্দ্র-বাবুর সাফল্যের সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না। কারণ সমগ্র তমলুক মহকুমার লোকে মহেন্দ্র-বাবুকে এত বেশী শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে-কেহ দাঁডাইলে পরাজিত হইবেন একথা নিশ্চিত ছিল।

এখন সংগ্রাম বাধিল—প্রমথ-বাবু ও গঙ্গাধর-বাবুর মধ্যে এবং বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলালের মধ্যে। প্রমথ-বাবু জাতীয় বিদ্যালয়ের নিঃস্ব শিক্ষক। তাঁহার সম্বল দেশসেবা, কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, আর বীরেন্দ্রনাথের চালনা। আর গঙ্গাধর-বাবু বিপুল-বিত্তবান্, তবে তিনি বদান্য, তাহা ছাড়া তিনি স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ অর্থশূন্য, তাঁহার সম্বল দেশসেবা ও কয়েক জন একনিষ্ঠ কর্ম্মী;

আর দেবেন্দ্রলালের অর্থসম্পদ প্রচুর, তিনি জেলাবোর্ডের সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান। এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথকে নিজের নির্ব্বাচন কেন্দ্র ও প্রমথ-বাবুর নির্ব্বাচন কেন্দ্র—এই উভয় স্থানের কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। বীরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রলালের মধ্যে যে রকম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। তখন পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান অন্যতম উপ-মন্ত্রী চিত্তরঞ্জন রায় অত্যুৎসাহে শাসমলের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রলালের পিতা নবেন্দ্রলালের সহিত প্রভাবপত্তিশালী উকিল উপেন্দ্রনাথ মাইতির যে বন্ধুত্ব ছিল, মনে হয় তাহারই খাতিরে তিনি দেবেন্দ্রলালকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং শাসমলের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ থাকিলেও ভোটাভোটির ফল অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। যাহা হউক্, ভোট গণনার ফল বাহির হইলে দেখা গেল—পল্লী অঞ্চলে অধিক ভোট পাইলেও মেদিনীপুর সহরে কম ভোট পাওয়ায় বীরেন্দ্রনাথ অল্প ভোটের পার্থক্যে পরাজিত হইয়াছেন। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ দমিলেন না। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলার নির্ব্বাচনে ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণরূপে বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ম্মপটুতা ও দেশসেবার পরিচয় আর একবার দেশবাসীকে দেখাইয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেসের শুধু নাম-লেখান সভ্য হইলেই দেশসেবক হওয়া যায় না। দেশবাসীর যথার্থ সেবা করিলেই তাহাদের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করা যায়।

কংগ্রেস সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর কোর্ট ছাড়িয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

এই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠন করা হয়। সে সময় শাসমল সম্পাদক ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও বাগ্মী ৺জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শাসমল সম্পাদক হইয়াই গ্রাম-সংস্কার ভাণ্ডার (Village

Reconstruction Fund)-এর হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কমিটি গঠন করেন। তখন ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবী ও অন্যান্য অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়। ইহার কয়েক দিন পরে বীরেন্দ্রনাথের উপর আবার অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণের জন্য তাঁহার উপর অনাস্থা-প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এবারে তাঁহার বাংলার কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার ঠিক পরেই তাঁহার উপর আবার কি কারণে অনাস্থা প্রস্তাব আসিতে পারে! বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভায় স্থির হয়—ভারতীয় কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনের পর প্রস্তাবটি আলোচিত হইবে। গৌহাটি অধিবেশনের পর শাসমল নিম্নলিখিত বিবৃতি বাহির করেন।

To all members of B. P. C. C.

Dear Sirs,

In my statement published yesterday in the papers I promised that if I were convinced that in my Krishnagar speech I had actually referred to political detenues and sufferers and had also wounded their personal feelings, I would, as a gentleman, make amends and express regret most sincerely. Now, from the discussions that I had last night with several of my friends, who are political sufferers, I am convinced that certain sentences in my speech can be honestly construed in that way and so I not only express sorrow but also beg to announce that I withdraw unconditionally the hole paragraph of my speech relating to Terrorism or Anarchist Conspiracy (P. P. 8 and 9) and the other objectionable portion thereof in pages 29 and 30 i. e. all the sentences beginning from the words "আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে" and ending with the words "তাঁহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবেন।" I trust, this will satisfy those who have been offended and whose co-operation in our struggle for political freedom I value so much.

Calcutta
11th February, 1927

Yours truly,
(Sd) B. N. Sasmal.

অর্থাৎ

বি. পি. সি. সি.র সভ্যগণের প্রতি

প্রিয় মহাশয়গণ,

গত কল্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার এক বিবৃতিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, যদি আমি বুঝিতে পারি—আমি আমাব কৃষ্ণনগব অভিভাষণে রাজবন্দীদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রকৃতই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমি ভদ্রভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দুঃখ প্রকাশ কবিব। গত রাত্রে রাজনৈতিক কারণে নিপীড়িত কয়েক জন বন্ধুব সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—আমার অভিভাষণের কয়েকটি বাক্যের ঐভাবে অর্থ করা যাইতে পারে। সেই জন্য আমি যে কেবল দুঃখ প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে, এই সঙ্গে ইহাও জানাইতেছি যে, আমি সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমাব অভিভাষণেব সমস্ত অংশটুকু (৮পৃঃ—৯পৃঃ) এবং ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠাব আপত্তিকর অন্য অংশটুকু ("আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে—আপনা হইতেই সরিয়া পডিবেন") তুলিয়া লইতেছি। যাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যাঁহাদেব সহযোগিতা আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলনে আবশ্যক, তাঁহারা বোধ হয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

কলিকাতা
১১ই ফেব্রুয়ারী,
১৯২৭

আপনাদেব
(স্বাক্ষর) বি এন. শাসমল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থার প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। কারণ আর কিছুই নহে, ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবিগণ ও ফাঁকিদারি-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কংগ্রেসিগণ তাঁহাকে চায় না। বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থার-প্রস্তাব চারি ভোটে পাশ হয়। ইহাই বাংলাব কংগ্রেসেব কূটনীতি।

এই সময় হইতে শাসমল দীর্ঘকালের জন্য বাংলার কংগ্রেস-রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইযাছিলেন।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সরকার এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায়-স্বরূপ আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সরকার এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কাজেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। এই আন্দোলনে মেদিনীপুর-জেলাবাসী যে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, ত্যাগস্বীকার ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তাহা বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে কিনা জানি না, তবে তাহা জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই আন্দোলনের সময় বৃটিশ সরকারের পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণ করে, অনেক স্থানে ঘরবাড়ী, গোলাভরা ধান এমন কি গরু-বাছুরও পুড়াইয়া দেয়। মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল বীরেন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহের সহিত তৎসমুদয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতায় জনসাধারণের এক সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। খ্যাতনামা য়্যাটর্ণী ও বাংলার মডারেট দলের নেতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু এই তদন্ত কমিটির সভাপতি এবং স্বর্গীয় ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথও এই তদন্ত কমিটির একজন সভ্য ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার ও মুক্তি

যতীন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন সভ্য সে সময় জনসাধারণের উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে কাঁথি গিয়া কাঁথি মহকুমা হাকিমের আদেশে গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রনাথ এক দিন বলিয়াছিলেন, বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত দেখা

হইলে যতীন-বাবু যে হাতে তাঁহাদের করমর্দ্দন করেন, পুলিশ আসিয়া যতীন-বাবুর সেই হাত ধরিল। যাহা হউক, তদন্ত কমিটি জনসাধারণের উপর পুলিশী জুলুম সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে-বিবরণ প্রকাশ করেন তাহা বাংলা সরকাব বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই তদন্ত কমিটির কার্য্য দ্বারা বীরেন্দ্রনাথ সে সময় মেদিনীপুববাসীর মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইযাছিলেন, সেই সময়োপযোগী আর কোন কার্য্য দ্বারা বোধ হয় তাহা সম্ভব ছিল না। সরকাবও তাঁহাকে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলিয়া ভুল করেন নাই। তাঁহার বীব-হৃদয়েব মধ্যে যে বহ্নি প্রদীপ্ত ছিল তাহা যে-কোন সুযোগে আত্মপ্রকাশ কবিতে পাবে এবং মেদিনীপুববাসীব মধ্যে সেই বহ্নি উদ্দীবিত হইলে তাহাব বেগ ও তেজ দমন করিতে সরকারকে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বুঝিয়া তাহারা প্রথম হইতে তাঁহার এই আইনানুগ কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে শাসমল কংগ্রেসেব কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূবে ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বব মাসে একদিন বৈকালে তাঁহাব বাড়ীতে আইন অমান্য আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলেন—"বর্ত্তমান আন্দোলন ব্যর্থ হইবেই। কাবণ আন্দোলনেব নেতৃবর্গ গণসংযোগ না কবিয়া জনগণকে ব্যাপক আন্দোলনেব জন্য প্রস্তুত না কবিয়া আন্দোলন আবম্ভ কবিয়া দিয়াছেন। এই আন্দোলন সকল স্থানে বিস্তৃত হইবে না। যে সামান্য কয়েকটি স্থানে আন্দোলন আরম্ভ হইবে সেই সকল স্থানে পুলিশ অত্যাচাব চালাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইবে। যদি এই আন্দোলন দেশেব সর্ব্বত্র না হইলেও অন্ততঃ অর্দ্ধেক অঞ্চলে আরম্ভ করা সম্ভব হইত, তবে বৃটিশ সবকার পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু দেশবাসীকে ত তৈয়ারী কবা হয় নাই। কাজেই সাফল্যের আশা কবা যায় না। এই আন্দোলনে মেদিনীপুববাসী সমধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। সরকাব মেদিনীপুবকে ভাল চক্ষে দেখিতে পাবে না। তাহা ছাড়া, মেদিনীপুরের মত প্রবল আন্দোলন যদি বাংলার সাতটা জেলায়ও আরম্ভ হইত, তাহা হইলেও অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এখন মেদিনীপুরবাসী যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখান হইতে ফিরিয়া আসার উপায় নাই। কাজেই চরম দুর্দ্দশা অনিবার্য্য।"

মনে পড়ে এই আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এগরা থানার চোরপালিয়া গ্রামে পুলিশ প্রবেশ করিলে কয়েক জন লোক ভয়ে একটি পানা পুকুরে নামিয়া

পড়ে। পুলিশ তাহাদের এগার জনকে লাঠির আঘাতে নিহত করিয়া ঐ পানা পুকুরেই ফেলিয়া রাখিয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও বহুস্থানে পুলিশ নির্মম অত্যাচার করে। পুলিশের লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের কতকগুলি আলোকচিত্র শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত করেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলাব বাহিরেব অথচ বাংলার অন্যান্য জেলাব খ্যাত অনেক কংগ্রেসকর্মী মেদিনীপুরে বিশেষতঃ কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় আইন অমান্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা মেদিনীপুরে না গিয়া নিজ-নিজ জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন চালাইলে, আন্দোলন ব্যাপক হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না কবিয়া তাঁহাবা মেদিনীপুবে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনেব কথা এই ছিল এবং তাঁহাদের কয়েক জনকে এই কথা বলিতে শুনা গিয়াছে "শাসমল ত ফিল্ড (ক্ষেত্র) তৈরী করে রেখেছে। আমবা সেখানে যাব, আর বন্দে মাতরম্ বলব। তারপব আমাদের গ্রেপ্তাব আর জেল, সে ত জানা কথা। আমাদের জেলে যাবার পর যারা মবে মরুক, সে কথা আমাদের ভাববার দরকার নাই।

শাসমল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কবেন নাই। তবুও আইন অমান্য আন্দোলনের সময ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বব মেদিনীপুব জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ জেলায় শাসমলের উপস্থিতি শঙ্কাজনক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাহাতে শাসমল মেদিনীপুব জেলায় প্রবেশ করিতে না পারেন সেজন্য তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারীব নির্দ্দেশ দেন: বীরেন্দ্রনাথ এক মোকদ্দমা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে সেখানে তাঁহার উপর ১৪৪ ধাবা জারি হয়। বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মোকর্দ্দমা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে মোকর্দ্দমার কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহাকে যে মেদিনীপুর জেলার সীমা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং দুই মাসের মধ্যে তিনি আর ঐ জেলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না একথাও তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ দিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বাড়ী, তিনি আইন ব্যবসায় লইয়া থাকেন, আইন ব্যবসায় সম্পর্কে ও সম্পত্তি পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার মেদিনীপুর যাওয়া আবশ্যক—এই রকম আপত্তি জানাইয়া তাঁহার উপর ঐ নিষেধ জারী নাকচ করিবার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করেন। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আদেশ বজায় রাখেন এবং সেই সঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য।

Mr. Sasmal's presence in the disturbed areas at the earlier stage of the movement provoked intense political ferment and hostile excitement in the past sometimes threatening tranquility in different parts of the district. His presence at any place in the district at the present moment when the atmosphere is charged is likely to provide sparks for a widespread conflagration, considering it difficult for the local authorities to deal with the situation effectively with the limited force at their disposal before considerable mischief has already been done.

Previously Midnapore was the centre of his political and professional activities. He has now shifted his residence to Calcutta without shifting his political centre of gravity from the district of Midnapore. It is well-known that he exercises unbounded political influence not only over the peope of his own community but also over the bulk of the Hindu population which preponderates over other communities residing in the district.

The presence of Mr. Sasmal has always been a source of excitement and encouragement to the illiterate masses who look up to him for inspiration, lead and guidance.

Mr. Sasmal's presence in any part of the district at the present moment is a source of immediate danger to the public tranquility.

অর্থাৎ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বিক্ষুব্ধ অঞ্চলসমূহে মিঃ শাসমলের উপস্থিতি গভীর রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিরোধী মনোভাব জাগাইয়াছিল। তাহাতে মধ্যে-মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে জেলার আবহাওয়া এমন উত্তেজনাপূর্ণ রহিয়াছে যে, এই

সময় জেলার যে কোন অংশে তাঁহার উপস্থিতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া বিশাল অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি কবিতে পারে। তাহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যে সামান্য পুলিশবাহিনী আছে তাহা দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে রাখা ও যথেষ্ট অনিষ্টপাত নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

পূর্ব্বে মেদিনীপুবই তাঁহাব রাজনৈতিক কার্য্য ও ব্যবসায়গত ব্যাপারের কেন্দ্র ছিল। তিনি এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু মেদিনীপুরই তাঁহাব বাজনীতিব কেন্দ্র রহিয়াছে। সকলেই জানেন—তিনি কেবল তাঁহাব স্বজাতিব উপর নহে, জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর অসীম রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তাব কবেন।

মিঃ শাসমলেব উপস্থিতি সর্ব্বদাই নিবক্ষর জনসাধারণের নিকট উত্তেজনা ও উৎসাহেব কারণ। তাহারা তাঁহার দিকে প্রেবণা ও চালনাব জন্য তাকাইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুব জেলার যে-কোন স্থানে মিঃ শাসমলের উপস্থিতিতে জনসাধারণেব শান্তি বিপন্ন হইবে।

বীবেন্দ্রনাথ মেদিনীপুবেব সেসন জজেব আদালতে ঐ আদেশেব বিরুদ্ধে দবখাস্ত কবেন। এই সময় তিনি আদালতে তেজস্বিতাপূর্ণ যে উক্তি করেন তাহা বীব-হৃদয়-মাত্রকেই স্পর্শ কবিবে। শাসমল বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"However much poor and humble and disreputable I may be in your eyes, I am not altogether defenceless in a matter like this I may tell you frankly that these things are not increasing my faith in and admiration for British justice in any way. They have travelled far beyond the realm of decency, fairplay and justice."

অর্থাৎ আমি আপনাদেব দৃষ্টিতে যতই দীন-হীন অখ্যাত প্রতিভাত হই না কেন, আমি এই বকম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায় নয়। আমি অকপটে আপনাদিগকে বলিতে পাবি যে, এই সব ব্যাপাবে বৃটিশ ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি আমাব প্রতীতি ও প্রশংসা কোন প্রকারেই বর্দ্ধিত হইতেছে না। তাঁহারা সৌজন্য, সদাচার ও সুবিচারের সীমা হইতে সুদূরে সরিয়া গিয়াছেন।

পরে মেদিনীপুর হইতে বীরেন্দ্রনাথের দরখাস্ত হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয় হাইকোর্টের আদেশে তাঁহাব উপর ১৪৪ ধারা জারি বাতিল হইয়া যায়। এইখানে মনে হয় শাসমল পুরুষসিংহ। বীরেন্দ্রনাথ ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে

দরখাস্ত না করিলে তাঁহার যে কি প্রকার অসুবিধা হইত এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিকেও যে কি প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা পাঠক এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারেন।

বৃটিশ আইন ও পুলিশের বিচারে কোন-কোন স্থলে যে নির্দোষ ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হইত তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাও শাসমলের জীবনেব সহিত কিছু পবিমাণে জড়িত। যখন এদেশে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার লইয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া যায়, সেই সময় মেদিনীপুরে এক বোমার মামলা সৃষ্টি হয়। বাংলাব তদানীন্তন লাট স্যার এণ্ডরু ফ্রেজারের উড়িষ্যা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে নারায়ণগড় ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ লইয়া এই বোমাব মামলার সৃষ্টি। এই মামলায় নবীন ব্যারিষ্টার শাসমল আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। দায়রার বিচারে সকল আসামীর দীর্ঘকাল দ্বীপান্তব বাসেব হুকুম হয় এবং হাইকোর্টের আপীলে সরকারের কৌন্‌সিল মিঃ আর্ডলি নর্টন প্রায় সকলেব বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে কোন প্রমাণ নাই বলিযা স্বীকাব করা সত্ত্বেও সকলের সম্বন্ধেই সাবেক রায় বহাল থাকে। পরে আলিপুব ষড়যন্ত্রেব মামলায় সময হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচাবপতি স্যার লবেন্‌স জেন্‌কিন্‌স সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যখন সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, এই মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন বছর-খানেক পরে সকল আসামীকেই সবকাব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ইতিহাসে তথা বীরেন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রদেশ গঠনের সময় হইতে একই গভর্ণর বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসব অতিবাহিত হওয়ার পর উড়িষ্যাবাসী উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠন করিতে ও স্বতন্ত্র গভর্ণরের অধীনে বাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা করা হইয়াছিল।

উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইলে উড়িষ্যাকে তাহার শাসনসংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ভাব বহন করিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা বলিতে যতটুকু ভূভাগ বুঝাইত, তাহার আয় হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত উড়িষ্যার শাসনব্যয় সংকুলান হইতে পারিত না। কাজেই ব্যয় সংকুলানের জন্য আয়বৃদ্ধি এবং ভাষাগত ও শিক্ষাগত সাদৃশ্যের অজুহাতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব উড়িষ্যাবাসীদের পক্ষ হইতে উত্থাপন করা হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এক বার বৃটিশ সরকার মেদিনীপুর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নানা কারণে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। মেদিনীপুর এখনও এক অখণ্ড বিশিষ্ট জেলারূপে গৌরব ভোগ করিয়া আসিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার নেতৃগণ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে বাংলাদেশ হইতে ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করার দাবী করেন। অবশ্য এই দাবীর পশ্চাতে গুপ্ত মস্তিষ্কের খেলা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার দুর্ভাগ্য এই যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে সর্ব্বহারা মেদিনীপুরবাসীর যুদ্ধক্ষত বিদূরিত হইতে না হইতেই এই জেলার দক্ষিণাংশকে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা উত্থাপন করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া মেদিনীপুর জেলায় আবার একটা মহাসাড়া পড়িয়া যায়। সাড়ার কারণ আর কিছু নয়—মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগ উড়িষ্যার সহিত

কোনক্রমেই সংযুক্ত হইতে পারে না, মেদিনীপুর-জেলাবাসী মেদিনীপুর জেলার কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতে পারে না।

এই সময় মেদিনীপুরের কাঁথি সহরে "মেদিনীপুর জেলা-বিভাগ-বিরোধী সমিতি" নামে এক সমিতি গঠন করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি ও অন্যান্য স্থানে সভার অনুষ্ঠান করেন এবং মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন করিবার বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া দেশবাসী তথা উড়িষ্যাবাসীকে বুঝাইয়া দেন যে, মেদিনীপুর জেলা বিচ্ছিন্ন হইলে বিচ্ছিন্ন অংশের ও অবশিষ্ট অংশের কোন লাভ বা সুবিধা হইতে পারে না। কাজেই মেদিনীপুব জেলাকে বিভাগ করিয়া ইহার কোন অংশ উড়িষ্যাব অন্তর্ভুক্ত হইতে দেওয়া চলিবে না। শাসমল এই সময় কলিকাতার "য়্যাডভান্স" (Advance) নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি পরে সেগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া "মিড্‌নাপুর পার্টিশন" (Midnapore Partition) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। মেদিনীপুব বিভাগ লইয়া শাসমল বাংলার গভর্ণর ও ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট দুইখানি প্রকাশ্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২২শা সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকারী গান্ধীজীর নিকট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নোদ্ধৃত দুইখানি তারবার্ত্তাও প্রেরণ করেন।

গান্ধীজীর নিকট শাসমলের তারবার্ত্তা

Earnestly request you to oppose proposal incorporating Midnapore with Orissa in Federal Structure Committee. Midnapore is quite unknown to the Raja of Parliakimedi. Facts and figures are overwhelmingly against proposal. There is no cultural and linguistic unity. Midnapore refuses amalgamation to a man. Oriyas exercising congress influence although Midnapore Congress opposing. Please settle nothing without consulting Midnapore and have Midnapore properly represented in Boundery Committee.

অর্থাৎ ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন কমিটিতে উড়িষ্যার সহিত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য আপনাকে আন্তরিক অনুরোধ

জানাইতেছি। মেদিনীপুর জেলার বিষয় পার্লিয়াকিমেদির রাজার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐক্য নাই। মেদিনীপুব উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে চায় না। মেদিনীপুর কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেও উডিয়াগণ কংগ্রেসের প্রভাব কাজে লাগাইতেছেন। মেদিনীপুববাসীর সহিত পবামর্শ না করিয়া কোন বিষয় স্থির কবিবেন না এবং সীমা নির্দ্ধারণ কমিটিতে মেদিনীপুরের প্রতিনিধি যাহাতে যথাযথরূপে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(পার্লিয়াকিমেদির বাজাও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।)

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট শাসমলের তারবার্ত্তা

Regarding proposed Orissa Province do not kindly settle anything finally without hearing Midnapore. Midnapore is quite unknown to the Raja of Parlıakımedı. Midnapore refuses amalgamation with Orissa to a man. There is no cultural and linguistic unity between the two. Please see Midnapore properly represented in Boundery Committee.

অর্থাৎ প্রস্তাবিত উড়িষ্যা প্রদেশ সম্পর্কে অনুগ্রহপূর্ব্বক মেদিনীপুববাসীর বক্তব্য শ্রবণ না করিয়া চূডান্তভাবে কোন কিছু স্থিব করিবেন না। মেদিনীপুব জেলা পার্লিয়াকিমেদির বাজার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে অনিচ্ছুক। মেদিনীপুর ও উডিষ্যাব মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য নাই। সীমা নির্দ্ধারণ কমিটিতে মেদিনীপুরেব প্রতিনিধি যাহাতে যথাযথভাবে স্থান পায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মেদিনীপুর বিভাগ লইয়া মেদিনীপুরবাসিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পডিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মেদিনীপুরের অদৃষ্ট বা পুরুষকার বা আরও কিছু একটার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ আপনার স্বাভাবিক নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও যুক্তি দ্বারা মেদিনীপুব বিভাগ প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনে কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন। এই সময় কি বাংলার বাঙ্গালী, কি উড়িষ্যাব বাঙ্গালী, কি অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালী, মেদিনীপুর-বিভাগের সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য

করেন নাই, আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, প্রতিবাদ করেন নাই। যে কলিকাতা মহানগরী শিক্ষা ও রাজনীতির কেন্দ্র, সেখানে একটা প্রতিবাদ-সভা হয় নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় শুধু বাংলাব্যাপী নয়, সমস্ত ভাবতব্যাপী আন্দোলন সম্ভব হইয়াছিল। (প্রস্তাবিত) মেদিনীপুর-বিভাগের সময় আন্দোলন ত দূরের কথা, প্রতিবাদ সভা করিবার মতও মনের ব্যথা মেদিনীপুরবাসী ছাড়া আর কাহারও ছিল না।

বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন স্বয়ং সরকার। আর মেদিনীপুর বিভাগের প্রস্তাবক উড়িষ্যাবাসী, সমর্থক ও প্রবর্ত্তক কেহ হইতে পারিত কিনা জানি না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারী ছিলেন বঙ্গবাসী—তথা অন্যান্য সকলে। মেদিনীপুর বিভাগেব প্রতিবাদকারী ছিলেন—বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী ও দুই একজন সাংবাদিক। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্—এই হিসাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারী বঙ্গবাসী তখন মেদিনীপুর বিভাগের সমর্থক। উড়িষ্যাবাসী ও উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীদের বলিবাব কথা এই—আমবা ত পেটের দায়ে বাংলা মুল্লুক ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি এবং কোন প্রকারে কোণঠাসা হইয়া দিন যাপন করিতেছি। কাজেই বাংলাদেশ হইতে আর কিছু লোক আসিয়া মিলিত হইলে আপাততঃ কথা বলিবার মত লোক পাই, তারপর না হয় মনোমালিন্য হইবে—সে ত পরেব কথা। আর বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালীগণ বলিবেন—উড়িষ্যাবাসিগণ দাবী কবিলই বা, সরকার ত কিছু বলেন নাই, সেই জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়া আছি। তখন দেখা গিয়াছে, বাংলার তথাকথিত নেতারা, এমন কি, পরে যাঁহারা বাংলার কংগ্রেস-তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে বাংলার নানা স্থানে ও বাংলার বাহিরে গিয়া শাসমলের হাতে-গড়া মেদিনীপুবের নামে বাংলাদেশে তাঁহাদের কাজের বহর দেখাইয়া অভিনন্দন কুড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারাও মেদিনীপুর-বিভাগেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে নিষ্পেষিত মেদিনীপুবের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এমন কি, কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০।৪৫ মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলায় গিয়া সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেও ইচ্ছা করেন নাই। তখন যে পুরুষসিংহ শাসমল জীবিত এবং তিনি যে অসংখ্য প্রকারে মেদিনীপুরের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের জন্য দিবারাত্রি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পরে

অনেকে বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সরলমনা মেদিনীপুরবাসীর মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার আশায় মেদিনীপুরের দিকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের তোষামোদ করিয়া কাজ হাসিল করিবার আশায় তাঁহারা মেদিনীপুরকে বাংলার বারদৌলি বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাতে লজ্জায় তাঁহাদের মাথা কাটা যাইত না। ইহাই তাঁহাদের নিকৃষ্টমন্যতা (inferiority complex)। তাঁহারা একথা ভুলিয়া যাইতেন যে, শাসমলেব কর্ম্মধারা-পূত, বাংলার রাজনীতির পুণ্যক্ষেত্র মেদিনীপুর বারদৌলি অপেক্ষা অধিকতব ত্যাগ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতাব পবিচয় দিয়াছে, কাজেই যদি গুজরাটের লোকেব দবকাব হয় তবে তাহাবা বলুক্—বারদৌলী গুজরাটের মেদিনীপুর। মেদিনীপুরেব কাজেব এত প্রশংসা মৌখিক, কি, আন্তরিক তাহা মর্য্যাদা-দানের বহব দেখিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল, আব আকাশে-বাতাসে খেলিয়া গিয়াছিল—মেদিনীপুর! বিশেষভাবে যে অংশ বিচ্ছিন্ন কবিবার কথা! সেটা ত শাসমলের দেশ! গেলেই বা কি, আর থাকিলেই বা কি!

মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্রনাথের যুক্তি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর বিভাগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যে সব যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন পরে সেগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া মিড্নাপুব পার্টিশন (Midnapore Partition) নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন। সেই পুস্তিকার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই স্থলে দেওয়া হইল।

"কাঁথিতে একটি কলেজ আছে, কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যায় মাত্র একটি কলেজ আছে। কাঁথি মহকুমায় প্রায় ১২টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যাব মধ্যে প্রায় ১০।১২টি উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয় আছে। কাঁথি মহকুমায় বালক-বালিকাদের জন্য প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৮৯টি, আর বালেশ্বর জেলায় ৮৫১টি। উড়িষ্যার যে-কোন মহকুমা অপেক্ষা কাঁথি মহকুমায় দাতব্য ঔষধালয়ের সংখ্যা অধিক। কাজেই উড়িষ্যা অপেক্ষা দক্ষিণ মেদিনীপুরের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গড়পড়তা খরচ অনেক বেশী।

আদালতের ভাষা বাংলা ও উড়িয়া দুইই হইবে—এ প্রস্তাব হাস্যকর। কারণ তাহাতে উড়িয়াগণ যে উড়িয়া ভাষা ও উড়িয়া কৃষ্টির উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ চাহিয়াছেন, সেগুলির কোন উন্নতি হইবে না। ইহাই যদি উড়িষ্যা

নেতাদের অভিমত হয়, তবে তাঁহাদের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সত্যভাবে জানান উচিত যে, তাঁহারা ভাষাগত ও শিক্ষাদীক্ষাগত সাদৃশ্যের নামে কতকগুলি সরলপ্রাণ লোককে প্রতারিত করিতে চান। ইহাই যদি তাঁহাদের অভিমত না হয়, তবে দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে আদালতের কার্য্য চালাইবার জন্য উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিতে এবং বাংলা ভাষা ভুলিয়া যাইতে হইবে। দক্ষিণ মেদিনীপুরের শতকরা ৯৯.৯ জন লোক উড়িয়া বর্ণমালা জানেন না। তাঁহাদিগকে উড়িয়া বর্ণমালা শিখিবার কথা বলিলে বিবাগভাজন হইতে হইবে।

উড়িষ্যায় হাইকোর্ট নাই এবং অর্থাভাব হেতু অদূর ভবিষ্যতে হাইকোর্ট হওযাব সম্ভাবনাও নাই। কাজেই দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে হাইকোর্ট সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতাব পরিবর্ত্তে পাটনা যাইতে হইবে এবং তাঁহাবা যে শান্তভাবে ইহাতে সম্মত হইবেন ইহা আশা করা সত্যই যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ত্তমান সময়ে বালেশ্বরে স্থায়ী জেলা ও দায়রা জজ নাই। কাজেই জেলা আদালতের কাজ শেষ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মেদিনীপুরের পবিবর্ত্তে কটক যাইতে হইবে। কটকে সার্কিট হাইকোর্ট বসিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা স্থায়ী কলিকাতা হাইকোর্টেব ব্যবস্থা অপেক্ষা কখনও উত্তম বিবেচিত হইতে পরে না। বালেশ্বরে কিম্বা কটকে আজ পর্য্যন্ত ফৌজদাবী মামলায় জুবীর বিচারের ব্যবস্থা নাই। দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসী প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া জুরীর বিচারের যে সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

দক্ষিণ মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের মধ্যে কাঁচা কিম্বা পাকা রাস্তা নাই, ভীষণ সুবর্ণরেখা নদী রহিয়াছে। কাজেই বালেশ্বর যাইতে হইলে দক্ষিণ মেদিনীপুর-বাসীকে বহু পথ ঘুরিয়া যাইতে হইবে।

কিছু অংশ বাংলাদেশে আর কিছু অংশ উড়িষ্যায় এইভাবে জমিদারী ভাগ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তাহাতে জমিদারদিগকে দুই বিভিন্ন প্রদেশে মহকুমা আদালত হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসী চারি কিস্তিতে তাঁহাদের খাজনা দেন। আর উড়িয়াগণ দুই কিস্তিতে দেন। উড়িষ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজস্ব সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। আর মেদিনীপুরে মুন্সেফের আদালতে তাহার বিচার

হয়। কালক্রমে দায়ভাগ প্রথা পরিবর্তিত হইয়া মিতাক্ষরা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে সাময়িক খাজনাবৃদ্ধি ব্যবস্থা হইবে।

ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত গভর্ণরের দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হয়, আর উড়িষ্যা হয়ত একজন সিভিলিয়ান গভর্ণর দ্বারা শাসিত হইবে। কাজেই কে উন্নত ও বৃহৎ বাংলা ছাড়িয়া ছোট ও শিশু উড়িষ্যা প্রদেশে যাইতে চাহিবে।

উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও হইবে না, কাজেই দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু সে শিক্ষা উড়িষ্যায় চাকুরী পাইবার বিষয়ে কাজে না লাগিতেও পারে; কারণ তাহারা উড়িয়া কৃষ্টি ও আবহাওয়ার উপযোগী শিক্ষা পায় নাই এবং বাংলা দেশেব স্কুল-কলেজে সে-প্রকার শিক্ষা হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপাব। যদি এখন কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হয়, তবে দক্ষিণ মেদিনীপুববাসীকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উড়িয়া শিখিতে হইবে।

উড়িষ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ না থাকায় দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীকে তৎতৎ বিষয় বাংলা দেশে শিখিতে হইবে এবং সে শিক্ষাও উড়িষ্যায় কোন কাজে না লাগিবার সম্ভাবনাই অধিক।

আমি যত দূব জানি, লোক্যালবোর্ড ও জেলাবোর্ড নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারেব। বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুব জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড নাই, কিন্তু উড়িষ্যায় এই প্রকার বোর্ডের ব্যবস্থা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দক্ষিণ মেদিনীপুরের সামান্য কয়েক জন উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও করণ ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায়ই উড়িয়াদিগের সহিত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ নহে। মেদিনীপুরের গরিষ্ঠসম্প্রদায় মাহিষ্যগণ প্রকাশ্যভাবে বলে যে, উড়িষ্যায় কোন কালে তাহাদের স্বজাতি নাই এবং ফলে স্মরণাতীত কাল হইতে উড়িয়াদের সহিত তাহাদের কোন সামাজিক সম্বন্ধ নাই। যদি দক্ষিণ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভূক্ত হয় তবে সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধনের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। দক্ষিণ মেদিনীপুরবাসীকে উড়িয়া ভাষা শিখিতে হইবে। কিন্তু উড়িয়া-ভাষাভাষী পাত্রীর জন্য পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? বাংলা দেশের

পাত্রগণ বাংলা কথা বলে। কাজেই তাহারা উড়িয়া ভাষাভাষী পাত্রী বিবাহ করিতে চাহিবে না, একথা আগে হইতেই জানা আছে। কাজেই কিরূপে মেয়েদের বিবাহ হইবে? এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ মেদিনীপুরের কোন-কোন সম্প্রদায় ২৪ পরগণা, হাওড়া ও নদীয়া জেলার লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার লোকেব প্রতি বালেশ্বরের কোন-কোন অংশের লোকের ব্যবহারে উড়িয়া মনোবৃত্তি লক্ষিত হয়—ইহাও বলা দরকার। কাঁথির অনেকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বালেশ্বর জেলায় জমি খরিদ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথম হইতেই ফৌজদারী মামলা ও দেওয়ানী মামলা ত লাগিয়া আছে। তা ছাড়া এখনও জমি চাষ কবিবার জন্য অথবা অন্য কোন আয়াস-সাধ্য কাজ কবিবার জন্য তাঁহারা সহজে সেখানকাব মজুর পান না। কাজেই তাহাদিগকে মেদিনীপুর অথবা ময়ূরভঞ্জ হইতে মজুর লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু একথা বলিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না যে, মেদিনীপুববাসী উড়িষ্যায় যে সমস্ত জমি ক্রয় করিয়াছেন তাহা বালেশ্বরবাসীরা কিনিতে পারেন নাই বলিয়া এই জাতিগত বিদ্বেষেব সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাষা কি?

ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে আমাদিগকে স্থির কবিতে হইবে। চট্টগ্রামবাসীদের কথিত ভাষা আদৌ বাংলা নয়, তবু তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা হয়। বাংলাদেশেব উত্তর প্রান্তের কথিত ভাষাকে ঠিক বাংলা বলা যায় না। কিন্তু সে অঞ্চলেব অধিবাসী যে বাঙ্গালী নয় একথা কেহই বলিতে পাবেন না। তাহা হইলে ভাষা কথার অর্থ কি? ভাষা বলিতে কথিত ভাষা বুঝাইবে, কি, লেখাপড়া শিখিবার ভাষা বুঝাইবে? আমার স্পষ্টই মনে হয় যে, ভাষা বলিতে কথিত ভাষা বুঝায় না। উড়িষ্যার প্রান্ত সীমায় বাস করে বলিয়া দক্ষিণ-মেদিনীপুরবাসীর ভাষা কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হইবেই। যদি সমস্ত মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যাব অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উড়িয়া ভাষাই তাহাদের আদালতের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, দশ বৎসর পরে প্রান্তসীমাবর্ত্তী বাঁকুড়া, হাওড়া ও ২৪ পরগণার লোককেও উড়িয়া ভাষায় কথা বলিতে দেখা যাইবে। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বালেশ্বর জেলা

উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা বাংলাদেশের প্রান্তদেশে অবস্থিত বলিয়া সেখানের ভাষাকে ঠিক উড়িয়া বলা যায় না। উড়িয়াদের পুস্তিকায় দেখিয়াছি যে, বালেশ্বর জেলায় বাংলা ও উড়িয়া উভয় ভাষাই আদালতের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়; কাজেই সেই কারণে বালেশ্বর জেলার মেদিনীপুবের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পক্ষে উড়িয়া বন্ধুদের সম্মতি আছে কি? যে কাবণে উড়িষ্যাবাসী মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করেন, ঠিক সেই কাবণে বালেশ্বর জেলাকে বাংলাব অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করা যায়। সব দেশেই প্রান্তসীমাব অধিবাসীদেব ভাষা মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং শাসন ব্যাপারে ভূভাগেব সীমার পবিবর্ত্তনেব সঙ্গে-সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়।

আর একটি দরকারী কথা এই যে, বাংলা দেশে 'দায়ভাগ' প্রথা প্রচলিত। এ-দিক দিয়া বিচাব কবিতে গেলে বলিতে পারি যে, দক্ষিণ মেদিনীপুরে শতকবা ৮০ জন লোক এই 'দায়ভাগ' প্রথানুসাবে কাজ চালাইয়া থাকেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আমরা পুরুষানুক্রমে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রেব "বন্দে মাতবম্" গান ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদক জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রতি গৃহেই গীত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতগুলি বিগত দুই আন্দোলনে কাঁথীবাসীর পক্ষে প্রধান শক্তি-স্বরূপ হইয়াছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভুলিয়া যাউক ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। প্রাচ্যের বাংলা সাহিত্যই বিশ্ব-দরবারে সমাদৃত হইয়াছে। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি চেয়াবের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত সুবিধা পাইয়া গৌরব অনুভব করি এবং কোন প্রকারেই এই সমস্ত সুবিধা হারাইব না।

বাংলাব কৃষ্টি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম, নব্য ন্যায়, ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ; বাংলার মহাপুরুষ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ; বাংলার কবি ও লেখক মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র; বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন; বাংলার জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ, স্যার প্রফুল্ল, ডাঃ মেঘনাদ; বাংলার উন্নতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা, বাংলার উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র—এই সমস্ত গৌরবের বস্তু। এ-সব বস্তুকে আমরা নিজেদের বলিয়া জানি এবং কোন কারণেই এই সমস্ত বস্তু হইতে

আমরা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। এই সমস্ত জিনিসের বিনিময়ে আমরা কি পাইব তাহা আমাদের উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সম্ভবতঃ, নূতন শাসনাধীনে কয়েকটি চাকুরী। এই সব অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস। সামান্য কিছু সুবিধার বিনিময়ে আমবা আমাদের জন্মগত অধিকাব বিসর্জ্জন দিতে পারি না।

সুবর্ণরেখা নদীই বাংলাব প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ কবে, আমবা এই দাবী কবি। সুবর্ণরেখাব এই পার্শ্বের (অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বে) দুইটি থানা এখনও বালেশ্বব জেলার অন্তর্ভুক্ত বহিয়াছে। অনতিবিলম্বে এই দুইটি থানা অবশ্য-অবশ্য মেদিনীপুর জেলাব অন্তর্গত হউক্—ইহাই আমবা চাই।"

যাহা হউক, বীবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসীর প্রবল আন্দোলনের ফলে, মেদিনীপুব জেলা বিচ্ছিন্ন কবা হইবে না বলিয়া ইংলণ্ডের পার্ল্যামেণ্টে স্থির কবা হয়। ইহার কিঞ্চিদধিক এক বৎসব পরে সরকাব পক্ষ হইতে উড়িষ্যাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে উন্নীত কবিবার বিষয় স্থিবীকৃত হইলে, মেদিনীপুবের দক্ষিণাংশকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করিবার জন্য বীবেন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রলোভন দেখান হইয়াছিল এবং তিনিও তখন কি প্রকার নির্ম্মমভাবে আপনার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও নীতিনিষ্ঠাব পবিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুইখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে।

উড়িষ্যা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য বি. এন মিশ্রের পত্র

19, Royal Hotel.
Delhi, 11-2-33

Dear Mr. Sasmal,

You may very likely remember our conversation last, when you were doubtful about the formation of a new province for Orissa. But that it has been settled may I request you and all Uryia friends there to reconsider your views on the matter? In view of the fact that under the reform in Bengal and the predominant Muslim majority next to Bengali-Hindus, the hopeless minority of the Oriyas would be worst for you. Being a shrewd and wise man, I think, you will change your views and take your proper place in the Orissa Province.

In view of all these if you and your friends will consider the position, I and other friends from Orissa will meet you to consider the matter quietly for mutual advantage. May I request you for the favour of an early reply ?

I hope you are quite well.

Yours sincerely,
(Sd) B. N. Misra,
M L. A., Bar-at-law.

অর্থাৎ

১৯, রয়াল হোটেল, দিল্লী।
১১।২।৩৩

প্রিয় মিঃ শাসমল,

আমাদের গত বারের আলোচনা আপনার খুব সম্ভব মনে আছে। সে সময় আপনি স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু এখন স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই হেতু আমি আপনাকে ও ওখানের উড়িয়া বন্ধুদিগকে বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিষয়টি বিবেচনা করিলে দেখা যায়, বাংলায় বাঙ্গালী হিন্দুদের পরে মুসলমানগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকায় নূতন শাসন সংস্কার আইনে উড়িয়াদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য আপনার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে। আপনাকে আমি চালাক ও জ্ঞানী লোক মনে করি। আপনি আপনার মত পরিবর্ত্তন করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশে আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবেন।

এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া আপনি ও আপনার বন্ধুগণ যদি অবস্থাটা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমি ও উড়িষ্যার অন্যান্য বন্ধু পারস্পরিক সুবিধার জন্য বিষয়টি ধীরভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আপনার সহিত দেখা করিব। আপনি শীঘ্র উত্তর লিখিবেন—এই অনুরোধ। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার
(স্বাক্ষর) বি এন. মিশ্র.
এম. এল. এ, বার-য়্যাট্-ল.

বীরেন্দ্রনাথের উত্তর

P 229, Russa Road,
Tollygunge, Calcutta.
17 2. 23.

Dear Mr Misra,

Your registered letter dated 11. 2 33. I am surprised how you could send such an objectionable thing to me. It presupposes that I am capable of being influenced by places and advantages You will allow me to point out that to this extent to which it bears that construction, you have insulted me and my district. Places and advantages may be in the minds of those Oriya leaders who are agitating for a seperate province for Orissa, but no place, proper or improper, and no advantage, noble or mean, can ever change my humble opinion and the opinion of Midnapore. We shall oppose the inclusion of my part of Midnapore in the new Orissa Province till the end of our days. I repeat what I wrote in my memorandum to the O' Donnell Committee, namely, that "lives are not worth-living and easily sacrificed, if a lower standard of living and culture is forcibly imposed upon any set of educated and patriotic human beings."

Your reference to the predominant Muslim majority in Bengal under the coming reform is particularly vicious. You and your friends have been referring to this aspect of the question for some time past. What are you going to do to the hopeless minority of the Muslims in the new Orissa Province ? Shrewd and wise men as you all are, will you allow the Oriya Muslims their proper place there ? What would you do to the Muslims of Midnapore ? For the matter of fact, what would you do to the Hindus of Midnapore who are bound to be in a hopeless minority in your midst ? Don't I know—does not the world know, how the Oriyas have begun hating the Bengalees generally, and Midnapore Bengalees specially in the recent years ? My friend Mr. B. Das has let the cat go out of the bag when he says that the Government should announce the Orissa

bounderies to make her econmically solvent. Your sweet words and sweeter offer of greater future hopes are wholly for this purpose and you will excuse Midnapore, if she is unwilling to kiss the noose which you are anxious to put round her neck.

Hoping all well with you.

Yours sincerely,
(Sd.) B. N. Sasmal

অর্থাৎ

পি ২২৯, রসা রোড,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা
১৭।২।৩৩

প্রিয় মিঃ মিশ্র,

আপনার ১১।২।৩৩ তারিখের রেজেষ্ট্রীকৃত পত্র পাইয়াছি। আপনি কিরূপে আমার নিকটে এরূপ আপত্তিকর পত্র পাঠাইতে পারেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছি। একথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমি পদ ও সুবিধার প্রলোভনে প্রভাবান্বিত হইতে পারি। আমি আপনাকে জানাইতে চাই যে, আপনার চিঠিতে যতদূর পর্য্যন্ত এইরূপ লেখা আছে ততদূর পর্য্যন্ত আপনি আমাকে ও আমার জেলাকে অপমানিত করিয়াছেন। যে-সব উড়িয়া নেতা স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের মনের মধ্যে পদ ও সুবিধার লোভ আশ্রয় পাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত-অনুপযুক্ত যে-কোন পদ এবং ভাল-মন্দ যে-কোন প্রকার সুবিধার কথা কখনও আমার ও মেদিনীপুরের অভিমত পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আমরা আমাদের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের আমাদের অঞ্চলকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তীকরণের বিরোধিতা করিব। ও' ডোনেল কমিটির নিকট আমার স্মারক লিপিতে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—"যদি এক দল শিক্ষিত ও দেশভক্ত মানবের উপর হীন জীবনযাপন প্রণালী ও শিক্ষাদীক্ষা বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাদের জীবন 'জীবন' নামের অযোগ্য হয় এবং সে জীবন অনায়াসে বিসর্জন-প্রাপ্ত হয়।"

নূতন শাসন সংস্কারে বাংলা দেশের মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে আপনার উল্লেখ বিশেষভাবে দুর্নীতিমূলক। আপনি ও আপনার বন্ধুগণ আজ

কিছুদিন ধরিয়া এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। আপনারা উড়িষ্যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য কি করিতে যাইতেছেন? আপনাবা সকলেই যখন চালাক ও জ্ঞানী, তখন আপনারা কি উডিষ্যাব মুসলমানদিগকে যথাযথ স্থান দিবেন? আপনারা মেদিনীপুরের মুসলমানদিগেব জন্য কি করিবেন? মেদিনীপুবের হিন্দু আপনাদেব মধ্যে গিয়া নিশ্চিতই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইবেন। তাঁহাদের জন্যই বা আপনাবা কি কবিবেন? আমি কি জানি না—সমস্ত পৃথিবীর লোকে কি জানে না—সম্প্রতি কি ভাবে বাঙ্গালীদিগকে, বিশেষভাবে মেদিনীপুবেব বাঙ্গালীদিগকে উডিয়াগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন? উডিষ্যার অর্থনৈতিক সংস্থানের জন্য সরকারের উড়িষ্যার সীমা বিজ্ঞাপিত করা উচিত—এই কথা বলিয়া আমার বন্ধু মিঃ বি দাস সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাদের মধুর বাণী এবং ভবিষ্যতেব বৃহত্তর আশার মধুবতর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। আপনারা মেদিনীপুরের গলায় যে ফাঁস পরাইয়া দিতে সমুৎসুক, তাহা যদি মেদিনীপুর সাদরে গ্রহণ করিতে না চায়, তবে আপনাবা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। আশা করি, আপনাবা সকলে কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষর) বি এন শাসমল

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম হাঙ্গামা

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সহরে বিপ্লবীদের দ্বারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে সেখানে ভীষণ হাঙ্গামা ঘটান হয়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার ঐ হাঙ্গামাকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করেন। সেই হাঙ্গামার কারণ, উদ্ভব, গতি, পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতার এলবার্ট হলে কলিকাতাবাসীর এক সাধারণ প্রকাশ্য সভায় এক অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হয়। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন, মুজিবর রহমন, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথও এই সমিতির সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইয়া যথাশক্তি ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং চট্টগ্রাম সহরে যে সমস্ত ধ্বংসলীলা, পাশবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি হীন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু ফটো তুলিয়া লন। চট্টগ্রামের হাঙ্গামার কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না। সভ্যগণ কলিকাতায় ফিরিয়া টাউন হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করেন। বৈকাল ৪টায় সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ১১টা হইতে সভায় লোকসমাগম সুরু হয়। বেলা ১টায় টাউন হলে তিল ধারণের আর স্থান ছিল না। ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাউন হলের ভিতরে ও বাহিরে দুইটি সভার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সভায় আচার্য্য রায় বলেন—চট্টগ্রামের হাঙ্গামার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কোন চিহ্ন নাই। এই হাঙ্গামার পশ্চাতে unseen hand and unseen brain (অদৃশ্য হস্ত ও অদৃশ্য মস্তিষ্ক) থাকিয়া এই হাঙ্গামার সংঘটন সম্ভব করিয়াছে। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত বলেন—চট্টগ্রামের হাঙ্গামা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নয়। চট্টগ্রামের ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেম্প এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী। তিনিই চট্টগ্রামের সরকারী ও বে-সরকারী ইউরোপীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সেখানকার হিন্দুদের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চালাইয়াছেন আর বলিতেছেন উহা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

স্বর্গীয় তুলসীচন্দ্র গোস্বামী কলিকাতার কয়েক দিনের 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার কতকগুলি অংশ পাঠ করিয়া দেখাইয়া দেন কিভাবে এই পত্রিকা দিনের পর দিন তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই হাঙ্গামা সংঘটিত করাইবার পথে প্ররোচনা দিয়া আসিয়াছিল। অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ যে রিপোর্ট সেই সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, পরে সরকার পক্ষ তাহা প্রকাশ করিতে দেন নাই। মনে হয় যেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বৃটিশ সরকার বাঙালী হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাইয়াছিলেন।

শাসমলের চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে মামলার উদ্ভব হয় তাহাতে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি কতিপয় বাঙালী আসামী শ্রেণীভুক্ত হন। সূর্য্য সেন পলাতক ছিলেন। এই মামলায় কলিকাতার ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য আইনজীবী আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। মামলা কিছুদিন চলার পর আসামীপক্ষ শরৎ-বাবুকে তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে না পারায় তিনি এই মামলার সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এই মামলার কোন-কোন আসামীর অদৃষ্টে প্রাণদণ্ড হইতে পারে। এই সময় আসামীপক্ষ বীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মামলা পরিচালনা করিতে অনুরোধ করেন। বীরেন্দ্রনাথ বহু সহস্র টাকার ঋণজালে জড়িত থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইয়া বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালন করিবার জন্য চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মাসাধিক কাল ছিলেন। সেই মামলায় তিনি যে সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। এই মামলায় তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যাহাই হউক্, পরিশ্রমের ফল ফলিল। অনন্ত সিংহ প্রভৃতি ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু শাসমলের সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের আর মর্য্যাদা হইল না। বীরেন্দ্রনাথের যে সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান, বাগ্মিতা ও বিচার-বুদ্ধি ছিল, তাহা আরও বহু জটিল মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন কালে প্রকাশ পাইয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি।

ডগলাস হত্যা মামলায় শাসমল

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস জেলা বোর্ডের অফিসে আততায়ীয় দ্বারা নিহত হন। এই হত্যা সম্পর্কিত মামলায় শাসমল আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মামলা পরিচালনায় তিনি যে সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-শক্তি, বাগ্মিতা ও গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা রাজপুরুষগণও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নিরপেক্ষ রাজপুরুষগণ এজন্য বরাবরই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই মামলা পরিচালনা কালে মেদিনীপুরের একজন ইংরেজ আই সি এস এস ডি ও বলেন—"শাসমলের জেরা কাঠগড়ার হত্যাকারী আসামী অপেক্ষা ভয়ের কারণ।" কাজেই শাসমল যে একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত হইতেছিলেন, তখন বাংলাদেশে তাঁহার সমাদর হয় নাই। বাংলাদেশে তাঁহাকে যখন জটিল মামলায় নিযুক্ত করা হইত, তখন তাঁহার শুধু আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতার সমাদর কবিয়া যে নিযুক্ত করা হইত তাহা নয়, তাঁহাব আইন-জ্ঞানেব সঙ্গে মহৎ প্রাণ, পরদুঃখকাতর হৃদয় মিলিত ছিল বলিয়াই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। বীবেন্দ্রনাথ এতাদৃশ অধিকাংশ মামলায় আর্থিক ক্ষতি স্বীকাব করিয়া লইতেন। তাঁহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতার মর্য্যাদা যখন বাংলা দেশের বাহিরে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন বাংলাদেশের লোকে পবশ্রী-কাতরতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। নতুবা অনন্ত সিংহ প্রভৃতির পক্ষ সমর্থনে বীরেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব, সাহস ও ত্যাগেব পবিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাংলায় সমাদৃত হইত।

বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পবিচালনার ব্যাপারে তাঁহাকে কি প্রকাব আর্থিক ক্ষতি স্বীকার কবিতে হয় তাহাব একটী উদাহরণ দিতেছি। ইহাব কযেক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে এক ট্রাইব্যুন্যালে তিন জন জজের নিকটে এক বোমার মামলাব বিচার আরম্ভ হয়। বীবেন্দ্রনাথ আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলা দীর্ঘ পাঁচ মাস চলে। বীরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ কলিকাতা হইতে হুগলী যাতায়াত করিতেন। এই মামলা হাতে থাকার সময়ে তিনি অন্য কোন মামলা গ্রহণ করেন নাই। কিভাবে আসামীদিগকে মুক্ত করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। বিচারে একজন আসামী মুক্তি পান। তিনজন

আসামীর কারাবাস দণ্ড হয়। এই মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া শাসমল পাঁচ মাসের মধ্যে অন্য মামলা ত গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু আসামীদিগের পক্ষ হইতে একটী পয়সাও পারিশ্রমিক লয়েন নাই। ইহাতে তাঁহাকে সহস্র-সহস্র মুদ্রা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে আসামী মুক্তি পান তাঁহাকে অস্ত্র আইনে আবার গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। তখনও বীরেন্দ্রনাথ বিনা পারিশ্রমিকে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করেন এবং আসামীকে মুক্ত করেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার ও মুক্তি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশপ্রাণ শাসমল ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং তাঁহার সততা ও প্রভাব সহনে অক্ষম ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাহাদের আশঙ্কা ছিল পাছে কোন দিন না কোন দিন শাসমল আবার রাজনীতিক্ষেত্রে উল্কার মত উদিত হইয়া তাহাদের দোকানদারি বিপর্য্যস্ত করিয়া দেন। সেজন্য তাহারা শাসমলকে কোন-না-কোন দিক দিয়া নাজেহাল করিবার কথা কখনও ভুলিতে পারিত না। তাহারা সর্ব্বদা সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শাসমলের প্রতি এরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করা হয় যাহাকে নীচতা, ইতরামি, জঘন্য চালবাজি প্রভৃতি যে-কোন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কোন রাজনৈতিক কারণে নহে, দেওয়ানি আদালতের ৫৫৫॥৶০ আনার ডিগ্রিজারি সম্পর্কে শাসমল ঐ বৎসর ২৮শা নভেম্বর বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় তাঁহার রসারোডস্থিত বাসভবনে গ্রেপ্তার হন। তিনি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ঐদিন ডিগ্রিদারের উকিলের কেরাণী ও আদালতের পিওনের সহিত বিছানাপত্র ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া সানন্দে আলিপুর আদালতে গমন করেন। বাড়ী হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বাড়ীর লোকজনকে তাঁহার নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অর্থ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া যান।

শাসমল বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রসমূহে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি ও ২৯শা নভেম্বর তারিখের ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় সম্পাদিত 'নায়ক' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের "বাংলার রাজনীতি" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানা যাইবে।

শাসমলের বিবৃতি

"বীরভূমের শ্রীঅবনীশচন্দ্র রায় আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার সঙ্গে আমার এইরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল যে, তিনি তাঁহার পারিবারিক গোপনীয় বিষয়ও আমাকে জানাইতেন। কংগ্রেসের প্রয়োজনে আমি তাঁহার নিকট

হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করি। ঋণ গ্রহণ করিবার সময় তিনি এবং আমি উভয়েই কংগ্রেসের সভ্য ছিলাম। কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরে বাংলায় কংগ্রেস রাজনীতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এই অর্থ আদায় করাব জন্য তিনি বীরভূমে এক তরফা ডিগ্রি পান এবং সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদনন্তর ঐ ডিগ্রি জাবি কবিবার জন্য হাইকোর্টেব এটর্নি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের নিকট প্রেরিত হয়। আগে তাঁহার নিকট গমন কবিয়া ৪০০ টাকায় ডিগ্রি নিষ্পত্তি করি এবং ঐ ৪০০ টাকার মধ্যে তখনই ১০০ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রসিদ গ্রহণ করি। তৎপরে ডিগ্রিদারকে আবও ২০০ টাকা দেওয়া হয়। ইহাব পব পূর্ব্বপ্রদত্ত ২ কিস্তির টাকা অস্বীকার করিয়া ডিগ্রির সম্পূর্ণ ৫৫০ টাকা আদায় কবিবার জন্য পুনরায় ডিগ্রি জাবি করিবার চেষ্টা করা হয়। অতঃপর আমি পূর্ব্ব প্রদত্ত ২ কিস্তির টাকা প্রমাণ (আমানত) করিবাব জন্য শ্রীযুক্ত নিৰ্ম্মলবাবু ও তাঁহাব মক্কেল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে জানাই। সত্যেন্দ্রবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই এবং নির্ম্মলবাবু তাঁহার ফি এই খরচায় দাবী কবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবিতকালেই নির্ম্মলবাবু আমার জাত তুলিয়া গালাগালি করেন। পরে আমি জানিতে পারি যে, তিনি আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আমি তাঁহার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সরাসরি ডিগ্রিদারকে দিবার জন্য আমাব প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত ১০০ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নির্ম্মলবাবুব নিকট এটর্নির পত্র প্রেরণ করি।

"উক্ত ১০০ টাকা প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, তিনি এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর দিলেন যে, আমার মনে হইল তিনি ঐ টাকাটা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিতেছেন। পাওনাদার বলিয়া আমি সত্যেন্দ্রনাথের অস্বীকৃতিকে গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, যে নির্ম্মলবাবু ৪০০ টাকায় ডিগ্রি নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং যিনি তখনও ডিগ্রিদারের এটর্নির কাজ করিতেছিলেন, সেই নির্ম্মলবাবু ঐ মীমাংসা গ্রাহ্য করিয়া চলিবার জন্য তাঁহার মক্কেলকে প্ররোচিত করেন নাই। পরন্তু তিনি ফি না লইয়া আদালতে আসিতে অস্বীকার করেন। এমন কি নির্ম্মলবাবু তখন ঐ ১০০ টাকা প্রাপ্তির বিষয় অস্বীকার করেন। তখন আমি সংকল্প করি যে, সমস্ত ব্যাপার জনসাধারণের নিকট প্রকাশ না করিয়া আমি এক

কপর্দ্দকও প্রদান করিব না। এই নিমিত্তই আমি এই সামান্য অর্থ প্রদান না করিয়া জেলে যাইতেছি। বঙ্গদেশের দুটি জেলায় সমমূল্যের আমার সম্পত্তি ক্রোক না দিয়া তাঁহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিবার ভীতি প্রদর্শন করাতেই আমি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। যে ডিগ্রির বলে আমাকে এক্ষণে জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছে, আমি ঐ ডিগ্রি জারির আদেশের বিরুদ্ধে (২৪ পরগণা) জিলা জজের কোর্টে আপীল করিয়াছি। এই আপীলের শুনানির পূর্ব্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। মাত্র ৫৫৫৷৶০ আনার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

শাসমলের মুক্তিলাভ

ঐদিন বেলা ২ ঘটিকার সময় আলিপুর মুন্সেফ কোর্ট হইতে শাসমল মুক্তিলাভ করেন। ঐ সময় শাসমলের উকিল ৩০০ টাকা জমা দিতে রাজী হন এবং বলেন যে, তাঁহার মক্কেল শ্রীযুক্ত শাসমল পূজার পূর্ব্বেই ঐ পরিমিত অর্থদানে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ উহা লইতে সম্মত হন নাই, প্রকাশ্য আদালতে আলোচনার সময় ডিগ্রিদারের উকিল বলেন যে, তাঁহার মক্কেল কলিকাতায় না থাকায় তিনি তাহার এটর্নি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন।

বাংলার রাজনীতি

(২৯শা নভেম্বর, ১৯৩২-এর নায়ক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ)

"বাংলাদেশের ইঙ্গিতে একদিন সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইত। বাংলাই সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই বাংলার রাজনৈতিক আসনে—দেবতার আসনে বসিয়া যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যবসায় চালাইবার সনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের হীন মনোবৃত্তিই আজ বাংলার মাথায় অপমানের ডালি তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। জীবন-মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে জাতির ভাগ্য লইয়া নাড়াচাড়া করিবার স্পর্দ্ধাসম্পন্ন ধনীব দল কার্য্যকালে কিভাবে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে, তাহার পরিচয় বাঙ্গালী ভালভাবেই বহু বার পাইয়াছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের ঘরে আগুন দিতে, পর-সম্মান নষ্ট করিয়া হীন ষড়যন্ত্র করিতে

ইহারা কোনদিনই পশ্চাৎপদ নহে। অর্থ সাহায্যে দরিদ্র কর্ম্মীর কর্ম্মের সাধনার সুযোগ গ্রহণে ইহারা নিজেদেব জাহির করিবার সুযোগ কখনও হেলায় হারায় নাই। কিন্তু নীচতার কত নিম্নস্তরে ইহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভাবিতেও লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

"বাংলার রাজনীতি লইয়া ধনীর এই দোকানদারী কতকগুলি নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর প্রাণ পীড়িত করিয়াছিল বলিয়াই ১৯২৬ সালে সাধারণের প্রাণের দেবতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কেন্দ্র কবিয়া ধনী-দবিদ্রের এক বিরাট সংঘর্ষে বাংলার রাজনৈতিক জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অজস্র মিথ্যার প্রচারে সেবারে শাসমলী দলের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ধনীর দল টিকিয়া থাকিলেও তাহাদের কায়েমী দৃঢ় আসন সেইদিন হইতে ধীরে-ধীরে টলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তারপর কত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া কত বন্ধুর সহিত শত্রুতা করিয়া বাংলার বাজনৈতিক জননায়কগণ পরস্পরের নিকট-বর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গনের বাহু প্রসারণ করিয়াছে। বাংলার রাজনৈতিক আকাশের ঘনান্ধকারের অবসানে উষার অরুণ আভায় পূর্ব্বদিকপ্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কর্ম্মের উদ্বেল তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়া কর্ম্মস্রোতে প্রবহমান কর্ম্মীদলেব পরস্পরের হস্ত ধবিয়া উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে আর কোথাও কোন ইতস্ততঃ নাই। সর্ব্বত্রই একটা শান্তি ও মিলনের আবহাওয়ার মধ্যে আবার ধনীর দল তাহাদের চিরাচরিত নীচতার পবিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত নহে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

"শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কর্ম্মশক্তিকে শত শত চেষ্টায়ও খর্ব্ব করা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া, তাঁহাব কর্ম্মপ্রেরণা আজিও সহস্র কর্ম্মীর প্রাণে উন্মাদনার সৃষ্টি করে বুঝিয়া আজিকাব দিনেও কাহারও গাত্রদাহ হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু হঠাৎ গতকল্যকার আলিপুরের তৃতীয় মুন্সেফী আদালতে শাসমলকে দস্তকে ধৃত কবিয়া লইয়া যাওয়ার সংবাদে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। বিশাল জমিদারী, বাড়ী, গাড়ীর মালিক শ্রীযুক্ত শাসমলকে সামান্য ৩০০ টাকার জন্য দস্তকে ধৃত করার সংবাদে আমাদের মনে প্রথমেই যে সন্দেহের ছায়াপাত করিয়াছিল, শাসমল মহাশয়ের গ্রেপ্তারকালের বর্ণনায় তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দিয়াছ। এই সামান্য টাকার জন্য দস্তকে

ধৃত করিবার মধ্যে যে হীন রাজনৈতিক চালিয়াতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বিদ্যমান, তাহা ভাবিতে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের মাথা নত হইয়া পড়িতেছে।

"ঘটনার বিবরণ পাঠে জানা যায়, বীরভূমের স্বরাজী মালসী মৃত অবনীশচন্দ্র রায়ের নিকট কংগ্রেসের কার্য্যোপলক্ষে ৫০০৲ টাকা (শাসমল) নিজের দায়িত্বে ধার নিয়াছিলেন। সেদিনের স্বরাজ্যদলের যাহারা এখনও বিদ্যমান আছেন— তাঁহাদের অনেকেই অনেক সময় নিজের দায়িত্বে অনেক টাকা দেনা করিয়া যে কাজ চালাইতে বাধ্য হইতেন তাহা কাহারও অজানা নাই। পার্টির কাজে শাসমলের নেওয়া অবনীশ রায়ের এই টাকার সংবাদও অনেকেরই জানা ছিল। তারপর ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষের ফলে শাসমলী দল হইতে অবনীশ রায় মহাশয় বাহিরে চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরে ঐ টাকার জন্য বীরভূম কোর্টে একটি এক-তরফা ডিগ্রি করিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার জীবিত কালে ঐ ডিক্রি জারি করিবার কোন প্রচেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রের এটর্নি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র শাসমলের নিকট ডিগ্রির টাকা দাবী করিতে শাসমল পূর্ব্বের দেওয়া টাকা বাদে মোট ৪০০৲ টাকায় ডিক্রি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিয়া নগদ ১০০৲ টাকা শ্রীযুক্ত চন্দ্রের নিকট দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ। বাকী তিনশত টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কোন্ কারণে জানা যায় না, শাসমলের নামে দত্ত টাকা ওয়াশিল না দিয়াই সম্পূর্ণ ডিক্রি জারি দেওয়া হয়। শাসমল এই জারির বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিয়াছেন। সেই আপীলের বিচার না হইতেই তাঁহার লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও গতকল্য তাঁহাকে দস্তকে ধৃত করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হয়। মুন্সেফ নিজে এই ঘোরতর অন্যায়ের জন্য লজ্জিত হইয়া বাদীর উকিলকে এই ভাবের অনাবশ্যক জেদের জন্য অনুযোগ করিলে উকিলবাবু স্পর্দ্ধা সহকারে জানান যে, আমার মক্কেল এখন কলিকাতার বাহিরে, কাজেই তাঁহার এটর্নি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের আদেশে তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। সমস্ত আদালত গৃহ এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বাদীর উকিল শাসমলের নির্দ্ধারিত ৩০০৲ টাকা নিতে স্বীকৃত হওয়াতে মুন্সেফ শাসমলের জেলে পাঠাইবার জন্য জেদ সত্ত্বেও তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে ৩০০৲ টাকা শ্রীযুক্ত শাসমল বহু পূর্ব্বে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হওয়ার অভিপ্রায়

থাকিলে, তাঁহাকে অপমানিত করিবার আয়োজন ভিন্ন এই নীচতার অন্য কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। কোন্ অতীতের রাজনৈতিক দলাদলি যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রকে আজিও এইরূপ হীনকার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে তাহা ভাবিতেও ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক জীবনে সহস্র কারচুপির মধ্য দিয়াও আত্মরক্ষায় যাহারা লজ্জিত নহে, তাহাদিগকে লজ্জা দিবার মত ভাষা আমাদের জানা নাই। রাজনৈতিক সম্পর্ক বাদেও শ্রীযুক্ত শাসমলের পিতা-পিতামহের সহিত শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহাশয়ের পিতামহের সম্পর্ক স্মরণ করিয়াও তাঁহার এই জাতীয় জঘন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল। এইভাবে নীচতার সাহায্যে কর্ম্মীর কর্ম্মসাধনাকে ব্যর্থ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। ভগবান স্বয়ং এরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর কর্ম্মপথের পূর্ব্বভাগেই আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে পথ-প্রদর্শক। নীচতার কর্দ্দম লিপ্ত করিয়া সূর্য্যের প্রোজ্জ্বল রশ্মিকে আবরিত করা চলে না। ঘরে বসিয়া মানচিত্রে দেশ দেখিয়া দেশসেবকের সম্মান করা সম্ভব নহে জানি, কিন্তু মানুষ এত নীচে নামিয়া যাইতে পারে আমরা পূর্ব্বে ভাবিতেও পারিতাম না। শাসমলের বর্ণনা পড়িয়া আমাদের বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুঃখ হয়।”

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা করপোরেশনে শাসমল

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কলিকাতা করপোরেশনের কাউনসিলার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শাসমলের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিবার ইচ্ছা ছিল না। দক্ষিণ কলিকাতাবাসী কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ জানান। প্রথমে তিনি তাঁহার অর্থের অনটন ও তাঁহার প্রতি একদল কংগ্রেসীর বিরূপ মনোভাবের কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের বার-বার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও নানাপ্রকারে তাঁহার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি অর্থের অনটন সত্ত্বেও ২৭নং ওয়ার্ড হইতে করপোবেশনের সদস্য পদপ্রার্থী হন। ঐ সময়ে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেণ্টস্ হলে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সভায় বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—'যদি আমি এইবার করপোরেশনেব কাউনসিলার নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিতে পারি, তবে বুঝিব বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা বুঝিব বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার কাজ করার সময় এখনও আসে নাই। পরাজিত হইলে দুঃখিত হইব না।'

সে সময়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন বোর্ডেব সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ঐ নির্ব্বাচন বোর্ড শাসমলকে মনোনয়ন দেয় নাই। বোর্ড মনোনয়ন দিয়াছিল রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিধানচন্দ্র বায় পবিচালিত বোর্ডেব পক্ষে একজন বায় বাহাদুরকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু শাসমলের ন্যায় একনিষ্ঠ দেশসেবককে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। শাসমলকে মনোনয়ন দিয়াছিল এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কবিয়াছিল ২৭নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি। কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে পূর্ব্বে দেশবন্ধুর ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টাব নিশীথ সেন বামতারণ-বাবুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। বামতারণ-বাবু একাদিক্রমে ৪২ বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও কবপোরেশনের সদস্য ছিলেন। তাঁহার অর্থবল ছিল প্রচুর। তিনি আলিপুর কোর্টের প্রবীণ উকিল। এইরূপ বিত্তবান ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে

প্রায় এক হাজার (৯৯০) ভোটে পরাজিত করিয়া শাসমল কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন।

শাসমল হত্যার প্রচেষ্টা

ভোট গণনার দিন ফলাফল ঘোষণার শেষে যখন শাসমল তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কলিকাতা করপোরেশন ভবনের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত শাসমলকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। দৈবক্রমে ঐ ছুরিকা শাসমলের গায়ে না লাগিয়া অপর এক ব্যক্তির গায়ে লাগে এবং তিনি আহত হন। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, দুর্বৃত্তগণ কোন প্রকার ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া শাসমলকে হত্যা করিবাব জন্য আক্রমণ করিতে আসে নাই। তাহারা নিশ্চিতই কাহারও প্ররোচনায় উত্তেজিত হইযা এই দুষ্কার্য্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছিল। বাংলাব রাজনীতি-ক্ষেত্র কোন্ সময় হইতে কিরূপ জঘন্য ভাবে পঙ্কিল হইয়াছে তাহা শাসমলেব জীবনেব এই সমস্ত ঘটনা হইতে উপলব্ধ হইবে এবং কাহারা বাংলার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী একটু চিন্তা করিলে তাহাও বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না।

যাহা হউক, বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে বীরেন্দ্রনাথের যোগদানের আবশ্যকতা ছিল, তাহা তাঁহায বিজয় লাভে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল। করপোরেশনের কাউন্সিলার রূপে বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাংলাব বাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। বাংলার যাঁহারা একনিষ্ঠ দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নায়ক হইলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় আবাব বন্যা হয়। সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে 'মেদিনীপুর বন্যা সমিতি' নামে এক সমিতি গঠিত হয়। বিখ্যাত ডাক্তাব প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সমিতির সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। এবাবেও বীরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের দুঃখকষ্ট মোচন করিবার জন্য বহু ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের কাউন্সিলাররূপে কার্য্যকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের দুইটি ব্যাপারের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম, কর্পোরেশন দমন বিল আলোচনা। বাংলার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্পোরেশনের ক্ষমতা

হ্রাস করিবার জন্য এক বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। বিলের প্রধান কথা এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এই বিল লইয়া কর্পোরেশনে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকার-মনোনীত ও ইউরোপীয় কাউন্সিলারগণ বিলেব পক্ষে এবং বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ৪০ জনের অধিক কাউন্সিলাব বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার। প্রত্যেক বৎসর সবকার-মনোনীত ১০ জন সদস্য কর্পোরেশনে থাকিবার নিয়ম ছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সবকাব মনোনয়ন দ্বারা ১০ জন সদস্যকে ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের জন্য কর্পোরেশনে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। যখন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নূতন মেয়র নির্ব্বাচনেব সময় উপস্থিত হয়, তখন সরকার-মনোনীত সদস্যদের সদস্য থাকিবার নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তখনও সরকার পক্ষ হইতে নূতন সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া কর্পোরেশনে আসেন নাই।

এই বৎসর মেয়র নির্ব্বাচনী সভার সভাপতি মনোনীত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ যে নির্ভীকতা ও সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। তিনি প্রথমতঃ এক রুলিংএর দ্বারা পূর্ব্ব বৎসরের ১০ জন সরকার-মনোনীত কাউন্সিলারের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট দানের অধিকার নাকচ করেন। ইহাতে ৺কুমুদশঙ্কর রায়, ৺নলিনীরঞ্জন সরকাব প্রভৃতি কয়েকজন তথাকথিত কংগ্রেসী কাউন্সিলার ইউরোপীয় কাউন্সিলারগণের সহিত সহযোগিতা করিয়া সভা ত্যাগ করিয়া যান। তখন মিঃ এ. কে. ফজলুল হক মেয়র নির্ব্বাচিন হন। কুমুদশঙ্কর রায় ইত্যাদি কাউন্সিলারগণ এই মেয়র নির্ব্বাচন নাকচ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। এই সময় গভর্ণমেণ্টকে বেশ কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট মিঃ ফজলুল হকের মেয়র নির্ব্বাচন বাতিল করেন। এই ঘটনার পর বীরেন্দ্রনাথ আর এক দিনের জন্যও কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত হন নাই এবং শীঘ্রই কর্পোরেশন ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা করপোরেশনের কাউনসিলার পদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কাজ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা হইল

কলিকাতা করপোরেশনে কর বন্ধ আন্দোলন চালান। এ সম্বন্ধে তিনি প্রাথমিক কিছু কাজও করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে একদিন তাঁহার নির্ব্বাচন কেন্দ্রের (তৎকালীন ২৭নং ওয়ার্ডের) কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতা বিদ্যাসাগব কলেজেব ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে দেশবন্ধু গার্লস্ কলেজেব অধ্যক্ষ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ। অধ্যাপক গুহেব নিকট হইতে শুনিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ ঐ বৈঠকে ২৭নং ওয়ার্ডের ও সামগ্রিকভাবে কলিকাতা সহরেব উন্নয়ন এবং কবপোরেশনের পরিচালনা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন—আপনাবা আমাকে করপোরেশনে আপনাদের ওয়ার্ডেব প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইযাছেন কেন? আপনারা আমাব দ্বারা এই ওয়ার্ডের উন্নতি কল্পে কি কি কাজ করাইতে চান? তাহাতে কেহ-কেহ কোন-কোন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, কোন-কোন পুবাতন বাস্তা মেবামত, কোন-কোন রাস্তায় আলোক স্থাপন ইত্যাদি কাজেব কথা উত্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ বলেন—"জনগণের সুবিধার্থে আপনাবা যে-সব কাজ সম্পাদনেব কথা বলিযাছেন সেগুলি যে সম্পাদন কবা প্রয়োজন সেকথা আমি স্বীকাব করি এবং সকলেই স্বীকার কবিবেন এবং এই সব কাজ সম্পাদন কবিয়া দিতে পাবিলে জনগণ সন্তুষ্ট থাকিবেন। কিন্তু কোন কাজেব কথা বলিতে গেলেই দেখি করপোবেশনে অর্থাভাবেব কথা উঠে। সেজন্য সহজভাবে কোন কল্যাণকর কাজ কবা এই কবপোরেশনে সম্ভব নয়। এজন্য আমি অন্য প্রকাব কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা কবিতেছি। আমি হিসাব কবিয়া দেখিয়াছি—কবপোবেশন পরিচালনায় যে বিপুল পবিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহা হওয়া সমীচীন নয় অথচ আমাব পক্ষে এখনই এই অর্থব্যয় বোধ কবাও সম্ভব নয়। আব আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, কবপোরেশনেব করদাতাগণ যে পরিমাণ কর দেন তাহার অনুপাতে তাঁহারা সুখ-সুবিধা ভোগ কবিতে পান না। এই অবস্থায় করের অনুপাতে সুখসুবিধা পাওয়াব অথবা সুখ-সুবিধার অনুপাতে করেব পরিমাণ ধার্য্যেব দাবী করা, অন্যথায় কব দেওয়া বন্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তব নাই। আমি কলিকাতা করপোরেশনে কর বন্ধ আন্দোলন চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আপনাদের অভিমত প্রকাশ করুন।" ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়া যান। একজন বলেন—কে

আগে করদান বন্ধ করিবেন তাহাই ত সমস্যা। বীরেন্দ্রনাথ বলেন—কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, আপনাদিগকে কর বন্ধ করিতে বলিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিব না। আমিই প্রথমে কর দেওয়া বন্ধ করিতেছি বলিয়া ঘোষণা করিব। এখন আপনারা আমার সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা ভাবিয়া দেখুন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলে বীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে উৎসাহিত ও সম্মত হইয়া যান।

এই বৈঠকেব ঠিক পরেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিরোধের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় এবং দেশপ্রাণ শাসমল সেই আন্দোলনে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ায় তাহার এই কর বন্ধ আন্দোলন চালাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বীরেন্দ্রনাথ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কৃত হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহ, উৎসাহ, নির্ভীকতা ও আইনজ্ঞানের বলে কলিকাতা কর্পোরেশনে ১০ বৎসরের মধ্যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রথম একজন মুসলমান মেয়র নির্ব্বাচিত হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের পক্ষে ইহা যে মঙ্গলকর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা মিলনের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা মিলন ঘটাইতে দিবেন কেন? বীরেন্দ্রনাথ মুসলমানদিগকে সুবিধা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে যে প্রকার প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, সেরূপ প্রীতির সহিত আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন হিন্দু দেখেন নাই। একথা মুসলমান নেতা ও মুসলমান জনসাধারণও স্বীকার করিতেন। বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিত হইবেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক যোগে কার্য্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। তিনি বলিতেন—"মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সমধর্ম্মী নয় একথা জানি, কিন্তু তাহারা যে ভারতবাসী অর্থাৎ আমার দেশের লোক একথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের মুসলমানদিগকে আর আরবীয় বা পারসীক বলা চলে না। কাজেই তাহাদিগকে সুবিধা দান করিলে যদি নিজেদের ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধা ঘটে, এবং সেই সঙ্গে তাহা সমষ্টিগত জাতি ও সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত না হইয়া অনুকূল হয়, তবে তেমন কাজ করা ভাল।" তবুও বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ জেমস্ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থসংঘাত মীমাংসা করিবার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ তাঁহার পক্ষে সহনাতীত ছিল। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সম্পাদিত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মধ্যে বিভেদ-বিরোধের বীজগুলি নিহিত রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে বীজগুলি অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া কালে মহামহীরুহে পরিণত হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ত হইবেই না, অধিকন্তু, মিলনের সম্ভাবনাও থাকিবে না।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস জাতীয় দল

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য এখানে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ভারতে বৃটিশ রাজত্ব স্থাপনের সুরু হইতে উহার দৃঢ়তা সম্পাদন এমন কি উহার উৎসাদন পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়েই হিন্দুগণ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এদেশে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও তৎপরে যাহারা উহার সমালোচনা করিয়াছিল এবং নিজেদের হাতে কিছুটা শাসন ক্ষমতা চাহিয়াছিল তাহারা হিন্দু। ভালমন্দেব প্রশ্ন উত্থাপন না কবিয়া একথা সহজে বলা যাইতে পারে যে, এদেশে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হইলে তাহার পবিচালনায় সহাযতা কবা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কাবণ মুসলমানগণ বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব কবিতে থাকিলেও এবং মুসলমানগণ ইংবেজদেব মত চাকরী শেষে বা ব্যবসায় শেষে ভাবত ছাড়িযা চলিয়া না গেলেও, তাহারা যে হিন্দুদের প্রীতিভাজন হইতে পাবিয়াছিল একথা মনে করিবাব কারণ নাই এবং হিন্দুগণও যে মুসলান বাদশাহ্দিগকে প্রণয়েব চক্ষে দেখিয়াছিল তাহাবও প্রমাণ নাই। ববং মুসলমানদেব ব্যবহাবে তাহাবা সর্ব্বদা সন্ত্রস্তই থাকিত। এই অবস্থায় এদেশে ইংবেজ আসিয়া পডায় এবং মুসলমানগণ ইংবেজদেব দ্বাবা পর্যুদস্ত হওয়ায তাহাবা মনে-মনে খুসীই হইযাছিল এবং শত্রুব শত্রু হিসাবে ইংবেজদেব সহিত হাত মিলাইয়াছিল। হিন্দুগণ জানিত মুসলমানগণ এদেশের অধিবাসী হইয়া গিযাছে, তাহাবা এদেশ হইতে আব আবব-পাবস্যে ফিবিয়া যাইবে না। তাহা সত্ত্বেও তাহাবা মুসলমানদের সহিত মিলিযা-মিশিযা ইংবেজদিগকে এদেশ হইতে তাডাইবাব ব্যবস্থা না কবিয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কবিয়াছিল। হিন্দুবা ধর্ম্মপ্রাণ, আর মুসলমানগণ ধর্ম্মান্ধ। মুসলমানগণ ভাবত-আক্রমণের প্রথম হইতে যেমন ধনবত্নাদি লুণ্ঠনেব দিকে মন দিয়াছিল, তেমনি তাহাবা হিন্দুধর্ম্মেব বিনাশেব দিকেও বিশেয লক্ষ্য রাখিযাছিল। কিন্তু ইংরেজ এদেশ অধিকার করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারে অমনোযোগী না থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই, হিন্দুর মন্দিব ও মুসলমানের মসজিদ নষ্ট করে নাই। তাহারা দেশ শাসনের সুবিধার্থে বিজিত মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়াছিল, তাহাদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য

চালাইয়াছিল, এমন কি তাহাদের সহিত আমোদ-আহ্লাদও করিয়াছিল। আর মুসলমানগণ নিজেরা বিজিত বলিয়া লজ্জায় বা আক্রোশে ইংরেজ-সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিয়াছিল। তাহারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিতে আগ্রহী হয় নাই। ইংরেজদের সহিত যেটুকু সম্পর্ক না রাখিলে চলিত না, কেবলমাত্র সেইটুকু সম্পর্ক রাখিয়া তাহারা চলিত। হিন্দুগণ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া রাজদরবারে উচ্চাসন লাভ করিতেছিল, তখন মুসলমানগণ তাহাদের ভুল উপলব্ধি করিতে পারে এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। আর ইংরেজ শাসকগণও হিন্দুদের মতিগতি তাহাদের স্বার্থ পরিপূরণের পক্ষে আর বেশীদিন অনুকূল থাকিবে না উপলব্ধি করিতে পারিয়া এবং মুসলমানদের বিজিত মনোভাব অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া মুসলমানদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য ও তাহাদিগকে সরকারী চাকুরিতে সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য গুপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করে নাই।

ভারতে হিন্দুগণ যে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহা ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্যে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি সহরে এক-একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। উহার কয়েক বৎসর পরে হিন্দুগণ দ্রুত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া পড়িলে, ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ধুরন্ধরগণ ভারত শাসনের কল-কৌশল লইয়া বিশেষভাবে মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের চিন্তা ও দীর্ঘকালের সমবেত গবেষণার ফলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টে স্থিরীকৃত হয় যে, ভারতকে বৃটিশ শাসনে রাখিতে হইলে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিতে দেওয়া হইবে না, ইহাদের দুই শ্রেণীর মধ্যে তীব্র বিভেদ-বিরোধ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

তাহার পর হইতে এদেশে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগোপনে কাজ চলিতে থাকে, তন্মধ্যে সরকারী দপ্তরে মুসলমানদের জন্য অধিক চাকুরি

সংরক্ষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা দান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুগণ এবং বাংলার হিন্দুগণ বৃটিশ শাসকদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে দেখা যায়, ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দু এবং কোন-কোন স্থানের মুসলমানও ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে। বাংলা ও পাঞ্জাবে সে সময় মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল না। সেজন্য ইংরেজগণ সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের ব্যবস্থাপক সভা বা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায় হিন্দু ও মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার কথা উঠে নাই। হঠাৎ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি পদস্থ বৃটিশ সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহে মুসলমানগণ প্রথম স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী উত্থাপন করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার অনুসারে মুসলমানদের ইংরেজ-মস্তিষ্ক-প্রসূত দাবী পাকা করা হয়। সে সময় লর্ড মর্লে ছিলেন ভারত-সচিব (Secretary of State for India) এবং লর্ড মিণ্টো ছিলেন ভারতের বড়লাট। হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা চলিতে থাকে। কিন্তু উহা ভারতের সকল স্থানে চালু করা হয় নাই।

১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ইংল্যাণ্ডে যে দুইটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন, সেগুলিতে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের বড়কর্ত্তাগণ মাথা ঘামাইতে চান নাই। কিন্তু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বৈঠকে অবস্থা চরমে উঠে। উহাতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ত বজায় রাখা হয়ই, অধিকন্তু উহা ভারতের যে-সব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না, সেই সব অঞ্চলেও প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ও মহম্মদ আলি জিন্না যোগদান করেন। সেখানে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজী এমন কিছু কাণ্ড করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া এ সম্বন্ধে 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' প্রস্তাব কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে পাশ করাইতে হইয়াছিল। আমার মনে হয়, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নাকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটাইয়া ফেলিতে বলিলে এবং তাঁহারা সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হইলে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে

চাহিলে, গান্ধীজী তাহাতে সম্মত হইয়া যান। গান্ধীজী ভারতের উপর তাঁহার প্রভাববলে এবং তাঁহার মস্তিষ্কে যে রাজনৈতিক কূট কৌশল খেলা করিত তাহার দ্বারা কিস্তিমাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যে-কোন প্রকারে মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের তথা নিজের আওতায় আনিবার উদ্দেশ্যে মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন। বৃটিশ-চালিত মিঃ জিন্না গান্ধীজীর কোন সর্ত্তে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটাইয়া লইতে রাজী না হওয়ায় গান্ধীজী হাল ছাড়িয়া দেন। কাজেই মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত তাঁহার উপর নিজ স্বীকৃতি অনুসারে চাপিয়া বসে। তিনি এই সিদ্ধান্ত বুক ফুলাইয়া মানিয়া লইতে পারেন না। কাজেই তাঁহাকে ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নীরব থাকিতে হয়। যে বাংলা ও পাঞ্জাব গান্ধীজীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই, তাহাদের প্রতি বিরূপতা তাঁহার অসংজ্ঞাত মনে জাগ্রত থাকিয়া বাংলা ও পাঞ্জাবের সর্ব্বনাশ সাধনে সহায়তা করিয়াছিল কিনা কে জানে। ইহার পর দ্বাদশ বৎসরে গান্ধীজী ও তচ্চালিত কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত লইয়া এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের দুর্ভাগ্য লইয়া যে গেণ্ডুয়া খেলা খেলিয়াছেন তাহাতে আমার মনে হয় যে, গান্ধীজী রাজনৈতিক খেলোয়াড় হিসাবে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

বাঙ্গালী উৎসাদনে গান্ধীজী বৃটিশের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন একথা মনে করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবার কারণ তখনও দেখিতে পাই নাই, এখনও দেখিতে পাইতেছি না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলে ভারতেব জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ, হিন্দুগণ ও বাংলাব মুসলীম লীগ যুগ্ম নির্ব্বাচন ব্যবস্থার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী ভাবতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার নেতৃত্ব ও পরামর্শে চালিত হইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হন। শুধু একটা জাতির জীবন-মরণ সমস্যা নয়, যে-কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া নীরব থাকার অর্থ উহা স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

গান্ধীজী ও তাঁহাব অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গকে ক্ষমতা-লোলুপতা বা বিদ্বেষ বা উভয়ই এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার মূলে এই সময় তাঁহারা সজোরে

কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সব চেয়ে বড় ছিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রতিপত্তি রক্ষা। তখনই তাঁহারা মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে গান্ধীজী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্‌ডের সালিশ বিচার মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং সেই সালিশ বিচারের বিরোধিতা করিতে ভরসা পান নাই—একথা মনে করিবার কারণ এই যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড তাঁহার যে অভিমত প্রকাশ করেন, তিনি নিজে উহাকে কমিউন্যাল ডিসিসন (সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত) বলিলেও উহা সাম্প্রদায়িক রায় (য়্যাওয়ার্ড) নামে ঘোষিত হয়। যখন দুই বিবদমান পক্ষ নিজেরা কোন বিবাদভুক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে তাহাদের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া তাহার রায় মানিয়া লইতে সম্মত হয়, তখন তৃতীয় পক্ষের ঘোষিত রায়কে বলা হয় য়্যাওয়ার্ড। এই য়্যাওয়ার্ড বিবদমান দুই পক্ষ মানিয়া লইতে নৈতিক দিক্ দিয়া বাধ্য। আমাব মনে হয়, গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়েব উপব যে প্রভাব বিস্তাব কবিতেন, তাহাতে তাঁহাদের এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য লণ্ডন হইতে যে ব্যবস্থা করিয়া লইয়া যাইবেন তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়া লইবে। তাঁহাবা মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডকে এই আশ্বাসও দিয়াছিলেন। সেইজন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে তাঁহার অভিমতকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বলিয়া নাম দিলেও উহা সাম্প্রদায়িক রায় বলিয়া ঘোষিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ উহা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত (কমিউন্যাল ডিসিসন) নামে ঘোষিত হইতে পারিত।

অবশ্য একথা ঠিক যে, মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক রায় (য়্যাওয়ার্ড) নামে আইনতঃ অভিহিত হইতে পারে না। কাবণ সবকার-মনোনীত যে-সকল ব্যক্তি তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সালিশ বিচার মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই। কাজেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পালন তাঁহাদেব পক্ষে সালিশ বিচারকের রায়ের মত বাধ্যতামূলক নয়।

তাহা ছাড়া যদিই বা তাঁহারা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদের সালিশ বিচারক স্থির করিয়া থাকেন এবং তিনিও যদি বা এইরূপ রায় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা পালন করা ভারতবাসীর পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, কারণ সরকার-মনোনীত যে-সকল ব্যক্তি তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত হন নাই। বৃটিশ সরকার ভারত হইতে আপনাব পছন্দমত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভাবত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' প্রস্তাব গ্রহণ করেন, কংগ্রেসেব অন্যতম ভারত-বিখ্যাত নেতা বিদর্ভেব শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে তাহাতে এইটুকু কথা যোগ করিতে বলেন যে, কংগ্রেস-মনোনয়নে নির্ব্বাচিত আইন-সভাব সভ্যগণ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহাদের নিজ-নিজ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের নির্দ্দেশানুসারে ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ইহাতে শ্রীআনে বলেন—তবে কংগ্রেস-মনোনয়নে নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে তাহাদের বিবেকের নির্দ্দেশানুসাবে ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবও গৃহীত হয নাই।

স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথেই বিবেকেব স্বাধীনতা ও ভোটাবদের স্বার্থকে এমনিভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছিল।

যেখানে কোটি-কোটি লোকের জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে বিবেকেব স্বাধীনতা- ও ভোটারদের অভিমতানুসারে গণ-প্রতিনিধিদের কাজ করাব অধিকার এমন করিয়া সজোরে চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল না বলিয়া নির্ম্মমভাবে পদদলিত করা হইয়াছিল বলাই সমীচীন।

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল

এই অবস্থায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ৺পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সদস্য শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে, বিজ্ঞানাচার্য্য ৺প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশ-প্রেমিকগণ কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নূতন দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্লীব কংগ্রেসের সংস্কার সাধন করা।

এই উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সংগঠন কমিটির সভাপতি ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্বেও সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণটি পাঠ করিয়াছিলেন। মূল সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। পণ্ডিত মালব্য তাঁহার অভিভাষণে বলেন—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রথম ত্রুটি হইল ইহাতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, আর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার অর্থ দায়িত্বশীল সরকার না থাকা, দ্বিতীয় ত্রুটি হইল ইহাতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তৃতীয় ত্রুটি হইল মুসলমানগণ যাহা চাহিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কিছু অর্থাৎ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনসহ বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতই অগ্রসর হইতে পারে না। এই অবস্থায় আমাদের অদৃষ্টের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকিলে চলিবে না, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিমত প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঐ সম্মেলনের নিকট নিম্নোদ্ধৃত যে তারবার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন পণ্ডিত মালব্য তাহা পাঠ করেন :—

"You all know that I have always disapproved of the Communal Award. I hope our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation."

অর্থাৎ আমি যে বরাবরই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরোধী একথা সর্ব্বজনবিদিত। এই মারাত্মক সিদ্ধান্তের কবল হইতে জাতির রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের সমগ্র শক্তি সংঘবদ্ধ করিবেন আশা করি।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লী, সংযুক্ত (উত্তর) প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, সিন্ধু, বোম্বাই,

মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় :—

১। "হোয়াইট পেপার" ও "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা"র বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ও আইন সভায় আন্দোলন পবিচালন এবং সেইজন্য আইন সভাব সদস্য নির্ব্বাচনেব উদ্দেশ্যে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হইল।

উপবোক্ত উদ্দেশ্য স্বীকাব করিযা লইযা কংগ্রেস সদস্যমাত্রেই এই দলের সদস্য হইতে পারিবেম। এই দলেব সভ্যশ্রেণীভুক্ত কংগ্রেস সদস্যগণের মধ্য হইতে আইন সভাব নির্ব্বাচন-প্রার্থীগণ মনোনীত হইবেন; তবে কোন জাতীয়তাবাদী এই দলেব উদ্দেশ্য স্বীকার কবিয়া আইনসভায় দলের নিয়মাবলী মানিয়া চলিলে ক্ষেত্রবিশেষে এই দল তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন।

২। এই সম্মেলনেব মতে "হোয়াইট পেপার"-এ ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব রচিত হইয়াছে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। উহা একান্ত প্রতিক্রিয়ামূলক। সুতরাং এই সম্মেলন সমগ্র হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধতা করিতেছে।

৩। ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত—যাহা ভ্রমক্রমে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" নামে অভিহিত—সম্বন্ধে এই সম্মেলন তীব্র বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন করিতেছে। কারণ,

(ক) ইহাতে পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথাব বিষ বহাল রহিয়াছে এবং উহা আরও প্রসারলাভ করিয়াছে। পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা জাতীয় প্রতিনিধিত্বেব একান্ত পরিপন্থী, অথচ জাতীয় প্রতিনিধি ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্ভব নহে;

(খ) ইহাতে পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আইনগত সংখ্যাধিক্য প্রদান করা হইয়াছে। ইহা দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী;

(গ) ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি করিবে এবং এক জাতিত্বের ভাব প্রসারের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিবে;

(ঘ) ইহাতে বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দুগণের প্রতি এবং পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখ, বাংলা ও সিন্ধুপ্রদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু

এবং আসামের হিন্দুগণের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে জনসংখ্যার তুলনায় এই সম্প্রদায়গুলি যে পরিমাণে আসন দাবী করিতে পারে, তদপেক্ষা কম-সংখ্যক আসন তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(ঙ) এই বাঁটোয়ারায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রাপ্য আসন-সংখ্যা হ্রাস করিয়া বাংলা ও আসামে ইংবেজগণকে অন্যায়ভাবে অত্যধিক-সংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেব সভ্য নির্ব্বাচন হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বাংলার দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন। তিনি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেস জাতীয় দলেব প্রচার কার্য্যে কলিকাতায় আগমন কবেন। তিনি একদিন মধ্যরাত্রে বীবেন্দ্রনাথকে বিড়লা ভবনে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে অনেক কংগ্রেস-কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেব সভ্য নির্ব্বাচনে দাঁড করান হইবে—ইহাই ছিল সে-দিনের সমস্যা। মালব্যজী অতিশয় চিন্তাকুল ছিলেন। অন্যান্য সকলেও উৎকণ্ঠিতভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। শাসমল বিড়লা ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালব্যজী তাঁহাব নিকটে বাংলাদেশের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া আসন্ন নির্ব্বাচনে কে কোন্ কেন্দ্র হইতে প্রার্থী হইবেন এই কথা উত্থাপন করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ নানা লোকের নাম করিলেন। উপস্থিত সকলে জিদ করিলেন—শাসমল মহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। বীরেন্দ্রনাথ সভ্যপদ-প্রার্থী হইলে যে জয়লাভ করিবেন, সে-বিষয়ে তাঁহাব অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহা হইলেও তিনি তৎকালের কংগ্রেসী রাজনীতির প্রতি বিরূপ ছিলেন। সেই জন্য তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"দাঁড়াইব কি? যেখানে সত্য কথা বলিলে censure (অর্থাৎ নিন্দা) ভোগ করিতে হয় সে-রকম রাজনীতিতে আমি থাকি না; দুই-দুই বার যাহার উপর Nc-Confidence (অনাস্থা) প্রকাশ করা হইয়াছে, সে কাহার ভরসায় দাঁড়াইবে? কংগ্রেসের কাহাকেও আমি বিশ্বাস করি না।" ইহার পর তিনি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইতে

আরম্ভ করিয়া সমস্ত ইতিহাস ঝড়ের মত বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আমি আমার শক্তি জানি, দাঁড়াইলে হারিব না জানি, তথাপি দাঁড়াইতে চাহি না। আমি স্পষ্টবাদী, কথা লুকাইয়া চলিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থা বিপরীত। স্বচক্ষে দেখিতেছি, যাহারা বাস্তবিক অন্তরের সহিত গান্ধী-নীতি মানে এবং তাঁহাকে কার্য্যের দ্বারা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, মহাত্মাজী তাহাদিগকে কোণঠাসা করিতেছেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে আন্তরিক অবজ্ঞা করে, কেবল সুবিধা করিয়া লইবার জন্য ভক্ত সাজে, তাহাদিগকে তিনি মাথায় তুলিতেছেন। মহাত্মাজীর গত বার খড়্গপুর দিয়া যাইবার সময় দেখা করিয়া আমি তাঁহাকে এ কথা বলিয়া দিয়াছি। কংগ্রেসী রাজনীতিতে আমার থাকিবার ইচ্ছা নাই।" শাসমলের অস্বীকৃতিতে কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মালব্যজী একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"এ-কথা কাহাকে বলিতেছেন? ২৩।২৪ বৎসর বয়সে (১) কংগ্রেসে যোগ দিয়াছি, সুখে-দুঃখে যথাশক্তি সমান তালে চলিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আজ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভায় বিবেকের স্বাধীনতা দাবী করিয়া "বিদ্রোহী" বদনাম কিনিয়াছি। কাহারও জীবনের সহিত যদি কংগ্রেসের ইতিহাস আগাগোড়া জড়িত হইয়া থাকে, তবে এই দরিদ্রের জীবনে হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ সে সকল কথা আদৌ স্বীকার করিতেছেন না। একবার মনে করিয়াছিলাম অনেকদিন ত রাজনীতি চর্চ্চা করিলাম। এইবার না হয় বাণপ্রস্থ অবলম্বন করি। এই বৃদ্ধ বয়সে এই দুর্ব্বল দেহ লইয়া ভারতবর্ষব্যাপী বিরোধে নামিব না। এই কথা ভাবিয়া তিন রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই।"

মালব্যজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আমি বাঁচিয়া থাকিব না। কিন্তু তোমরা দশ বৎসর অবিরাম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও তৎসহ ওয়ার্কিং কমিটীর অদ্ভুত প্রস্তাবে যে অনিষ্টের সূত্রপাত হইল, ইহার প্রতিকার করিতে অন্ততঃ দশ বৎসর লাগিবে। এরূপ যে হইবে তাহা গতিক দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। এমন কি, পাটনায় রাষ্ট্রীয় সমিতি বসিবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বাঁটোয়ারার

(১) মালব্যজী কংগ্রেসের জন্মের দ্বিতীয় বৎসরে (১৮৮৬ সালে) উহাতে যোগদান করেন।

অনুকূলে মত দিয়া রাখিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি আর কি করিবে? ইহা নিশ্চিত যে, মহাত্মাজী ছাড়া আর কেহ ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়া এই প্রস্তাব গিলাইতে পারিত না।"

শাসমল বলিলেন "সে কথা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি।"

মালব্যজী পুনরায় বলিলেন—"একবার বাংলার কথা ভাবিয়া দেখ। ব্যবস্থা পরিষদে এক নিয়োগী (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী) ছাড়া বাংলার আর কেহ আমল পায় না। ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার অসুবিধার কথা বলিতে গেলাম। কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—'বাংলার ব্যাপারে আমরা যাইতে পারিব না। উহা পাঁকে ডুবিয়া গিয়াছে।' আমি বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত বাংলার নেতৃত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু এমন দুরবস্থা আর দেখি নাই। বাংলা কি সহসা তাহার সমস্ত শক্তি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া লইল? তোমরা যে যাহার ঘরে বসিয়া রহিবে, আর বাংলাদেশ এমন করিয়া ডুবিবে তাহাই চাহিয়া দেখিবে?"

মালব্যজীর প্রদীপ্ত নেত্রের দিকে চাহিয়া বাংলার কথা শুনিতে-শুনিতে শাসমল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"রাজী হইলাম, দাঁড়াইব।"[১]

বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য-পদ-প্রার্থী হইতে স্বীকৃত হইলেন। সভ্য-পদ-প্রার্থী হইয়া তিনি অনেকের নিকট বলিয়াছেন—"আমি নিশ্চিতই জিতিব, কিছুতেই হারিব না।" এই সময় তাঁহার আইন ব্যবসায়ে বেশ অর্থাগম হইতেছিল, কিন্তু তিনি আর্থিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনি জানিতেন যে, সভ্য-পদ-প্রার্থী হইলে এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করিলেও তাঁহাকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় পড়িতে হইবে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যে যুদ্ধের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন কেন? তাঁহাকে যে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি যে যুদ্ধের মধ্যেই অধিক আনন্দ-উল্লাস অনুভব করেন।

বীরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান বিভাগ অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস জাতীয় দল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সভ্য-পদ-প্রার্থী হন। আর মেদিনীপুরের উকিল শ্রীমন্মথনাথ দাস কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়নে তাঁহার বিরুদ্ধে

(১) মালব্য ও বীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় এই প্রসঙ্গ শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত "বীরেন্দ্র-স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত হইল।

দাঁড়ান। মন্মথ-বাবুর বিরুদ্ধাচরণ বীরেন্দ্রনাথকে বড়ই আঘাত দিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি মেদিনীপুরের উপব যে বিশ্বাস ও দাবী রাখিয়াছিলেন, তাহা একটু ক্ষুণ্ণ হইলে তিনি অভিমানে অধীর হইয়া উঠিতেন। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাব উপবেই অভিমান সাজে। এই সময় কতকগুলি অতি স্বার্থপর ব্যক্তি, অতি হীনভাবে বীরেন্দ্রনাথেব নামে অলীক ও জঘন্য কুৎসা প্রচার করিতে থাকে। তাহাতে তিনি অন্তবে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অকাল-মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ কবিতে পারি।

বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক স্থানে বলেন—"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্দ্দেশের মর্ম্ম এই যে—'তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা কবিতে পাবিবে না।' ইহাতে বিবেকের নির্দ্দেশ তথা ভগবানের নির্দ্দেশ বোধ কবিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাংলাদেশ কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিতে রাজী হইবে না। মহাত্মা গান্ধী নিজেই প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীকে সর্ব্ববিধ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে এবং কখনও ঐ অন্যায অবিচার মানিয়া না লইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অথচ এখন তাঁহাবই ব্যক্তিত্বের শক্তিতে পুষ্ট কংগ্রেস বিবেকের নির্দ্দেশ বোধ করিতে উদ্যত। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেসেব মনোভাব সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অযৌক্তিক। যাহা তীব্র নিন্দাবাদেব যোগ্য তাহাব সম্পর্কে 'না-বর্জ্জন' নীতি অবলম্বনের পক্ষে কোনও যুক্তি থাকিতে পাবে না। যদি কেহ বলে যে, জাতীয়তাবাদী দল বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন কবিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে, মানুষের মধ্যে যে প্রেরণা আবহমানকাল বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছে, এই বিদ্রোহের জন্যও সেই প্রেবণাই দায়ী। যে প্রেরণা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়াছিল, যে প্রেবণা পশু হইতে মানুষকে পৃথক করিয়াছে, এই বিদ্রোহের জন্যও সেই প্রেরণাই দায়ী।

"দমন-নীতির জন্য আমরা সরকারকে দোষ দিই। কংগ্রেসই যদি এখন দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন জনমতকে চাপা দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্যই বিদ্যমান থাকিবে।

"পৃথিবীর অপর কোথায়ও পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা নাই। কেবলমাত্র ভারতের স্কন্ধেই এই পাপ-ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থাই একমাত্র পন্থা।"

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত-বয়স্কদের বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভোটাধিকার ছিল না। তখন শিক্ষা যোগ্যতা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চৌকিদারী ট্যাক্স বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় বিচার করিয়া কোন ব্যক্তির ভোট দেওয়ার অধিকার আছে কিনা স্থির করা হইত। কাজেই তখন ভোটারের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক কম ছিল। কিন্তু নির্ব্বাচনকেন্দ্রের সীমা ছিল বিস্তৃত। তখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগের (অর্থাৎ বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর এই ছয়টি জেলার) অ-মুসলমানের জন্য একটিমাত্র আসন ছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষে হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিলেও বৃটিশ সরকার তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় বলিতে কুণ্ঠিত ছিল। মুসলমানগণের তুলনায় হিন্দুগণ সংখ্যায় অনেক বেশী থাকিলেও তাহাদিগকে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত। বৃটিশ সরকারের অনুকরণে খণ্ডিত ভারতের কংগ্রেসী সরকার এদেশের ও পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে যথাক্রমে বলেন সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়।

যদিও ছয়টি জেলার প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলের বিভিন্ন নেতা ও কর্ম্মী শাসমলের অনুকূলে প্রচার কার্য্য চালাইতেছিলেন, তথাপি শাসমল নিজে এই ছয়টি জেলার বিভিন্ন সহর ও গ্রামে গিয়া সভায় যোগ দিতেন এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য বিষময় ফল ও জাতীয়তাবাদী দলের উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। এই ছয়টি জেলার বিভিন্ন দূরবর্ত্তী অঞ্চলে ভ্রমণ ও জনসভায় বক্তৃতা দান এবং সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের নানাবিধ কাজকর্ম্মে তাঁহাকে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত। ইহার উপর তাঁহার যথেষ্ট অর্থাভাবও ছিল। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত বাগ্মী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকগণ শাসমলকে তাঁহার জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিতেন। তাঁহাদের উপর শাসমলের পূর্ণ আস্থা ছিল আর সেই সঙ্গে তিনি নিজে বিজয়লাভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিতও ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার বিশাল নির্ব্বাচনকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে গিয়া দেশের

ভীষণ পরিস্থিতি সকলকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি কিভাবে নিজ নির্ব্বাচনকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে গিয়া সভার অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেশবাসীর সম্মুখে বিবিধ সমস্যা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিতেন আর তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া সচেতন করিয়া তুলিতেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। একমাত্র শাসমলই নির্ব্বাচনে জয়লাভের পরেও নিজের নির্ব্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদিগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ কবা হয়, আর ১৯শা নভেম্বর ভোট গ্রহণের ফল বাহির হয়। দেখা যায় যে, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মন্মথ-বাবুকে প্রায় আড়াই হাজার ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরনাথ দত্তকে তদধিক ভোটে পরাজিত করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাংলার পক্ষ হইতে তিনি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু হায়! বীবেন্দ্রের বীরবাণী আর শ্রুত হইল না। সে বিজয়ী কণ্ঠ আব বাক্য উচ্চাবণ করিল না। এমন কি, বিজয়-সংবাদে তাঁহাব মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইযাছিল তাহা তিনি বাক্যেও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ভোট গ্রহণের ফল বাহিব হওয়ার দিন যে-তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইযাছিলেন তাহা যে দীর্ঘ ছয় দিনেব মধ্যে একবারও ঘুচিল না! তাহা যে অবশেষে চিব-নিদ্রায পরিণত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রস্থান

বীরেন্দ্রনাথ ১৯শা নভেম্বর একটি মোকর্দ্দমার কার্য্য শেষ করিয়া মেদিনীপুব হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে ট্রেণে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। শুনা যায়, তিনি মেদিনীপুর হইতে দুপুরের ট্রেণে খড়্গপুর পৌছিলে তাঁহার অপপ্রচারকারী ও বিরুদ্ধদলভুক্ত কোন একজন পরিচিত লোক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বলে—'ইলেকসনের রেজাল্ট জানেন? খবর বেরিয়ে গেছে, আপনি হেরে গেছেন।' ইহার কিছুক্ষণ পরে শাসমল সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার অধিক রক্তচাপ ছিল। তার উপর নির্বাচন ও মোকর্দ্দমার কাজ লইয়া তিনি অমানুষিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় মিথ্যা হইলেও এমন দুঃসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তাহার আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে পাবেন নাই। মনে হয়, তাঁহার বিরুদ্ধ দলের কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেব প্ররোচনায় লোকটি অকারণে শাসমলকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছিল আর চিকিৎসকের মনস্কামনাও সিদ্ধ হইয়াছিল।

শাসমল একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় একক যাত্রী ছিলেন। খড়্গপুর ষ্টেশনে টিকিট-চেকার তাঁহাব টিকিট দেখিতে চাহিলে তিনি টিকিট দেখাইতে না পাবিয়া তাঁহার পকেটের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেন। তখন টিকিট-চেকার তাঁহাব অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অসুস্থ বলিযা বুঝিতে পারেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিভাগীয় ডাক্তার লইয়া আসিয়া শাসমলকে পরীক্ষা করেন। শাসমল সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করেন এবং প্রাথমিক যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন কবেন। বেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সেই ডাক্তারকে শাসমলেব সহিত হাওডা ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যখন শাসমল হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছেন, তখন তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। এ-দিকে বীরেন্দ্রনাথেব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্ম্মী প্রভৃতি বহু লোক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বিজয়-সংবাদ লইয়া পুষ্পমাল্য

হস্তে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা বিজয়ী বীরেন্দ্রকে গাড়ীর মধ্যে এরূপ রোগাক্রান্ত দেখিয়া হর্ষ-বিষাদের এক দারুণ সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেন্দ্রনাথকে বিজয়-সংবাদ অবগত করা হইল। বীরেন্দ্রনাথ বিজয়-সংবাদে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় দেশসেবায় দেশপ্রাণের অকালে পরলোক গমনের পর 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর এক সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "In 1920, we had worked together and later on, along with others, I had welcomed him as the Coming Man in Bengal. We expected Uncrowned King of Midnapore to be the 'Uncrowned King of Bengal' too.

* * * * *

"He could not go to his native district, but he gave me instructions which would help me in the campaign I was to lead. The name of Sasmal acted as the key that unlocked the gates of the hearts of the Midnapore peasants to me. The magic of his name lent such a glamour to me and my words that it became easy for me to control crowds and masses of illiterate peasants even when actions in the name of Law and Order made their blood boil.

"Brother-in-the-service-of-Motherland, the weary battle of election over, we were planning a royal welcome to you with flowers, songs and laughing lips.

* * * * *

"With flowers, songs ane tearful eyes, with heavy hearts and sighing lips we have led thy procession and laid the mortal remains we called Sasmal on the funeral pyre, with head held high up towards the sky as befits him who serves none but the Master alone."

অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমরা একসঙ্গে কার্য্য করিয়াছি। পরে আমি ও আরও অনেকে তাঁহাকে বাংলার আগামী দিনের নেতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। 'মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা' যে বাংলাদেশেরও মুকুটহীন রাজা হইয়া উঠিবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। * * *

তিনি তাঁহার নিজ জেলায় যাইতে পারেন নাই, কিন্তু সেখানে আমার যে অভিযান পরিচালনা করার কথা ছিল, সেই অভিযানে কাজে লাগিতে

পারে এমন কতকগুলি উপদেশ তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। শাসমলের নাম তালার চাবীর মত মেদিনীপুরের কৃষককুলের হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি, যখন আইন ও শৃঙ্খলার নামে অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কাজের ফলে জনতা ও নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিতধারা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তখন শাসমলের নামের যাদুমন্ত্রে আমি যে সম্মোহিনী শক্তি পাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই জনতা ও নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায়কে সহজে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম। * *

হে দেশমাতৃকার যজ্ঞে সহকর্ম্মী, ক্লান্তিময় নির্ব্বাচন-সংগ্রাম অন্তে আমরা পুষ্পমাল্য লইয়া গান গাহিতে-গাহিতে হাসিভরা মুখে তোমাকে রাজোচিত ভাবে যে অভিনন্দন জানাইব, আমবা তাহার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। **

পুষ্পমাল্য লইয়া শোকগাথা সহকারে অশ্রুসিক্ত নয়নে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তোমার শোকযাত্রা কবিয়াছি এবং আকাশেব দিকে তোমাব শিব উন্নত রাখিযা শাসমল নামে অভিহিত নশ্বব দেহ চিতার উপর স্থাপিত কবিযাছি। শিব উন্নত কবিযা রাখা তাঁহাবই পক্ষে উপযুক্ত যিনি পরম পুরুষ পরমেশ্বব ব্যতীত আব কাহাবও নিকট অবনত হন নাই।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বীবেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে আনয়ন করা হইল। কলিকাতাব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহাব চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাব শয্যাপার্শ্বে যাঁহাবা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বীবেন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত রাত্রি কেবল দেশেব কথা, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তেব কথা আলোচনা কবিয়াছিলেন। কি ভাবে তিনি ভাবতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা কবিবেন, কি করিয়া দেশেব মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইবেন—এই সমস্ত বিষয় ছাড়া আর কোন কথাই তাঁহার বক্তব্য ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার প্রাণ থাকিতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর কৃত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে দিব না।' বীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে বিজয় লাভ করায় বাংলার কংগ্রেস পার্ল্যামেণ্টারী বোর্ডের মুখে চুণ-কালি পড়িল বটে, কিন্তু বিধির নির্ম্মম বিধানে বিজয়ের দিনই কালের কাল মেঘ আসিয়া বাংলামায়ের আশা-ভরসাস্থল কাল ছেলেটিকে আরও খানিকটা কাল করিয়া দিল এবং চিরান্ধকারের দিকে যাইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড কাল পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ সেই রাত্রির শেষ যাম হইতে চেতনা হারাইলেন। সে চেতনা আর ফিরিল

না। ছয় দিন চেতনাশূন্য অবস্থায় কাটাইয়া ২৪শা নভেম্বর শনিবার রাত্রি ৩টা ১৬ মিনিটের সময় মহাবীর মহাপ্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক বৎসব পূর্ব্বে যে উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতে এই নির্ভীক, তেজস্বী, চিরোন্নত-শির যোদ্ধা লিখিয়াছিলেন—"জীবিতাবস্থায় আমি যে-শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুব পরেও যেন আমার সেই শির অবনমিত করা না হয়।" জীবিতাবস্থায় শাসমল অনেকের নিকট তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছিলেন—"আমি সবাইকে বলে যাচ্ছি এবং উইলেও লিখে রেখেছি—আমাকে যেন মৃত্যুব পর দণ্ডায়মান অবস্থায় সৎকার কবা হয়।" মানুষের সঙ্কল্প কতখানি দৃঢ় হইলে, হৃদয় কতখানি মহৎ হইলে, অন্তরে কিরূপ জ্বলন্ত তেজস্বিতা থাকিলে এবং মনে-মনে আপনার সম্বন্ধে কতখানি নিষ্কলুষ ধারণা থাকিলে যে মানুষ মৃত্যুর পরেও আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বাসনা চরিতার্থ করিতে চায়, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বীয় অসাধারণ কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে সমাধি-স্থানে স্তম্ভ বা এম্‌নি কিছু একটা স্থাপন করিবে ইহা তিনি আশা করিতেন এবং সেই সমাধিস্তম্ভে কি লিপি খোদিত থাকিবে তাহাও তিনি স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের জীবনকালে তাঁহার তেমন সমাদর হয় নাই। মৃত্যুর পরেই তাহার সমধিক আদর হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথেরও জীবদ্দশায় বা এখনও তাঁহার তেমন সমাদর হয় নাই। জানি না, তিনি ইহার পরে কেমন সমাদর পাইবেন। যাহা হউক, মহাপুরুষের বাসনানুযায়ী তাঁহার চিরোন্নত শির ঊর্দ্ধ দিকে রাখিয়াই কলিকাতার আদিগঙ্গার তীরবর্ত্তী কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়।

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ অভিযানে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস পার্ল্যামেণ্টারী বোর্ডের প্রতিকূলতা কাটাইয়া উঠিতে বীরেন্দ্রনাথকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাই তাঁহার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ হেতু। পরিশ্রম যে কঠোর হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। অতিরিক্ত শ্রমে যে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতেন। নির্ব্বাচন-দিবসের দুই-তিন দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। কি হয় বলিতে পারি না।' নিজের জীবনের পক্ষে

এই বিপদ জানিয়াও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা সমাধা করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় আত্ম-বলিদানের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

"বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে বীবেন্দ্রনাথেব পুনবাগমন বাংলায় জনমতের পুনর্জাগরণের প্রথম সূচনা এবং তাঁহার বিজয় বাংলায় জনজাগরণের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ। বীরেন্দ্রনাথ আজ বাঁচিয়া থাকিলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার জনমতকে এরূপ প্রবল বেগে পবিচালনা করিতেন যাহার সম্মুখে অবনত না হইয়া কাহারও উপায়ান্তর থাকিত না। বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে দিক্‌পালপতন—জাতীয়তার পক্ষে বিধিবজ্রের তুল্য।"[১]

বীরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতাবাসী এলবার্ট হলে এক শোকসভাব অনুষ্ঠান করেন। সেই সভায় এই মহাপুরুষেব অমর আত্মাব উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানজনক 'দেশপ্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয়। মৃতেব ভস্মের উপব উপাধি পাত—এ প্রথা চীনদেশে আছে। সেখানে জীবিতকালে কাহাকেও সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয না, মৃত্যুর পর দেওয়া হয়। মেদিনীপুববাসী বহু পূর্ব্বে বীবেন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁহাকে যথার্থ দেশপ্রাণ বিবেচনা কবিয়া 'দেশপ্রাণ' আখ্যা দিয়া তাঁহাব প্রতি আপনাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ কবিয়াছিলেন। ধনীব সন্তান বীরেন্দ্রনাথ, খ্যাতনামা ব্যাবিষ্টার শাসমল যেদিন দাবিদ্র্য-পীড়িত অসংখ্য দেশবাসীর দুঃখকষ্টকে আপনার অন্তরে অনুভব করিয়া তাহা মোচনেব জন্য আপনার সুখশান্তি বিস্মৃত হইয়া গ্রামে-গ্রামে পদব্রজে কদ্দমাক্ত দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যে-দিন শাসমল প্লাবনপীড়িত রমণীব বক্ষেব বসনাভাব দেখিয়া 'আর দুর্দ্দশা দেখিতে পারি না' বলিয়া নয়নেব জলে বুক ভাসাইয়াছিলেন এবং যে-দিন শাসমল দেশের স্বার্থ বিপন্ন দেখিয়া সংসারের সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই দিন শাসমল মহান্, সেই দিন শাসমল দেশপ্রাণ।

(১) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিত "শাসমলের স্মৃতিরক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব

বীরেন্দ্রনাথ জাতির যথার্থ সেবক ছিলেন। আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সেবার মধ্য দিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া তিনি আপনাকে যে-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই নেতার আসন। নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য অথবা নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথ কখনও লালায়িত ছিলেন না। হীনভাবে দল পাকান বা দল পুষ্ট কবার মত মতলব তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি সর্ব্বদা আপনার উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য কবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। তিনি আপনার কর্ম্মের নিন্দা-প্রশংসার দিকে ভ্রূক্ষেপ কবিতেন না। বীবেন্দ্রনাথের যে রকম অসাধারণ কর্ম্মশক্তি, অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, গভীর চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ আত্মবিশ্বাস, দুর্জ্জয় সাহস ও সত্যের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে, শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতেরও নেতৃত্ব করিবার অধিকারী ছিলেন। তিনি যে সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিই তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে এবং সর্ব্বোপরি আইন অমান্য আন্দোলনে যে মেদিনীপুর জেলা বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বীবেন্দ্রনাথ সেই মেদিনীপুরের অকৃত্রিম সেবক ও নেতা ছিলেন। কাজেই তিনি যে বাংলাদেশেব শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন একথা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি বেশী দিন সমগ্রভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। মৃত্যুব কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বীবেন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন।

সাধারণতঃ লোকে জনপ্রিয় নেতা বলিতে যাহা বুঝে, সে বকম জনপ্রিয় নেতা হওয়াব পক্ষে বীরেন্দ্রনাথের প্রধানতঃ কয়েকটি অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, তিনি আপোষের নিকট নীতি ও আদর্শ বলি দিতে একান্ত অপারগ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বয়ং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইতে কোন প্রকারেই বিচলিত হইতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ, তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্ম্মী প্রভৃতি সকলকেই সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে কোন মতে কুণ্ঠিত হইতেন না। চতুর্থতঃ, একই কারণে দুই বিভিন্ন ও বিসদৃশ ব্যাপারের অনুষ্ঠান সমর্থন করিতে পারিতেন না, বরং নিন্দা করিতেন।

পঞ্চমতঃ, তিনি অহিংস কংগ্রেসে হিংসাবাদের সমর্থন করিতে পারেন নাই, নিন্দাই করিয়াছিলেন। ষষ্ঠতঃ, তিনি কপটতা বা চালবাজি জানিতেন না, কাজেই এই সব উপায়ে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অন্তরায়ের কথা সুধী পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বীরেন্দ্রনাথ কোন সময়েই অপরের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব করেন নাই। তাঁহার শেষ নেতৃত্ব হইতে বুঝিতে পাবা যায়, বাংলাদেশে তাঁহার গুণের সমাদব সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিনি যে জনসাধারণের জন্য চিরজীবন ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ লক্ষিত হইতেছিল। বীরেন্দ্রনাথের অন্তরে নেতৃত্ব করিবার অণুমাত্র লোভ ছিল না। সেই জন্য স্পষ্ট অথচ নির্ভীকভাবে সকলের সম্মুখে অপ্রিয় সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল এবং তিনি আবশ্যকবোধে তাহা বলিতেন। নেতৃত্বের দ্বারা সম্মানলাভের লোভ সম্বরণ করিয়া ও ক্ষমতা পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া অপ্রিয় সত্য বলিবার ক্ষমতা আর কোন দেশনেতার ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না। যখন বীরেন্দ্রনাথ কাহারও দোষের কথা বলিতেন, তখন তাহা দোষান্বিত ব্যক্তির সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

বীরেন্দ্রনাথ বলিতেন—জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা না জাগিলে জাতির উন্নতি অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ সহবে শতকবা হয়ত ২০ জন লোক বাস কবে এবং তাহারা অনেকেই শিক্ষিত। বাকী ৮০ জন পল্লীতে বাস কবে, তাহারা সকলেই প্রায় নিবক্ষব। আর রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে হইলে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ কবিতে হইবে। মেদিনীপুব জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে শাসমলের আন্দোলন, মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে তাঁহার কাজকর্ম্ম, গ্রামে-গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ, গ্রামবাসীদের সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা করা—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে জনসাধারণের প্রতি বীবেন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, বীরেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, বড ব্যারিষ্টার ছিলেন; তবু তিনি সাধাবণের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি কবিয়া বেড়াইয়াছেন। এমন দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ দেখা যায়।

বীবেন্দ্রনাথ মনীষী ও প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। যে দিন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা কেবলমাত্র সহরের মধ্যে—দেশের মাত্র জন কয়েক শিক্ষিত

লোকের মধ্যে আপনাদের আন্দোলন বা কর্ম্মের সীমা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-দিন বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগাইতে না পারিলে আন্দোলন টিকিতে পাবে না, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। সেই জন্য লোক-শিক্ষার দ্বারা যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন জাগিয়া উঠে, তিনি সেই দিকে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন-জাগরণের চেষ্টা সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। জাতীয়তা বিস্তারের এই সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করা, নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাবোধ জাগাইয়া তাহাকে একেবারে মুকুলিত করিয়া তোলা, সুপ্ত জড়-প্রায় স্বাধীনতা-বৃত্তিকে মন্থনপূর্ব্বক সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গঠন করা—বীরেন্দ্রনাথের বিস্ময়কর মনীষা ও প্রতিভার পরিচয়। এইখানেই তাঁহার দূরদর্শিতা ও সৃজনী শক্তি। বাংলার আর কোন নেতা এই গৌরব দাবী করিতে পারেন না। বীরেন্দ্রনাথের প্রতিভা শুধু ভাবের প্রতিভা নয়, ভাব ও কর্ম্ম উভয়ের প্রতিভা। শাসমলের কর্ম্মের প্রভাব মেদিনীপুর জেলার জনসাধারণের অন্তরে এমন গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহার জীবন-সময়ে মেদিনীপুর বলিতে শাসমলকে বুঝাইত। তাঁহার কর্ম্মপ্রভাব ও অনুপ্রেরণা তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনে পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যষ্টিকে তিনি আপনার বেগবতী প্রেরণা ও প্রাণের মোহময় স্পর্শে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বীরেন্দ্রনাথকে বাংলার তথাকথিত কংগ্রেস-কর্ম্মীরা কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর কংগ্রেস-দ্রোহী বলিয়াছিল।

শাসমল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার মধ্যে একটা কিছু বড় স্থান অধিকার করিতেন না। এমন কি, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিরও সভাপতি ছিলেন না। কিন্তু তিনি যতখানি নিষ্ঠার সহিত স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষা করিয়া এবং যতখানি গভীর ভাবে সেই আদর্শকে দেশের অন্তরে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, এক কথায় তিনি যতখানি স্থায়ীভাবে কংগ্রেসের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার অপর কোন নেতা বা কর্ম্মীর দাবী করিবার পৌরষ নাই। যখন অন্যান্য কর্ম্মী নেতৃত্ব করিবার জন্য দল পাকাইয়াছেন, যখন তাঁহারা নানা প্রকারে ভারতের নেতা হইবার দাবী করিয়াছেন বা

ভারতের নেতা হইবার শক্তি আছে বলিয়া মনে-মনে গর্ব্বানুভব করিয়া আত্ম-প্রসাদে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন বাংলাদেশেই তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় রাখা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর বাংলাদেশের স্বয়ংসিদ্ধ নেতা সাজিয়া পরম লোভনীয় নেতৃত্বটুকু স্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে বহু প্রকার অবাঞ্ছনীয় পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ সে জাতীয় নেতা ছিলেন না। তিনি জাতির যথার্থ সেবক— দরদী বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য তিনি যথার্থ স্বাধীনতাকামীদিগের উপর নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি হীনভাবে দল পাকাইবার চেষ্টার কথাও মনে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার নেতৃত্বের পশ্চাতে অর্থপুষ্ট অবাঞ্ছনীয় দল ছিল না। তাঁহার পশ্চাতে কতকগুলি একনিষ্ঠ, ত্যাগী, স্বদেশ-হিতে-উৎসর্গীকৃত-প্রাণ জীবন্ত কর্ম্মী ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ একক, বীরেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। বাংলার অন্যান্য নেতা জোড়াতালি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য বহু অন্যায় সমর্থন করিয়াছেন, বহু দুষ্কার্য্যকে দুষ্কার্য্য জানিয়াও কংগ্রেসের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। আর বীরেন্দ্রনাথ মতবিরোধ হইলে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া বিচক্ষণ শিক্ষকের ন্যায় সুসময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বাংলার তথাকথিত নেতাগণ অপরের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নেতৃত্বের বহর দেখাইয়াছেন, আর বীরেন্দ্রনাথ বীরের মত আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইয়া সদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। মোটর গাড়ী বাংলার যত দূর অগ্রসর হইতে পারে, তত দূর পর্য্যন্ত বাংলার তথাকথিত নেতাদের নেতৃত্বের সীমা, তার বেশী দূর নয়। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের সেবার মঙ্গলময় হস্ত ও নেতৃত্বের সুচিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক ও শক্তি বাংলাদেশের আলোকোজ্জ্বল নগরের শিক্ষিত-জন-সমাকীর্ণ বক্তৃতামঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর নিরক্ষর পল্লীর নিভৃত কোণ পর্য্যন্ত। এইখানে বাংলার তথাকথিত নেতা ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ।

বীরেন্দ্র-চরিত

বীরেন্দ্রনাথের যে অসীম কর্ম্মস্পৃহা ছিল তাহা পরিতৃপ্ত না হইতেই পরপারের তরণী আসিয়া তাঁহার ঘাটে লাগিল। মাতৃভূমির কত কাজ করিবার সাধ তাঁহার ছিল, স্বদেশোন্নয়নের কত আশা তিনি হৃদয়-কন্দরে সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কত অপূর্ণ সাধ,

কত অতৃপ্ত আশা লইয়া তিনি ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই শত্রুমণ্ডলী সর্ব্বদা তাঁহার উর্দ্ধ শির লক্ষ্য করিয়া নিধনের জন্য শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সর্ব্ব-প্রকাব চেষ্টা করিত। কিন্তু বীবেন্দ্রনাথ ছিলেন শাসমল। তিনি কোন অন্তরায়েব দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, সর্ব্বদা দৃঢ়মনে আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিযা যাইতেন।

শাসমল শিশুর মত সবল ও অনাডম্বব ছিলেন। তাঁহার বাক্য, আচরণ ও পোষাকে কোন প্রকার বিলাসিতাব আভাষ ছিল না। তিনি একেবারে সরল, সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। ব্যাবিষ্টাবী কবিলেও তিনি খদ্দরের কোটপ্যান্ট্ ব্যবহাব করিতেন। আহারাদি বিষযে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, যখন যেমন খাবাব জুটিত তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহাকে অত্যন্ত মোটা চাউলের ভাতও পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে ও অতি-সাধারণ শয্যায শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেও দেখা গিয়াছে।

বীরেন্দ্রনাথ খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনও তিনি মাতৃদেবীব কথা বিস্মৃত হন নাই। যখন তিনি কাবাগৃহে আবদ্ধ, তখনও মাতৃদেবীর মূর্ত্তি তাঁহাব হৃদয-মন্দিবে বিরাজিত ছিল। বীরেন্দ্রনাথ লিখিযাছেন, "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে বিবাজিত জ্ঞানময় দেবাদিদেব মহাদেব অবগত আছেন, বিস্মৃত হতে পারি নি কেবল চরণ দুখানি আমাব গর্ভধাবিণী পবমদুঃখিনী স্নেহময়ী জননীব। আজ আমার যাত্রাপর্ব্বের শেষ দিনের শেষ সময়ে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, সকল দিক্ সৌরভে আকুল করে আমার মাতৃচরণকমল আমার হৃদয়-কাননে সত্যই ফুটে উঠেছিল। ক্ষণিকের তবে মানব-সুলভ দুর্ব্বলতায কথঞ্চিৎ বিচলিত হলেও, শেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমার গর্ভধারিণী কাঙ্গালিনী মাতাঠাকুবাণীর চরণশ্রীর সঙ্গে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির চরণশ্রীর কোনও পার্থক্য ছিল না।"—(স্রোতের তৃণ, পৃঃ ৬৬)

বীরেন্দ্রনাথ আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমাব একান্ত আপনার স্রোতের তৃণটি আমাদেব জেলেব পাশে আদি গঙ্গা ও ক্রমে ভাগীবথী অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের বস্থলপুরের নদী দিয়ে ফুলবাড়ী গ্রামে আমাব পুত্রবিরহবিধুরা পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে এবং ভক্তিচন্দনে তাঁর চরণযুগল চর্চ্চিত করে আবার অনন্তের যাত্রী অনন্ত স্রোতে ভাসতে

ভাস্তে রসুলপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ছুট্‌তে আরম্ভ করেছে ভারত মহাসাগরের পানে।"—(স্রোতের তৃণ, পৃঃ ১২৫)

বীরেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা পালন

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ। বীবেন্দ্রনাথেব বযস তখন ২৪ বৎসর। মিড্‌ল টেম্পল-এর ছুটিব অবকাশে তিনি নিউইয়র্কে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বীবেন্দ্রনাথ এই সময় নিউইয়র্কেব লেখক-সমাজে কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছিলেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে সেখানে এক ধনী পরিবাবেব সহিত বীবেন্দ্রনাথেব আলাপ হয়। এই পরিবাবে ছিলেন তিনটি প্রাণী—পবিবাবের কর্তা, গৃহিণী ও তাঁহাদেব একমাত্র কন্যা। বীবেন্দ্রনাথ অতি সবল মনে এই পবিবাবেব সহিত মেলামেশা করিতেন। বীবেন্দ্রনাথকে তাঁহাবা প্রায়ই নিমন্ত্রণ কবিয়া খাওয়াইতেন। সেই সময়ে নানা বিষয়ে আলোচনাও হইত। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া যাওয়ার পরে বীবেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন যে, সেই ধনী কন্যাটি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন। বীবেন্দ্রনাথ তখন যুবক—ধনীকন্যা অপূর্ব সুন্দবী যুবতী।

বীবেন্দ্রনাথেব অন্তবে সংগ্রাম শুরু হইল। এক দিকে নিউইয়র্কেব অর্থশালী পিতাব সমস্ত সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবিণী অপূর্ব্ব সুন্দবী একমাত্র কন্যা, অপরদিকে সমুদ্রপাববর্ত্তী গণ্ডগ্রাম চণ্ডীভেটিতে বৃদ্ধা বিধবা মাতার পদতলস্পর্শে ইউবোপীয় মহিলাব পাণিগ্রহণ না কবার পবিত্র প্রতিজ্ঞা। আজন্ম যোদ্ধা সার্থকনামা বীরেন্দ্রনাথ মনকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিলেন। তিনি এই পবিবাবে যাতাযাত বন্ধ কবিলেন। কিন্তু পবমেশ্বব তাঁহাকে পবীক্ষা হইতে মুক্তি দিবেন কেন?

বীবেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত কবিলেন তিনি কাহাকেও না জানাইয়া নিউইয়র্ক পবিত্যাগ করিবেন। যেদিন তিনি নিউইয়র্ক পরিত্যাগ কবিবেন স্থির হইল, সেইদিন সেই ধনী কন্যা তাঁহাব গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন বীরেন্দ্রনাথেব যাত্রার কথা জানিতে পাবিলেন, তখন তাঁহার চোখে অবিরাম অশ্রুধারা ঝবিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। প্রিয়তম বলিয়া যাঁহার কণ্ঠে তিনি মনে-মনে ববমাল্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেন না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যে স্বয়ং মাতৃদেবীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কিরূপে

এই বিদেশিনীকে বধূরূপে বরণ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন! যুবতী ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। সেখানে বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সহিত বিবাহ সম্ভব নয়। উত্তরে যুবতী বীরেন্দ্রনাথের হাতখানি টানিয়া লইয়া তাহার অপরিসীম-বেদনার-আঘাতে-ঝরিয়া-পড়া অশ্রুনির্ঝরে সিক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ অটল। এই নিরপরাধা সরলা তরুণীর প্রতি তাঁহার বিরূপতা ছিল না। কিন্তু তিনি যে রুগ্না, বিধবা জননীকে কথা দিয়া আসিয়াছেন, 'মেম' বিবাহ করিবেন না। যিনি তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে আপন বক্ষসুধা পান করাইয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—যিনি আজিও সকল কাজ ফেলিয়া কেবল তাঁহার দুই ছত্রের একখানি লিপির জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—যিনি শয়নে-স্বপনে তাঁহাকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য গোপনে বসিয়া শীর্ণ অঙ্গুলিতে দিন গুণিতেছেন, হৃদয়ের সকল সুখ-দুঃখের বলিদান করিয়া, তাঁহাকে যে সেই বৃদ্ধা জননীরই সন্তোষ সাধন করিতে হইবে। মায়ের দাবীর উপরে নিজের দাবীকে কি করিয়া স্থান দিবেন?

যুবতী বলিলেন, তুমি আমায় ছাড়িয়া গেলে আমার জীবন অন্ধকার হইয়া যাইবে। বীরেন্দ্রনাথের মনের ভিতরের মানুষটি বলিয়া উঠিলেন, 'এই বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ করিলে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার সন্ধ্যাবেলার রচিত আশার স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে।' বীরেন্দ্রনাথ তরুণীকে মাতার নিকট প্রতিজ্ঞার কথা খুলিয়া বলিলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। যুবতীটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে ও ব্যথা-বিদীর্ণ হৃদয়ে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলেন। বীরেন্দ্র-নাথও নিউইয়র্ক ছাড়িয়া আসিলেন।

যে অনমনীয় সত্যনিষ্ঠা বীরেন্দ্রনাথকে অমর করিয়াছে, এই চরম মুহূর্ত্তেও তিনি সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন। হৃদয়ের বে-সুরা তন্ত্রীগুলিকে কঠিন হস্তে আয়ত্ত করিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, রক্তমাংসের দাবী পূরণই জীবনের চরম সত্য নহে। সুন্দরী প্রেমিকার দাবী অপেক্ষা মাতার স্নেহের অধিকারকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই হাসিকান্নার জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের চেয়ে সত্যকে মহত্তর বলিয়া মানিয়া লইয়া তিনি তাঁহারই চরণে ভক্তিপ্রণত চিত্তে অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের বেশ কিছুদিন পরে কাঁথির পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ৺লালা বলরামের কন্যা হেমন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের

এক কন্যা অশ্রুকণা ও এক পুত্র বিমলানন্দ বর্ত্তমান। বিমলানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, ও বি এল. এবং ফ্রান্সের প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট্.

কোমল-কঠোর বীরেন্দ্রনাথ

যখন বীরেন্দ্রনাথ সত্যকথা শ্রুতিসুখকর না হইলেও বলিয়া ফেলিতেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে বড কঠোব, বড নির্দ্দয় মনে করিত। কিন্তু এই কঠোবতার অন্তরালে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও বড়ই দয়াপ্রবণ ছিল। কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি শক্তিমত তাহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইতেন না। তিনি বহু গরীব ছাত্র ও দরিদ্র ব্যক্তিকে নানা প্রকাবে গোপনে সাহায্য করিতেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু লোকের মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাট ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক বপুর মধ্যে স্নেহ-দয়ার যে পূতমন্দাকিনী-ধারা ফল্গুব মত বহিয়া যাইত, সকলে তাহার নাগাল পাইত না।

বীবেন্দ্রনাথ কখনও ব্যাবিষ্টাবিকেই জীবনেব চবম কাজ বলিয়া মানিয়া লইয়া কাজ করিতেন না, যদিও তিনি মক্কেলেব কার্য্যে কখনও অবহেলা কবেন নাই। কোন-কোন মাসে তাঁহাব ১২ হাজাব হইতে ১৫ হাজাব টাকা আয় হইত। আবার কোন সময় হয়ত মাসের পর মাস বিনা পারিশ্রমিকে আসামীর পক্ষে কাজ করিতেন।

কোনও সময় হয়ত তাঁহার নিজেরই হাতে অর্থের টানাটানি থাকিত। কিন্তু তিনি ধার করিয়াও শত-শত মুদ্রা অপরকে দান করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। এমন কি, যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল শত্রুতা সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখে-বিপদে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। একবার কাঁথিতে একটি সহায় ও সম্বলহীনা বারবনিতার কঠিন অসুখের সময় তিনি নিজে ঔষধ, পথ্য ও অর্থ তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

যাত্রা-থিয়েটার—এ সব নিছক কৃত্রিম, বাস্তবের ছায়াপাত-শূন্য। কিন্তু এমন কৃত্রিমতার ক্ষেত্রেও কোন শোক-দুঃখ-পূর্ণ দৃশ্য দেখিলে, কোন দুঃখের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে বীরেন্দ্রনাথ বালকের মত অশ্রুপাত করিতেন। বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে কপটতা, শঠতা বা ভণ্ডামির কিছুমাত্র লেশ ছিল না। যখন তিনি হাসিতেন তখন তাঁহার হাস্যধ্বনিতে সমস্ত কক্ষতল পূর্ণ হইয়া

উঠিত। হৃদয় সরল না হইলে, মন কপটতাশূন্য না হইলে, এমন প্রাণ-খোলা হাসি কেহ হাসিতে পারে না। বীরেন্দ্রনাথ একবার হাসিলে তাঁহার অন্তরের শুভ্র সারল্য প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং তাঁহার যে কি উদার প্রাণ ও উচ্চ মন ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইত। দেশের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে—অন্যায়েব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে এই কথা শুনিলে তাঁহার রক্ত যেন নাচিয়া উঠিত, আপনাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিতেন না। সমস্ত স্বার্থ সর্ব্ব-প্রকার সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়া তিনি রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পডিতেন। তিনি যুদ্ধেব মধ্যেই যেন বেশী সুখ অনুভব করিতেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাঁহার সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগর ও বীরেন্দ্রনাথ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৯শা জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় পবলোক গমন করেন। তখন বীরেন্দ্রনাথ বালকমাত্র। সেই সময় হইতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশযেব অভাব যেন কতকাংশে পূর্ণ কবিবাব জন্য গডিযা উঠিতেছিলেন। বীবেন্দ্রনাথ কাঁথি হাই স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্‌স্‌ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াব পর কলিকাতায বিদ্যাসাগব মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। বীরেন্দ্র-চরিত্রে বিদ্যাসাগর-চবিত্রের কোন কোন গুণেব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ই যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কবিতেন তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। এমন কি, আপোষে একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহাদেব প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। উভয়েই অমিত-তেজস্বী ছিলেন। আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবাব জন্য দুই পুরুষসিংহই সমস্ত পার্থিব লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। বিদ্যাসাগব মহাশয বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিয়া সফল হইয়াছিলেন; এমন কি, যখন তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল, তখনও তিনি আপন প্রয়াস হইতে বিমুখ হন নাই। বীবেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও মেদিনীপুর জেলা বিভাগ বোধ কবিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে সংগঠন-শক্তি, যে নির্ভীকতা, যে তেজস্বিতা, যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা একমাত্র বিদ্যাসাগর চবিত্রে বর্ত্তমান ছিল। বীরেন্দ্রনাথ লক্ষ-লক্ষ লোকের মঙ্গলামঙ্গল বিপদাপদেব দায়িত্ব-ভার আপনি একাকী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত এক যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ব্যতীত

আর কাহারও মধ্যে চোখে পড়ে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় জনসাধারণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথও উদার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া জনসাধারণের জন্য বহু কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন এবং তাহাদের দুঃখ অবগত হইবার জন্য, তাহাদিগকে বিপদের সময় সতর্ক করিবার জন্য দ্বারে-দ্বারে উদভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তা, ঝড়বৃষ্টি কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মেদিনীপুরবাসী তাঁহাকে শুধু নেতা বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে আপনাদের রক্ষক ও একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। মেদিনীপুর জেলায় সাধারণের স্বার্থহানিকর কোন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে, বা কোন অত্যাচার দেখা দিলে, যাহারা কখনও শাসমলকে দেখে নাই এমন লোককেও বলিতে শুনা গিয়াছে, "ভয় কি, আমাদের শাসমল আছেন, তিনি ঠিক ব্যবস্থা করে' দেবেন।" বীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত পরাধীন ভারতের আর কোন নেতা এমন করিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যে অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ রাত্রি তিনটার সময় সঙ্গীসহ বর্ষার খরস্রোতা পিছাবনী খালের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং নৌকা না থাকায় সাঁতার দিয়া খাল পার হইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃসন্দর্শনে যাইবার জন্য সন্তরণ দিয়া দামোদর নদ পার হওয়ার কথা মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন এবং স্বগ্রাম বীরসিংহে ভগবতী ইনস্টিটিউসন স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা বিস্তার কল্পে কাঁথি সহরে স্বীয় বাসভবনে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বীরেন্দ্রনাথের বড় সাধের ঐ জাতীয় বিদ্যালয়টী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাহার ফলে বিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষার বর্ণমালা লিখিয়াছিলেন; বীরেন্দ্রনাথ এক অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণমালা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের ভার ও আপনার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়াগুণের সুযোগ পাইয়া অনেকেই তাঁহাকে প্রতারিত করিলেও তিনি যেমন কোন

দিন তাহাদিগের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন নাই, তেমনি বীরেন্দ্রনাথের সারল্য ও উদার প্রেমের প্রশ্রয়ে অনেক ব্যক্তি তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেও এবং কেহ-কেহ তাঁহারই সহায়তা লাভ করিয়া স্বার্থপূরণের জন্য তাঁহারই শত্রুতা করিলেও বীরেন্দ্রনাথ কোন দিন তাহাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন নাই।

সাহিত্য-সাধনায় বীরেন্দ্রনাথ

সংগ্রামগতপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। কৈশোরেই তাঁহার সাংগ্রামিক জীবন সুরু হয়। তাঁহার বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসব, সেই সময় তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতৃদেব মৃত্যুকালে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান। ঐ সময় আবাব বীরেন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠ সহোদব বিপিনচন্দ্রেব মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। এই অবস্থায় স্কুলের ছাত্র কিশোব বীরেন্দ্রনাথকে বিষয়-সম্পত্তিব তত্ত্বাবধান ও ঋণ-পবিশোধেব দিকে মনোযোগ দিতে হয়। ফলে তাঁহার অধ্যয়ন কিছুটা ব্যাহত হয়। বীরেন্দ্রনাথেব পরবর্ত্তী জীবনের সংগ্রামের কথা বিবৃত করিতে ইতিপূর্ব্বে যথাশক্তি প্রযাস পাইয়াছি।

বিভিন্ন প্রকার সংগ্রামেব মধ্যে বীবেন্দ্রনাথেব জীবন অতিবাহিত হইলেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েব বহু গ্রন্থ পাঠ করার মত সময় তিনি ঠিক করিয়া লইতেন। সাহিত্য-সাধনাব দিকে তাঁহাব বাল্যকাল হইতে ঝোঁক ছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে বেশীদূব অগ্রসব হওয়ার অবসর পান নাই। তিনি কাঁথি সহরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দেব ১৪ই এপ্রিল 'প্রার্থনা' শীর্ষক ও ঐ বৎসব ২৪শা এপ্রিল 'শ্মশান' শীর্ষক দুইটি কবিতা রচনা কবেন। ঐ দুইটি কবিতা মৎসম্পাদিত বাংলা ১৩৪৯ সালেব অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'দেশপ্রাণ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'লণ্ডনে' শীর্ষক কবিতা ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩১০ সালেব আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এবং উহা "দেশপ্রাণ"-এব উল্লিখিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। বীরেন্দ্রনাথের "নিউইয়র্কে পাঁচ মাস" শীর্ষক ভ্রমণকাহিনী "প্রবাসী"র ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বীরেন্দ্রনাথ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বব মাসে তাঁহাব "স্রোতের তৃণ" গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। উহাতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের উদ্যোগ পর্ব ও গ্রেপ্তার- বিচাব- কারাবাস-কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথের মাতৃদেবী পরলোকগমন করেন। ইহার পব তিনি "আমার মা আনন্দময়ী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহা "দেশপ্রাণ"-এব উল্লিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সন্নিবিষ্ট কবা হইল।

বীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি

বীরেন্দ্রনাথ যে এত কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার একাধিক বিশিষ্ট কারণ ছিল। তাঁহাব গভীব আত্মবিশ্বাস ছিল এবং প্রত্যেক কাজের ভালমন্দেব জন্য তিনি আপনাকেই দায়ী জ্ঞান করিতেন। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কেহ কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সর্ব্ব-প্রকার বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতেন। বীবেন্দ্রনাথেব আর এক গুণ ছিল—অঙ্গীকার পালন। তিনি কাহাকেও একবাব কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে, সর্ব্ব-প্রকার ক্ষতি স্বীকার কবিয়া তিনি তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

বন্ধুত্ব ও নীতিব মর্য্যাদা দুই বিভিন্ন বস্তু। আজকাল বন্ধুত্বের দাবী হীনভাবে নীতিকে পদদলিত করিতেছে এমন দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে; কিন্তু বীবেন্দ্রনাথের চবিত্রে এমন বিসদৃশ ব্যাপাব ঘটে নাই। তিনি কখনও বন্ধুত্বের নিকট নীতিকে বলি দেন নাই। দেশপ্রাণ বলিতেন যেখানে অনুচরগণ নেতার নির্দ্দেশে চালিত হয় না, এবং মতভেদ হইলে পৃথক থাকিতে চায় না আর যেখানে অনুচরগণেব খেয়াল অনুযাযী নেতা গঠিত ও চালিত হয়, সেখানে কোন কার্য্য অগ্রসব হইতে পাবে না এবং কোন উন্নতি সম্ভব হয় না।

বীরেন্দ্রনাথের আভিজাত্য

বীবেন্দ্রনাথ যথার্থ অভিজাত ছিলেন। বাহিবে-অন্তবে তাঁহার আভিজাত্য খর্ব্ব কবা তাঁহাব পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নাই। এই আভিজাত্য অর্থের ছিল না, এই আভিজাত্য পদমর্য্যাদার ছিল না—এই আভিজাত্য হৃদয়ের ঔদার্য্যেব—এই আভিজাত্য ছিল অদম্য ও নিষ্কলুষ প্রাণশক্তির। সেইজন্যই বীবেন্দ্রনাথ আত্ম-প্রচার কবিতে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি যদি রাজনীতিক জীবনে একটু নরম হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি সমধিক প্রচার হইত। কিন্তু ভিখারীদের সহিত নিজেকে মিশ্রিত করা তাঁহার ন্যায় অভিজাত পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ ও সম্মান-অপমানকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন। এই পৃথিবী হইতে তিনি ছিলেন উর্দ্ধে। সেজন্য এই পৃথিবীর উত্থান-পতনকে তিনি অবজ্ঞা করিয়া চলিতেন। তিনি জানিতেন, যে বস্তুর শক্তিতে তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ, নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো, ন শোষয়তি মারুতঃ। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽমশোষ্য এব চ, নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রোত্তর যুগের ঘটনাবলী

দেশপ্রাণের মৃত্যুর পর দেশে কত ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, কে সেগুলির হিসাব করে। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

(১) দেশপ্রাণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শা নভেম্বর পরলোক গমন করেন। যখন তাঁহাব চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই বলিলেই হয়, যখন শোকাকুল দেশবাসী শোক-সভার অনুষ্ঠান করিয়া মৃত বীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছিলেন, তখন (৪ঠা ডিসেম্বর) মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কাঁথি সহবে দরবার আহ্বান করিয়া বক্তৃতা দিতে দিতে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের উপদেশ দেন। দেশপ্রাণ জীবিত থাকিতে এক দিনও মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড পুনঃ স্থাপনের কথা শোনা যায় নাই। আব তাঁহাব পরলোক গমনের মাত্র কয়েক দিন পরে সেই মেদিনীপুবের সেই কাঁথি সহরে সরকাব পক্ষ হইতে পুনঃ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের কথা উঠিযাছিল। পরে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়।

(২) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুব বিভাগের প্রতিবাদ কবার ফলে উডিষ্যাবাসী নিরুত্তর হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালে মেদিনীপুর বিভাগেব কথা আব উত্থাপিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পরে 'New Orissa' (নিউ ওডিশা) পত্রিকা ২৭শা নভেম্বব তাবিখের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—It is interesting to recall the attitude of B. N. Sasmal, who though an Oriya by race, vehemently opposed the inclusion of the Oriya tract of Midnapore in Orissa. His death removes one of the most formidable opponents of the Oriya cause in Midnapore.

অর্থাৎ বি এন শাসমলেব মনোভাবের পুনরালোচনা আবশ্যক। তিনি যদিও জাতিতে উড়িয়া, তথাপি তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত উড়িয়া-প্রধান অঞ্চলেব উডিষ্যাব অন্তর্ভুক্তিকবণে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহাব মৃত্যু হওয়ায় মেদিনীপুরে জনৈক প্রবল উড়িয়া-স্বার্থ-বিরোধীর বিনাশ হইল।

এই নীচাশয়তাপূর্ণ মন্তব্য উড়িষ্যার যে শিক্ষিত সমাজের অভিমত ছিল, তাঁহারা যে কি শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তখনও সংস্কৃতির কোন্ নিম্নতম সোপানে পড়িয়া রহিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

'New Orissa' (নিউ উড়িষ্যা) পত্রিকা ২৮শা নভেম্বরের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—Sasmal is dead, and while we deplore his death, let us hope that with him has died the attitude of scorning one's own nation

অর্থাৎ শাসমল মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে স্বজাতি-বিদ্বেষের বিনাশ হইয়াছে বলিয়াও যেন আমরা আশা করিতে পারি।

শাসমলের মৃত্যুতে উড়িষ্যাব শিক্ষিত-সমাজ সুখী হইয়াছিলেন!

'New Orissa' (নিউ ওড়িষ্যা) পত্রিকা ২রা ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—We recognise that there is necessity for a consistent and continuous agitation for getting Singbhum, Phuljhor and Midnapore into Orissa. অর্থাৎ সিংভূম, ফুলঝোর ও মেদিনীপুর জেলাকে উডিষ্যার অন্তর্গত করিবার জন্য অবিরাম আন্দোলন চালনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি।

এ কথার সোজা অর্থ এই ছিল যে, শত্রুর নিপাতে তাহার পুরী দখল করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। এইরূপ মনোভাবের জঘন্যতা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

(৩) দেশপ্রাণ শাসমলের জীবনকালে, এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও যে সমস্ত পত্রিকা, যে সব ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে, সম্প্রদায়গতভাবে, অভিমত পার্থক্যের অজুহাতে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া অলীক কুৎসা প্রচার করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হন নাই, শাসমলেব প্রতি কেহ অযথা দোষারোপ করিলে বা অন্যায় অবিচার করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে বেশ উল্লাস অনুভব করিতেন, তাঁহারাই আবার তাঁহার মৃত্যুর পরদিন, man wars not with the dead (মৃত ব্যক্তির সহিত কেহ সংগ্রাম করে না) হয়ত এই কথাটাই স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং শোকসভায় আন্তরিক না হইলেও বাহ্যিক শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর অনেকের সমাদর হইয়াছে—একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে সমাদরের একটা রকম আছে।

(৪) বীরেন্দ্রনাথের অকালে তিরোধানের পর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভের একাংশে লিখিয়াছিলেন—In him Bengal has lost a towering personality who alone was able, if any single Bengali is able, to restore the position of the province in the councils of India অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলা এক মহান ও বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষকে হারাইয়াছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যদি কোন একজন সক্ষম থাকেন, তবে একমাত্র তিনিই ভারতীয় কাউন্সিলে বাংলার মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ ছিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র এই মন্তব্য যে অসত্য তাহা নয়, বরং সর্ব্বাংশে সত্য। কিন্তু একথা তাঁহার মৃত্যুর পর না লিখিয়া তিনি জীবিত থাকিতে তদুদ্দেশ্যে তাঁহাব প্রচেষ্টায় সহায়তা করিলে শোভনীয় ও সমীচীন হইত। যেখানে বাংলার জাতীয়তাবাদী বলিয়া পবিচিত এক সুপ্রচারিত পত্রিকার মন-মুখেব এই পার্থক্য, সেখানে বাংলা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব হারাইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' অন্য এক স্থানে লিখিয়াছিলেন—Mr. Sasmal incurred a great deal of unpopularity for his staunch advocacy for what is known as the Bengal Hindu-Moslem Pact. অর্থাৎ শাসমল বাংলার হিন্দু-মুসলমান চুক্তি দৃঢভাবে সমর্থন কবার জন্য জনগণেব অনেকটা অসন্তোষ সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। ইহা ঠিক কথা নহে। কাবণ শাসমল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। তবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হিন্দুদেব অপেক্ষা কম ছিল। আর হিন্দু সমাজেব যাঁহারা প্রকৃত নিরপেক্ষ-বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদেব নিকট বীরেন্দ্রনাথ প্রিয় ছিলেন। তবে এই হিন্দু সমাজেব মধ্যে আবাব নানা শ্রেণী রহিয়াছে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি শ্রেণীগত ভেদ-বুদ্ধি-চালিত এবং যে সমস্ত ব্যক্তি কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া সাধারণেব কাজ করিতে আসে, তাহাদের নিকট বীবেন্দ্রনাথ প্রিয় ছিলেন না, অধিকন্তু ভয়ের কারণ ছিলেন এবং তাহারাই বাজনীতি-ক্ষেত্রে অন্যায় বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহাকে অতি হেয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। আর জনপ্রিয় হওয়ার মূল-সূত্র কি? জন-সাধারণের খেয়াল-মাফিক কাজ করা। যেখানে লোকে আজ স্বার্থসিদ্ধি হইলে প্রশংসা করে, কাল একটু স্বার্থহানি হইলে অভিসম্পাত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে জনপ্রিয় হওয়া—এ-কথার কোন অর্থ হয় না।

(৫) গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য কংগ্রেস জাতীয় দলের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃগণ "বিদ্রোহী" আখ্যা দিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ মালব্যজীর সহকর্ম্মী ছিলেন। কাজেই বীরেন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির মাপ-কাঠিতে বিদ্রোহী বটে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিলেন, "শাসমল মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিলে কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ হইতেন।" এই জাতীয় অভিমতকে শুধু হীন বলিলেই যথেষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন—"এত দিনে এ বুদ্ধি তোমাদের কোথায় ছিল? কেন এত দিন 'বিদ্রোহী' 'বিদ্রোহী' বলিয়া কুৎসিত কলরব তুলিয়াছিলে? কেন এত দিন স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার নাই যে, শাসমল যখন দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার বিজয়েই কংগ্রেসের বিজয় হইবে, শাসমলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে না। যাহাকে হউক্ এক জনকে দাঁড় করাইয়া শাসমলকে বিব্রত করিতেই হইবে—কেন এই অনুপযুক্ত চেষ্টা হইতে তোমাদের অতি-ভক্ত অনুচরবৃন্দকে নিবৃত্ত কর নাই? অযথা ব্যর্থ প্রতিযোগিতা করিয়া কেন তোমরা তাঁহার অবসানকে আগাইয়া দিলে?"

(৬) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ও ভারতবর্ষের তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরউইন-এর মধ্যে এক চুক্তির ফলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে। তখন আন্দোলন-সম্পর্কীয় রাজবন্দিগণ মুক্ত হন। সে-সময় দেখা গিয়াছে, বাংলার তথাকথিত নেতাবা, এমন কি, পরে যাঁহারা বাংলার কংগ্রেস-তরণীর কর্ণপরিবাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদেব অনেকে বাংলার নানা স্থানে ও বাংলার বাহিরে গিয়া শাসমলের হাতে-গড়া মেদিনীপুরের নামে বাংলাদেশে তাঁহাদের কাজের বহর দেখাইয়া অভিনন্দন কুড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। তখন বা তাহার পরেও তাঁহারা মেদিনীপুরের নিষ্পেষিত জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা লাঘবের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; এমন কি, কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০।৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলায় গিয়া সাধারণের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেও ইচ্ছা করেন নাই। তখন যে পুরুষসিংহ শাসমল জীবিত এবং তিনি যে অসংখ্য প্রকারে মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য দিবারাত্র ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

শাসমলের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরের সরলমনা কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার আশায় কেহ-কেহ ধীরে-ধীরে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মেদিনীপুরের তোষামোদ করিয়া কাজ হাঁসিল করিবার জন্য মেদিনীপুরকে বাংলার বারদৌলি বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তরের হীনম্মন্যতা (inferiority complex)। তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শাসমলের হাতে-গড়া, বাংলার তৎকালীন রাজনীতির পুণ্যভূমি, বাংলার সর্ব্বপ্রকার মুক্তি-আন্দোলনে মস্তিষ্ক-দাতা মেদিনীপুর গুজরাটের বারদৌলি অপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। যদি গুজরাটের লোকের দরকার হয়, তবে তাহারা বলুক বারদৌলি গুজরাটের মেদিনীপুর। বাংলার পরশ্রীকাতর, জাতিবিদ্বেষপরায়ণ, ফাঁকিদারি-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বীরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্যবোধ, একনিষ্ঠতা, নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও ফাঁকিদারী-মনোবৃত্তি-সহনে অসহিষ্ণুতা সহ্য করিতে পারে নাই। বাংলার কংগ্রেসে বীরেন্দ্রনাথের বিরোধী দল নিতান্ত অকারণে তাঁহার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল, আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে অযথা অতি-হীন রকমের কলহ সৃষ্টি করিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথের বীরত্ব এইখানে। এক দিকে তাঁহাকে যেমন প্রবল বিদেশী বৃটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহাকে স্বার্থলোলুপ, জাতি-বিদ্বেষী ও হীনচক্রান্তকারী ব্যক্তিদিগের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এইভাবে অনবরত সংগ্রাম কবিতে-কবিতে তাঁহার যোদ্ধ-জীবনের অকালে অবসান ঘটিয়াছে। এই সংগ্রামগত-প্রাণ পুরুষপুঙ্গবই দেশপ্রাণ শাসমল।

(৭) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণনগর অধিবেশনে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে হিংসাবাদীদিগের কার্য্যের ভাল-মন্দের যে বিচার করিয়াছিলেন, তাহা সভায় পাঠ করেন নাই। তিনি অহিংস কংগ্রেসের মধ্যে হিংসাবাদ সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং হিংসাবাদীদিগকে অহিংস কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য তীব্রভাবে বলিয়াছিলেন। আমরা আজ (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে) ধরিয়া লইতে পারি, যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত হিংসাবাদীদিগের সম্পর্কে শাসমলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কুৎসিত কলহের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিংসাবাদের পোষক, এবং তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁহাদের স্থান থাকা উচিত ছিল। আজ (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে)

তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকে হিংসাবাদে আর বিশ্বাস নাই বলিয়া গান্ধীজীর নিকট বলিয়াছেন। এইখানেই বিজয়ী শাসমল মরণের পরও বিজয়ী। কারণ, তাঁহার সাবধানবাণী একদিন যাঁহাদের উদ্দেশে বর্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিসে তাঁহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে জানি না। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, যে দূরদর্শী শাসমল একদিন অকপটে তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া ব্যক্তিগত বিরোধিতার লেশমাত্রশূন্য হইয়া ক্ষোভ-মিশ্রিত তীব্র ভাষায় স্বীয় আবেগময় অনুযোগ আপনাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আজ স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে কি? যদি বর্ত্তমান সময়ে (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে) বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে যথার্থই হিংসাবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের অবসান হইয়া থাকে, তবে একথা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহারা শাসমলের নীতি ও কর্ম্ম প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাঁহার যথার্থ স্মৃতি-পূজায় রত হইবেন। আর যদি বাংলার কংগ্রেসে কোন কারণে এমন অবস্থার উদ্ভব না হইয়া থাকে, তবে একথা ঠিক যে, এমন একদিন আসিবে যে-দিন সকলকেই বাহিরে-অন্তরে অতি-মর্ম্মান্তিক ভাবে হা-হুতাশ করিয়া বলিতে হইবে—আমরা শাসমলের সহিত বৃথা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া কি অন্যায় করিয়াছিলাম।

(৮) দেশপ্রাণ শাসমলের কৃতিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলোপ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা দেশেই কিরূপ চেষ্টা (না, চক্রান্ত?) চলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে:

গত ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর তারিখে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিক দিবসে আকাশবাণী হইতে তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম সম্পর্কে কলিকাতার ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ইংরেজী ভাষণ প্রচার করা হয়। ঐ দুইটি ভাষণেই সর্দ্দার প্যাটেল ভারতে প্রথমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল করেন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

সর্দ্দার প্যাটেল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। আর দেশপ্রাণ শাসমল আন্দোলন চালনা করেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর ২১শে ও ২২শে অক্টোবর তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় ইউনিয়ন বোর্ডের অসারতা প্রদর্শন করিয়া যুক্তিপূর্ণ দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তুষার-বাবু সে-কথা

ভুলিয়া গিয়াছিলেন অজ্ঞানতায়, না, হিংসায়, না স্বার্থপূরণের চেষ্টায়? সর্দ্দার প্যাটেলের আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল সমগ্র কংগ্রেস ও গান্ধীজীর শক্তি ও প্রভাব। আর দেশপ্রাণ শাসমল পরিচালিত আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল শুধু মেদিনীপুরবাসীর দুর্জ্জয় সাহস, অকপট স্বদেশ-প্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও অসাধারণ তিতিক্ষা। সে সময় এমন কি বাংলার কংগ্রেস ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও দেশপ্রাণ শাসমলের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার প্যাটেল ও গান্ধীজীকে গুজরাটে খাজনা বৃদ্ধি রোধ আন্দোলনে বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষ (অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ) করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দেশপ্রাণ শাসমল মিথ্যা ও অন্যায়ের সহিত সম্পূর্ণ আপোষ-বিরোধী থাকিয়া নিজের জিদ ষোল আনা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বাঁচিয়া থাকিতে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা চলিবে না।" সত্যসত্যই তাঁহার জীবদ্দশায় অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড থাকিলেও মেদিনীপুব জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড চালু করা প্রতাপশালী বৃটিশ নরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এখানে স্মরণীয় যে, গান্ধীজীও তাঁহার জীবনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

দেশবন্ধু দাশ, অধিকাংশ বাঙ্গালী, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও গান্ধীজী দেশপ্রাণ শাসমলের কৃতিত্ব, সাহস ও সংগঠনী শক্তির সমাদর করেন নাই। কেন? হিংসায় ও এই আশঙ্কায় যে, দেশপ্রাণ শাসমলের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বারদোলী আন্দোলনের তিন বৎসর পরে সর্দ্দার প্যাটেলকে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনের সভাপতি করা হয়, কিন্তু দেশপ্রাণ শাসমল একক শক্তিতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন বিরোধী আন্দোলন সফল করিয়া তুলিলেও, অন্যান্য জেলায় ঐ আন্দোলন চালাইবার এবং বৃটিশ সবকারকে সমগ্র দেশ হইতে আঘাত কবিবার জন্য তাঁহার সহিত পরামর্শ করাও কেহ সমীচীন মনে করেন নাই! হিংসানলে জ্বলিয়া বাঙ্গালী মরণের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর ভারতবাসী খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতা পাইয়াও তাহা যে অনতিবিলম্বে হারাইবে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। যাহাদের হাতে দেশের শাসনশক্তি আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা অবাঞ্ছিত

ভোগসুখে এবং দেশের সুশাসন না করিয়া শাসনশক্তি হাতে রাখিবার কুৎসিত কূট কৌশলে নিমগ্ন হইয়াছে।

(৯) বাংলার যে-সব সংবাদপত্র লক্ষ্ণৌ হিন্দু-মুসলমান চুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা করে, তাহারাই আবার বাংলার হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সমর্থনের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে।

(১০) ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংবেজ এই তিনটি বিদেশী জাতি রাজত্ব করিত। সে সময় পর্ত্তুগীজ অধিকৃত এলাকা ছিল গোয়া, দমন ও দিউ ; ফরাসী অধিকৃত এলাকা ছিল চন্দননগর, ইয়ানাম, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী সমস্ত অংশ ইংরেজ শাসনাধীনে ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম আবম্ভ কবে, তখন তাহার ধারণা ছিল এদেশ হইতে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করিতে পারিলে, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসী শাসনও এখান হইতে আপনা হইতেই বিদায় লইবে। পর্ত্তগীজ ও ফরাসী এই দুই জাতি ভারতবর্ষে তাহাদের অধিকৃত এলাকা শাসনের জন্য সম্পূর্ণরূপে না লইলেও অনেকাংশে এদেশের বৃটিশ শাসন শক্তির উপর নির্ভর করিত।

ভারতীয় কংগ্রেসের কোন শাখা পর্ত্তুগীজ ও ফরাসী অঞ্চলগুলিতে ছিল না। তবুও সে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করিত। ইংরেজ ভারতবর্ষের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করিত, প্রধানতঃ সেই অঞ্চলে কংগেস আন্দোলন চালাইত।

শাসমল অখণ্ড ভাবতবর্ষকে বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে এদেশের সমস্ত নরনারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন।

শাসমল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ডের যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, যে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গান্ধীজী-চালিত কংগ্রেস শাসমলের লোকান্তর গমনের পরেও তাহার ক্লীবত্ব-ব্যঞ্জক "না-গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি পরিত্যাগ করে নাই. সেই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফল হইল ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাগ এবং তাহার অনিবার্য্য সহজাত ফল হইল বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া ঘোষণা করে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ তাহাদের লাহোর অধিবেশনে ভারতবর্ষ বিভাগ করিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠনের দাবী উত্থাপন করে। উহার কিছুদিন পরে মাদ্রাজের অন্যতম নেতা ও গান্ধীজীর বৈবাহিক শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী মুসলিম লীগের দাবী ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন এবং ভারতবর্ষের মস্তিষ্ক বাংলা ও বাহুবল পাঞ্জাবকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ও ক্ষমতা হাতে লইবার জন্য "রাজাগোপালাচারী ফরমূলা" নামে কথিত এক সূত্রের মাধ্যমে কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করেন। এই সূত্র রচনায় গান্ধীজীব হাত বা ইঙ্গিত ছিল না—একথা মনে করিতে কুণ্ঠাবোধ কবি।

বীরেন্দ্রনাথেব পরলোকগমনের পর কংগ্রেসিগণ বাংলার আর একটি ভীষণ ক্ষতি সাধন করিয়া ভারতবর্ষ বিভাগ তথা বাংলা বিভাগের পথ সহজ করিয়া দেন। ১৯৪১ সালে কংগ্রেসিগণ দেশবাসীকে সেন্সাস বয়কট করিতে পরামর্শ দেন। (তাঁহারা ১৯৩১ সালেও সেন্সাস. বয়কট কবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।) বাংলাব কংগ্রেসানুরক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কংগ্রেসিগণ মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসেব বাণী পৌছাইতে পারেন নাই—ফাঁকি দিয়াছিলেন বা মুসলমানদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ফলে সেন্সাস বয়কট করিবার পবামর্শ সকল হিন্দু না হইলেও বহুসংখ্যক হিন্দু পালন করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ ঐ পবামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য দেখাইবার সর্ব্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেন্সাসের ফল বাহিব হইলে দেখা যায় যে, বাংলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান জেলার হিন্দু কংগ্রেসিগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য পদ অধিকার করিতেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ-নিজ এলাকার মুসলমানদিগকে কংগ্রেসানুরাগী করিতে চাহিতেন না। এদিকে মুসলিম লীগ তাহার সাম্প্রদায়িক প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইত। ফলে ঐ সকল জেলার ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার মুসলমানগণ কংগ্রেস অপেক্ষা মুসলিম লীগের বচন শুনিতে অধিক আগ্রহী ও অভ্যস্ত হয়। ইহাতে তাহাদের মধ্যে এই ধারণাও সৃষ্টি করা সহজ হয় যে, বাংলাদেশ মুসলমানদেরই দেশ।

মুসলিম লীগ তাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রচার কার্য্য বন্ধ করে নাই। বাংলার মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির হিন্দু কংগ্রেসিগণ যদি মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে থাকিতেন, তবে মুসলিম লীগের প্রচার তাহাদের মধ্যে সহজে ও দ্রুত ফলদায়ক হইত না। তাহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য হইতেও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য হিসাবে দেখা যাইত। কিন্তু এই সমিতিতে দুই-চারিজনের বেশী মুসলমান সদস্য ছিলেন না। এখানে আর এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর শিক্ষিত নামধারী বাঙালী হিন্দুদের অনেকেই যখন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়া জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন এবং জাতিবিদ্বেষ পোষণ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থা স্থির করিতেন, তখন তাঁহারা ও তাঁহাদের সমগোত্রীয়েরা যে ভোটগ্রহণের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মুসলমানদের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" নীতির সমর্থক একজনও নির্ব্বাচন-প্রার্থী বাংলাদেশ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচন লইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে গান্ধীজী ও তাঁহার সমর্থকদের কুটিল ও বাঙালী-বিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হইয়া পড়ে। সে-সময় গান্ধীজী ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত কংগ্রেসিগণ অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। এই সব কারণে বাংলা ও বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর তাঁহাদের ক্রোধ পোষণ করিয়া থাকা অসম্ভব ছিল না। ফলে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লোক গণনার সময় উহার বয়কটে বাঙালী হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের পথ পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও হয় তাঁহারা নিজেরা সেন্সাস বয়কট করার সরাসরি পরামর্শ দিয়াছিলেন, অথবা পটভূমিকায় থাকিয়া সেন্সাস বয়কটের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মনে করা যায়।

বীরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরবর্ত্তী অন্যতম মর্ম্মান্তিক ঘটনা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারত-বিভাগ আর উহার অনিবার্য্য সহজাত ফলস্বরূপ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ। যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিরোধের জন্য দেশপ্রাণ শাসমল জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার পরিণতি ভারত-বিভাগ!

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ দীর্ঘকাল ধরিয়া অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবী করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই, এমন কি, গান্ধীজী স্বয়ং বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারত-বিভাগে সানন্দে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আচরণ সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে একথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইবার মত তাঁহাদের মনের অবস্থা ছিল না। গান্ধীজী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দেশবিভাগ সম্পর্কিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন এবং উহা সমর্থন করিবার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধও করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (দেশ বিভাগ সম্পর্কিত) প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিলে, এমন কি, সংশোধন কবিলে কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটিব উপর আস্থার অভাব সূচিত হইবে এবং সে অবস্থায় তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।"

(১১) দেশপ্রাণ শাসমল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিবোধিতা করিয়াছিলেন এবং মেদিনীপুব জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন বন্ধ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার ইউনিয়ন বোর্ড অপেক্ষা জঘন্যতর গ্রাম পঞ্চায়েৎ শুধু মেদিনীপুব নয়, পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার নানা স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন।

(১২) যে সমস্ত কংগ্রেস-কর্ম্মী শাসমলের সহিত দেশের কাজ করিয়াছেন, যাঁহাবা শাসমলের অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আজ শাসমলের চরম বৈরীর পদলেহী।

বীরেন্দ্রনাথ অকালে সংসার-সমুদ্রের পরপারে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে বিধাতার কি মঙ্গলময় নির্দ্দেশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, অল্পবুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইতে চাই। সেই জন্য আজ বার-বার অন্তরের অন্তস্তল হইতে এই আকুল আহ্বানই বাহির হইয়া আসিতেছে—

ওহে বাংলার দুরন্ত সন্তান
আবার তুমি আসিবে ফিরে'।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

[১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শা মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে সভাপতিরূপে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিম্নোদ্ধৃত অভিভাষণ দেন।]

বাংলার সেবক ও সেবিকাগণ,

আপনারা আদেশ করিয়াছেন যে, আজ আমাকে এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সভাপতি হইতে হইবে। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আমার মত দীনহীন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আপনারা যে উচ্চ আসনে বসাইলেন, সেজন্য আপনারা আমার হৃদয়েব গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আজ আমি আপনাদিগকে আমার প্রাণের কয়েকটি কথা শুনাইব। আমাব এ অহঙ্কার নিশ্চয়ই নাই যে, আমি সেগুলিকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস কবি। তবে আমি এই কথা বলিতেছি যে, আপনাদেব এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় মহাসভায় আমি এমন কোন কথাই বলিব না, যাহা আমি আমার হৃদয়ের হৃদয়ে সরলভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমাব মনে হয়, আমাদের জাতীয় জীবনে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন আমাদিগকে প্রিয় এবং অপ্রিয় সকল কথাই জগতের নিকট নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। জানি না, সেজন্য কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিবে কিনা। যদি লাগে, তিনি যেন নিজ গুণে আমাকে রক্ষা করেন—আমি তাঁহার নিকট সেজন্য সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

বৎসরান্তে আমাদের রাষ্ট্রীয় বৃন্দাবনে আমরা সকলে সম্মিলিত—আজ আমাদের মিলনের দিন। আমার দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে আজ বাংলার কত দেবতাকেই উপস্থিত দেখিতেছি। কিন্তু স্মরণ করিতে এবং তদুপরি খুলিয়া

বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায় যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় বৈতরণী নদীর কাণ্ডারী যিনি, তিনি আজ আর আমাদের সহিত এখানে মিলিত হইতে পারিবেন না। বিধির এ বিধানের রহস্য কে বুঝিবে? বাংলায় আবার নূতন কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইতেছিল। বৃন্দাবন ছাড়িয়া বাঙ্গালী-পাণ্ডবগণের সারথি হইতে যিনি বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মধ্যপথে অপসারিত করিয়া বিধির কি কৃতিত্ব বাড়িয়াছে, তাহা আমি জানি না। আমি কেবল এই জানি যে, তাহার ফলে লর্ড বার্কেনহেডের বক্তৃতা বদলাইয়া গিয়াছে। হায়, হায়! বিধির বিধানে কি সময়াসময় নাই?

আর তুমিই বা এম্‌নি ক'রে, কি হিসাবে, কাহাকেও কিছু না ব'লে, নির্ম্মম হৃদয়ে আমাদিগকে হঠাৎ ছেড়ে গেলে? এতটুকু আশঙ্কার কথা যদি দু'দিন পূর্ব্বে কোন রকমে বাঙ্গালী জানিতে পারিত, তাহ'লে হে গুরু, হে বন্ধু, হে সতীর্থ, তাহারা যে ছুটিয়া গিয়া তোমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িত এবং তোমাকে সাশ্রুনয়নে নিবেদন জানাইত যে, তুমি এখন কিছুতেই তাহাদিগকে ছাডিয়া যাইতে পার না! সকলেব সকলই আছে, কিন্তু তুমি তো জানিতে, হে মহাপ্রাণ, বাঙ্গালীর তুমিই একমাত্র ভরসাস্থল! এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত বন্ধুত্ব তুমি কেমনে হঠাৎ ভুলিতে পারিলে জানি না!

অথবা তুমি কি সেইখানে গিয়াছ, যেখানে বাংলা তথা ভারতের অদৃষ্ট-লিপি লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ন্ত্রিত হয়? তুমি যে মর নাই, তাহা আমি বিশ্বাস করি। তোমার আত্মা যে আমাদিগকে ভুলিতে পারে না, তাহাও নিশ্চিত। সুতরাং পরলোকেও তুমি যে আমাদের বিধিলিপির দিকে দৃষ্টি রাখিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ইহলোকে তোমার যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্তই যখন তুমি অযাচিতভাবে আমাদিগকে দিতে পারিয়াছিলে, তখন পরলোকে তুমি আমাদের জন্য এইটুকু করিও যে, আমাদের বিধিলিপি যেন ক্রমে মঙ্গলময় হয়।

বিগত বৎসর বাংলার আরো কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বাংলার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়গণ বাংলার ইতিহাসে চিরদিনই অমর রহিবেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের নাম ভারতের নূতন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিরাজিত থাকিবে। বিশ্বাস ও আশা করি, দেশবন্ধুর

আত্মার সহিত ইঁহাদের আত্মা সম্মিলিত হইলে, বাংলা তথা ভারতের অদৃষ্ট-লিপি পরিবর্ত্তনের জন্য পরলোকেও সমবেতভাবে চেষ্টা চলিবে।

কি জানি কেন কিন্তু মনে হইতেছে যে, দেশবন্ধু প্রভৃতি অনেকেই আজ আমাদের এই রাষ্ট্রীয় বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে ধীর পদবিক্ষেপে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বাংলার অন্য যে সকল ব্যক্তি সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, মনে হইতেছে যে, তাঁহাদের অশরীরী আত্মাও আজ আমাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। শুনিয়াছি, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পরলোকেও ভুলিতে পারে না: স্বপ্নে দেখা দেয়—গভীর রাত্রে বিছানার পাশে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। যাঁহাদের কথা আমি এখানে বলিতেছি, তাঁহারা যে বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশকে ভালবাসিতেন—মনপ্রাণ দিয়া প্রেম করিতেন, তাহার প্রমাণ যে তাঁহাদের জীবনোৎসর্গেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! সুতরাং তাঁহাদের ভালবাসাব ধন—বাংলাব এই রাষ্ট্রীয় বৃন্দাবনে তাঁহারা যে আজ অলক্ষিতে উপস্থিত হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

তথাপি গভীব পরিতাপের বিষয় এই যে, মহামিলনের দিনে প্রকাশ্যে কিম্বা অলক্ষিতে আমাদের সহিত মিলিতে পাবেন নাই—আমাদের সোদর-প্রতিম সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি। যাঁহাবা ইঁহাদিগকে জানেন এবং ইঁহাদের সহিত যাঁহাবা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিযাছেন, তাঁহাবা কখনই বিশ্বাস করিবেন না যে, ইঁহাদেব দ্বারা কখনও কোন ব্যক্তি বা সমাজেব কোন অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমাদের শাসকগণকে কে সে কথা বুঝাইবে? তাঁহাবা মনে কবেন যে, তাঁহাদেব কর্ম্মচারিগণ ভুলভ্রান্তিব অতীত এবং তদুপরি তাঁহারা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরেব পোষ্যপুত্র। তাঁহাদেব এই ধাবণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা বাংলার দুইটি বিশিষ্ট ঘটনা হইতে আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কবিব। দুইটি ঘটনাই আমি যে জেলার অধিবাসী, সেই মেদিনীপুর জেলায় সংঘটিত হইয়াছিল।

বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যাব এণ্ডরু ফ্রেজার উড়িষ্যা হইতে কলিকাতা ফিবিতেছিলেন। খড়্গপুর হইতে দুই ষ্টেশন দূরে নারায়ণগড় ষ্টেশন অবস্থিত। তিনি যে ট্রেণে আসিতেছিলেন, সেই ট্রেণকে উল্টাইয়া দিবাব জন্য, সেই নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকট বোমা বসান হইয়াছিল। বোমাব মুখটা ভ্রমক্রমে মাটির দিকে বসান হইয়াছিল বলিয়া সে যাত্রা স্যার এণ্ডরু ফ্রেজার বাঁচিয়া যান। ইঞ্জিন ইত্যাদিতে বোমার যে বারুদ লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের এক্সপার্ট বলিয়াছিলেন যে তাহা পিক্‌রিক্ এসিড্। সে মোকদ্দমায়

সেসন জজের আদালতে আমি আসামী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমার এই সকল কথা স্মরণ আছে। নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে রেলের টাইম্-টেবিল ও কলিকাতার দৈনিক Statesman (ষ্টেট্স্ম্যান) কিম্বা Englishman (ইংলিশম্যান) একখানি পাওয়া গিয়াছিল। সংবাদপত্রে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের নির্গমনের বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং টাইম-টেবিলে লেখা ছিল তিনি কখন নারায়ণগড় ষ্টেশনে পৌছিবেন। কিন্তু পুলিশের এম্নি তদ্বির যে, তাঁহারা একজন মূর্খ অর্দ্ধ-সাঁওতালকে দিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন যে, তাহার সহিত একজন রেল-মকদ্দমের বিরোধ থাকায় তাহাকেই জব্দ করিবার জন্য বাজার হইতে কয়েক পয়সার পটকার বারুদ কিনিয়া আনিয়া তাহার অধীনস্থ রেল-লাইনে সে তাহা পুতিয়া দিয়াছিল ? ফলে দায়েরার বিচারে সকল আসামীর দীর্ঘ দ্বীপান্তরের হুকুম হয় এবং হাইকোর্টের আপীলে গভর্ণমেণ্টের কৌন্সিল মিঃ আর্ড্লি নর্টন প্রায় সকলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও, সকলের সম্বন্ধেই সাবেক রায় বাহাল থাকে। পরে আলীপুর ষড়যন্ত্রের মামলার সময় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যখন গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া-ছিলেন যে, এই স্বীকারোক্তি ও মোকদ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন বছরখানেক পরে সকল আসামীকেই গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হাইকোর্টে নর্টন্ সাহেব গভর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে সেই পক্ষে আপটন্ সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন এই মিথ্যা মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্টের সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

তারপর, নাড়াজোলের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা নরেন্দ্র লাল খান্ প্রভৃতির মামলা। ইহাতেও এক মিথ্যা স্বীকারোক্তি সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই স্বীকারোক্তি অনুসারে বেঙ্গলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী বোমা প্রস্তুত করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। সেই বোমা কামিনী নামক এক বারবনিতার বাটীতে মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ব্যবহারাজীবী মিঃ কে বি দত্ত মহাশয় প্রভৃতি আপন দলের লোককে দেখাইয়াছিলেন। এই মোকদ্দমাকেও শেষে গভর্ণমেণ্ট মিথ্যা বলিয়াই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং বিনা বিচারে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে আটকাইয়া রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট যে ভুল করিতেছেন না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে ? পরদার আড়ালে

কোনও গোয়েন্দা কিম্বা রাজকর্ম্মচারী যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া থাকে, তাহা যে :মিথ্যা হইতে পারে, তাহা ত এইমাত্র দেখাইলাম। সুভাষ ও সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী ও জনপ্রিয় বাঙালী যুবকগণকে বিনা বিচারে মান্দালয়ের অস্বাস্থ্যকব স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট যে জনসাধারণেব নিকট দিনে দিনে হেয় এবং ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হইতেছেন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। বাহিরে কোন চাঞ্চল্য পবিলক্ষিত হইতেছে না বলিয়া, সুভাষচন্দ্রের দুর্ভাগ্যে বাঙ্গালী যুবকগণেব হৃদয়েও যে গভীর অশান্তির ভাব উদয় হয় নাই, ইহা মিথ্যা কথা। গভর্ণমেণ্ট যখন এই সত্যের আবিষ্কাব কবিবেন, তখন হয়তো কোন কিছু সংশোধনের আব সময় থাকিবে না।

যাহা হউক, আজ এই মহামিলনের দিনে দুঃখেব সহিত হইলেও আপনাদের সভাপতি রূপে আমি সুভাষচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অভিনন্দিত কবিতেছি। আসুন, আমবা সকলে আজ দাঁড়াইয়া কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট তাঁহাদেব দৈহিক এবং মানসিক মঙ্গল কামনা কবি।

স্বরাজ মানে কি ?

স্বরাজ মানে কি ? ইহা কেবল আমাব একাব প্রাণেব প্রশ্ন নহে, ইহা আজ আমাদেব সকলেরই প্রাণেব প্রশ্ন। তাই আজ আপনাদেব সম্মুখে ইহাবই কথা সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত করিতেছি।

এই 'স্ববাজ' শব্দ বহু বৎসর ধবিয়া কংগ্রেস-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের বহু জননায়কও বহুবার বহুস্থানে ইহাব ব্যবহাব কবিয়াছেন। একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্ত্তমান সময়ে বাংলা তথা ভারতের আপামব সাধাবণেব নিকট এই শব্দ অত্যন্ত সুপবিচিত। কিন্তু ইহাব প্রকৃত অর্থ কি কিম্বা এই প্রাদেশিক সম্মিলনের মত বাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেব নিকট ইহাব প্রকৃত অর্থ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্পষ্টভাবে কোন স্থানে বলিয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। অধিকন্তু আমি অবগত আছি যে, কেহ কেহ ইহাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকের নিকট অনেক প্রকারের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ফলে স্বরাজ অর্থে কেহ কেহ যেমন বুঝিয়াছেন যে স্বকায়ে স্বর্গলাভ করা, তেমনি অন্য অনেকে মনে করেন যে, স্বরাজ হইলে বিনা খাজনায় অর্থাৎ বিনা দায়িত্বে যে যত পারে ভূসম্পত্তি

ভোগ দখল করিতে পারিবে। সুতরাং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় যে, স্বরাজ মানে কি তাহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে।

মানুষ কোন কিছু না বুঝিয়া উত্তেজনার বশে আলেয়াব পশ্চাতে ছুটিতে পারে। এমন কি, সে সময়ে তাহার দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া দিলেও নিমীলিত নেত্রে সে লম্ফ প্রদান করিতে বিবত হয় না। কিন্তু তাহাব সে অবস্থা যে অতি অল্পকালস্থায়ী বা সাময়িক, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যখন তাহার উত্তেজনা কাটিয়া যায়, সে যখন আলেয়াকে আলেয়া বলিয়া বুঝিতে পারে, সে যখন চক্ষু উন্মীলিত কবিয়া দেখিতে পায় যে, সে এতদিন অন্ধকারের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তখন তাহাব অনুতাপের সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন সে যাহাকে তাহাকে কটু কাটব্য প্রয়োগ কবিতে থাকে, নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গেব মুণ্ডপাত কবাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং তখন তাহার চিন্তার ধাবা ঠিক বিপরীতগামী হয। আমাদেব রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আমবা ইহাব ভূরি ভূরি প্রমাণ সকল প্রদেশে এবং সকল জেলাতেই পাইয়াছি। কিন্তু বাংলা তথা ভারতেব স্বরাজ সাধনাকে সাময়িক বা অল্পকাল স্থায়ী কবিবাব কামনা আমাদেব কাহারো হৃদয়েই স্থান পাইতে পাবে না। আমাদেব শত সহস্র বৎসরেব পুঞ্জীকৃত অবজ্ঞা ও অবহেলার কথা স্মরণ কবিয়া, তাহাব সহিত পৃথিবীব বর্ত্তমান দুর্দমনীয় পরস্বাপহরণের সঙ্ঘবদ্ধ আকাঙ্ক্ষাব কথা তুলনা কবিলে, আমবা সত্যই সে কথা কল্পনা কবিতেও ভীত হই। সুতবাং গোঁজামিল দিয়া, গোলে হবিবোল বলিযা, ক্ষণস্থাযী উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা কোন কিছু সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অন্ধকারে লম্ফ প্রদান কবিতে কবিতে আমাদেব স্বরাজ লাভ অসম্ভব। আজ আমি এইজন্যই বাংলাব এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে প্রশ্ন উপস্থিত কবিযাছি—'স্বরাজ মানে কি'?

শুনিয়াছি কেহ কেহ বলেন যে, এদেশেব genius ও culture অনুসারে এদেশেব স্বরাজেব স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারেব হইবে। আমিও সে সত্যে বিশ্বাস করি। বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের ইতিহাস চিরদিবই এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান কবিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বর্ত্তমান যুগে আমাদের কোন genius ও culture নাই এবং সেই কারণে কি এখন আমবা আমাদের স্বরাজেব স্বরূপ মনে মনেও কল্পনা করিতে পারি না? বলা বাহুল্য

যে, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী কোনদিনই genius ও culture-বিহীন ছিল না এবং এই বিংশ শতাব্দীতে তা'গদের একেবারেই সে অবস্থা নহে। তবে এখন তাহারা তাহাদের স্বরাজের অর্থ কি জানিবে না কেন কিম্বা জানিতে চেষ্টা করিবে না কেন? অবশ্য একথা অতীব সত্য যে, পৃথিবীর সকল জাতির স্বরাজের ধারণা যেমন যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, আমাদের স্বরাজের ধারণাও সেইরূপ ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু সেই পবিবর্ত্তনের আশঙ্কায় আমাদেব আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি আমবা আমাদের হৃদয়রাজ্যেও এখন কল্পনা করিতে পারিব না—ইহা কার্য্য বা যুক্তিব কথা নহে। কারণ প্রত্যেক স্ববাজ-সাধককে স্ববাজ-তীর্থে যাত্রা কবিবার পূর্ব্বেই খুলিয়া বলিয়া দিতে হইবে—তাহার গম্যস্থান কোথায়। তবেই সে সেজন্য মনে ও দেহে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পাবিবে। নচেৎ তাহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া যাইতেছি বলিয়া, সিমলা-শৈল পর্য্যন্ত শেষে টানাটানি কবিলে, সে কিছুতেই ততদূব যাইতে পারিবে না। আমাদের প্রকৃতি এমনি দুর্ব্বল যে, আমবা বহু বিষয় মনে মনে পরিষ্কাররূপে পরিজ্ঞাত হইয়াও, তাহা অনেক সময় কার্য্যে পবিণত করিতে পারি না। কোন ক্ষেত্রে আমাদেব দেহ অপাবগ হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং যে বিষয়ে আমাদেব হৃদয ও মন অমাবস্যাব মত অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন কিম্বা বডজোব ঊষাব আলোকের মত অস্পষ্ট ও অপবিস্ফুট, সে বিষয়ে যে আমাদিগকে পদে পদে পবাজয স্বীকার কবিতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু স্বরাজ সাধনায় পরাজয়কে পবাজিত কবিবাব জন্য প্রথম হইতেই জ্ঞান ও বুদ্ধিব দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বপ্রকাবে আমাদিগকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যাহাতে স্ববাজেব ভিত্তি বা বনিয়াদ চোরাবালিব উপব ভুলক্রমে প্রতিষ্ঠিত না হয, সেদিকে আমরা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা না কবিলে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কেহ কেহ হয়তো এখানে এই কথা উত্থাপন কবিবেন যে, স্ববাজের ব্যাখ্যা কবিতে গেলে, দেশে নানা রকমের রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইবে এবং তাহাতে এদেশবাসীর অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইতিমধ্যেই এইরূপ যুক্তিতর্ক বহুলোকের নিকট বহুস্থানে শ্রবণ করিয়াছি এবং সেইজন্যই আজ এখানে তাহার অবতারণা। প্রথমতঃ, ইহা আমার কল্পনার অতীত যে, স্বরাজের ব্যাখ্যার

জন্য এদেশে কখন কোন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইতে পারে। স্বরাজের ব্যাখ্যা করা মানে স্বরাজের আদর্শকে জনসাধারণের নিকট পরিস্ফুট করিয়া ধরা এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে স্বরাজ লাভের পন্থার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই আদর্শের সহিত ভারতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোনও রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের অনৈক্য হওয়া একেবারেই সম্ভবপব নহে। ধর্ম্মেব পন্থা বিভিন্ন হইলেও ধর্ম্ম যেমন সকল ধার্ম্মিকেব নিকট এক, তেমনি স্বরাজ লাভের পন্থা সম্বন্ধে ঘোরতব মতভেদের সুযোগ থাকিলেও, স্বরাজের আদর্শ সম্বন্ধে সকল স্ববাজীই একমত বহিয়াছেন এবং চিবদিন একমত থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, কেহ যদি কোন স্থানে ইহাব ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে দেখিতে পান, তবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, তিনি জনৈক মেকি বা গোয়েন্দা স্বরাজীর নকল অভিনয় দর্শনে বৃথা সময নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাব স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের মত পবাধীন জাতিব সুদীর্ঘ স্বরাজ-সাধনায় একপ ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটিবে না, ইহা কবিব কল্পনা—বাস্তব জীবনেব কথা নহে। আমাদিগকে এই শ্রেণীর স্বরাজীগণকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা কবিতে হইবে। ইহাবা পৃথিবীর ইতিহাসে কখন কোন স্থায়ী অনিষ্ট সম্পাদন কবিতে পাবে নাই, এখানেও পাবিবে না। তৃতীয়তঃ, কোনও স্ববাজ-কামীব এমন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় যে, কতকগুলি পবগাছাকে লইয়া যেমন-তেমন কবিয়া একটী স্ববাজ্য দল এদেশে গড়িয়া উঠুক। তাহাব বিষময় ফল কল্পনা কবিতেও শরীব শিহবিয়া উঠে। অবিবাম আপোষ মীমাংসাব দ্বাবা পৃথিবীব কোন বড কাজ কখনও সম্পাদিত হয নাই, ভাবতেব স্ববাজলাভও কখন তাহার দ্বাবা সংসাধিত হইবে না। অতএব আমাদের আদর্শ ঠিক করিয়া আমাদিগকে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে হইবে এবং তাহাতে এদেশে কোনও গুরুতব দলাদলির সম্ভাবনা নাই। থাকিলেও, বাংলা তথা ভাবতেব ভবিষ্যৎ মঙ্গলেব জন্য আমাদিগকে তাহা ভুলিতে হইবে। বর্ত্তমানের সম্ভবপব সামান্য অস্থায়ী অমঙ্গলেব জন্য, ভবিষ্যতেব সুনিশ্চিত সুবৃহৎ স্থায়ী মঙ্গলেব মস্তকে সজ্ঞানে কুঠাবাঘাত করা বিবেচকের কার্য্য নহে।

এই সম্মিলন বাংলার একটি প্রধানতম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে বাংলা তথা ভারতেব রাষ্ট্রীয় স্ববাজের কথাই বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। এ জগতে প্রত্যেক জিনিষেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। আইন-আদালতে যেমন সঙ্গীতচর্চ্চা

হয় না, তেম্‌নি ধর্ম্মমন্দিরে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ। আবার যোদ্ধার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের চিন্তা করিতে নাই, তেমনি গৃহস্থের পক্ষে স্বগৃহে যুদ্ধক্ষেত্রের কোন ভাবনা হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে চিন্তার ধারা যেমন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্টতা লাভ করিতে অক্ষম হয়, তেমনি কর্ম্মের পদ্ধতিও তাহাতে গতিহীন স্রোতস্বতীর মত শত-সহস্র শৈবালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে ইহা হয়তো সত্য যে, বিশ্বপ্রেমিক পরম ধার্ম্মিক সিদ্ধ মহাপুরুষগণের ক্ষেত্রে এ সকল কথা প্রযোজ্য নহে, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের জীবনকে—এমন কি, এই বিশ্বের কোন কিছুকে বিভিন্ন compartment-এ বিভক্ত করিতে পারেন না। তাঁহারা এই দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে, এক বিরাট চিরন্তন অবিনশ্বর সমন্বয় আবিষ্কার করিয়া, তাহাতে আপনাদিগের শ্রীচৈতন্যকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। বলিতে কি, তাঁহাদের নিকট আধ্যাত্মিক স্বরাজের তুলনায় রাষ্ট্রীয় স্বরাজ একটি নিকৃষ্ট আদর্শ। কিন্তু মানবজাতি ক্রমবিকাশের যে স্তরে বর্ত্তমান সময়ে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ এ জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের মতামতের জন্য এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের উদ্বিগ্ন হইবার কোনও আবশ্যকতা দেখি না।

আমি এখন বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় স্বরাজ বা politicsকে উৎকৃষ্টতর আধ্যাত্মিক স্বরাজে পরিণত বা spiritualize করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং তাহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টার দ্বারা স্বল্প সময়ে সম্পাদিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। জগতের নিকৃষ্ট politicsকে উৎকৃষ্টতর spirituality-র দ্বারা সংশোধন করিতে হইলে, প্রথমে সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতিকে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের সমস্যা জগতের politic কে spiritualize করা নহে—আমাদের সমস্যা আমাদের সনাতন চিরপ্রচলিত সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সময়োপযোগী করিয়া ধীরে ধীরে politicalize করা। তাহাতে হয়তো আমাদের তথাকথিত স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিব এবং তদ্দারা হয়তো নিকট ভবিষ্যতে জগতের কিছু ক্ষতি হইবে, কিন্তু সেজন্য আমরা কাহারও নিকট দায়ী হইতে পারি না। স্বাধীন জাতির রাজদ্বারে যেমন পরাধীন ব্যক্তি জনৈক গোলাম বা ক্রীতদাস, তেমনি পরাধীন জাতির ধর্ম্মেও কোন অধিকার নাই। তাহাদের ধর্ম্মের ধারণাকে তাহাদের শাসকদিগের শাসনযন্ত্রের উপযোগী করিয়া গড়িতে হয়। তাহাদের

ধারণা কোনও কারণে যদি সেই শাসনযন্ত্রকে অবহেলা বা অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহারা রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারা বহুস্থানে বহুবার এইরূপ রাজদ্রোহী বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে। এইজন্যই কোন কোন স্থলে সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বরাজ সম্ভব হইলেও, সংসারধর্ম্মে থাকিয়া জাতিগতভাবে আধ্যাত্মিক স্বরাজ লাভ করা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বপ্নের কাহিনী। বস্তুতঃ, যে আধ্যাত্মিক স্বরাজলাভ করিয়াও আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সমানভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সে আধ্যাত্মিক স্বরাজের স্থান অন্য যেখানেই থাকুক্ না কেন—এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে তাহার কোন স্থান নাই। সুতরাং বেদ-বেদান্ত ও কোরাণ-বাইবেলের স্বরাজ কিরূপ কিম্বা মানবাত্মার মুক্তি কোন্ স্বরাজে হইবে কিম্বা স্বরাজ অপেক্ষা independence সঙ্কীর্ণ কিনা, এ সকল বিষয়ের আলোচনা আমি এখানে করিব না স্থির করিয়াছি। আমার দেহ আমার আত্মার পীঠস্থান। আমার দেহের আষ্টেপৃষ্ঠে পরাধীনতার যে কঠিন নিগড় সর্ব্বদা আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে আমাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। তারপর আমার আত্মার কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে আমি অধিকারী হইব। কারণ যে ব্যক্তি তাহার নশ্বরদেহের জ্বালা-যন্ত্রণা বিমোচনে অপারগ, সে ব্যক্তির মুখে তাহার অবিনশ্বর আত্মার মঙ্গল-চিন্তার কথা শোভা পায় না। তবে আমি একথা একেবারেই বলিতে চাহি না যে, জাতীয় জীবন গঠনে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা কিম্বা পরলোকের বার্ত্তায় আমাদের কোনও আবশ্যকতা নাই। আমি এই বলিতেছি যে, স্বরাজের ব্যাখ্যার সময় সে সকল বিষয়ের অবতারণা না করাই বিধেয়।

স্বরাজ মানে কি? আমাদের স্বরাজের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত? আজ বাংলার এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে বাঙ্গালী জাতিকে আমি কোন প্রকারে অপমানিত করিতে চাহি না। বাঙ্গালীর genius ও culture যে বিশেষভাবে এই বিংশ শতাব্দীর পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, আপনাদের সভাপতিরূপে আজ আমার তাহাকে কোনও কারণে সংযত করিবার ইচ্ছা নাই। জ্বলন্ত অঙ্গারকে কেহ কখন ভস্মাবৃত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল করিতে পারে নাই, দাবানল কখনও ধামাচাপায় নির্ব্বাপিত হইবে না। আপনাদের এই দীনহীন দুর্ব্বল সভাপতি তাই আজ বিনীতহৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, বাংলা তথা ভারতের

স্বরাজের আদর্শ অন্য কিছুই নহে—কেবল ভারতবাসী তেত্রিশ কোটী নরনারীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন। মাতার গর্ভে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে মা বলিবার যেমন প্রত্যেক জীবের জন্মগত অধিকার আছে, তেমনি যে ভূমিতে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাও তাহার একান্ত নিজস্ব। তাহাকে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি বা ভয়াবহ পদবিক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার তাহার Divine Right রহিয়াছে। এইজন্যই বৃক্ষের পক্ষী নূতন অধিবাসীর সমাগমে চঞ্চল হয় এবং জঙ্গলের মাতঙ্গ নূতন স্বজাতির আবির্ভাবে তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য তর্জ্জন-গর্জ্জনে পৃথিবী প্রকম্পিত করে। সুতরাং এই পুরাতন—বহু পুরাতন ভারত ভূমিতে যে অসংখ্য নরনারী বংশ-পরম্পরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সেই জন্মভূমিকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন করিবার Divine Right তাহাদের নাই বা থাকিবে না কেন?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য একটা আদর্শ রহিয়াছে এবং তাহার নাম—Equal Partnership within the British Empire অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া সমান অধিকারের অধিকারী হওয়া, আমাদের সেই আদর্শেরই উপাসক হওয়া কর্ত্তব্য। কাহাকেও বোধ হয় স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, আমি এখানে কেবল আদর্শের কথাই আলোচনা করিতেছি। সেই আদর্শের হিসাবে এই দুই প্রস্তাবের মধ্যে কোন্‌টি যে হীনতর, তাহা অন্ততঃ বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। Equal Partnership এর আদর্শ যদি পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা উচ্চতর হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষকে না রাখিয়া, ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশ জাতিকে রাখিবার প্রস্তাব করিলে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিত না। কিন্তু আজ যদি আমি এখানে সে প্রস্তাব উত্থাপন করি, তবে শুধু ভারতের বাহিরের লোক নহে—অগণ্য শিক্ষিত ভারতবাসীই আমাকে বাতুল বলিয়া বিদ্রূপ করিবে। তারপর, Equal Partnershipএ কেবল আমরা সম্মত হইলেই চলিবে না, তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও সরল অন্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলে এখনো দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও, সে দেশে কালা আদমি ভারতবাসীর যে কোন অধিকার নাই, তাহা তাহারা সুস্পষ্টভাবেই ক্রমে প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়াস পাইতেছে। এমন কি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের mother country ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভারতের

ছাত্রগণ যে foreigner, তাহা সেদিন আমাদের বিশ্ব-বিশ্রুত সাম্রাজ্যবাদী ভারতসচিব স্বয়ং লর্ড বার্কেনহেডই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি বিশ্বাস করি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যদি কোনও অন্তঃকরণ থাকে, তাহাকে এ বিষয়ে সরল ও সহজ করিতে হইলে, আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বলা বাহুল্য যে, লাভালাভের দিক দিয়াই আমি শেষের কথা কয়টা বলিলাম, আদর্শেব দিক দিয়া সে সকল কথা উঠিতেই পারে না। কারণ, আদর্শের নিকট লাভালাভ নাই, কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্রও নাই। যাহা আদর্শ তাহা নিত্য, অবিনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়। অলাভে বা অকালে বা অপাত্রে তাহার যেমন বিনাশ নাই, তেমনি লাভে বা সুসময়ে বা সুপাত্রে তাহার কোনও রূপান্তব ঘটে না। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, বাংলা তথা ভারতের যে আদর্শ-স্বরাজের কথা এখানে বর্ণনা কবিলাম, তাহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হইয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত প্রচণ্ড প্রতাপে তেত্রিশ কোটি পরাধীন ভাবতবাসীর হৃদয়-মনকে শীঘ্রই উদ্ভাসিত করিবে।

স্বরাজ কোন্ পথে ?

স্বরাজ মানে কি অর্থাৎ স্বরাজের আদর্শ আমাদেব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আমরা বিবেচনা করিলাম। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কি উপায়ে আমরা সেই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

আমার মনে হয়, স্ববাজ লাভেব পন্থা লইয়া এদেশে যে সকল মতভেদ পবিলক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কারণ স্বরাজেব আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেব পরিষ্কার কোন ধারণা নাই। কেবল তাহাই নহে, স্বরাজের আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা না থাকায়, আমরা অনেকে স্ববাজলাভের পন্থা সম্বন্ধে short cut অন্বেষণ করিতে কবিতে প্রায় পাগল হইতে বসিয়াছি। তাহা না হইলে কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না যে, যে ব্যক্তি বুঝিয়াছে স্বরাজ অর্থে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সে ব্যক্তি কি করিয়া বলিতে পাবে—Trust England !' সুতরাং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের নিকট কোন্ কোন্ পন্থা অবশ্য পরিহার্য্য, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সকল পন্থাই এক দোষে দূষণীয় হইতে পাবে না। কতকগুলি হয়তো ফলদায়ক নহে, কতকগুলি নীতি-বিগর্হিত

এবং কতকগুলি হয়তো দুই দোষেই দূষিত। আমরা এখন সেই সকল পন্থার আলোচনা করিব, যাহা স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

প্রথমতঃ, Trust England এবং খাঁটি Co-operatorএর দল স্বরাজ লাভের জন্য তাঁহাদের হস্তপদের সামান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলী সঞ্চালনেও প্রস্তুত আছেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংলণ্ড আমাদিগকে যখন যাহা অনুগ্রহ করিয়া দান করিবে, আমরা যদি তখনই তাহা সুবোধ বালকের মত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আগামী কল্য প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা স্বরাজ লাভ করিব। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস ও মনুষ্যের প্রকৃতির যে সংবাদ রাখে, সে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা না করিয়াই বলিবে যে, এই পন্থা কস্মিনকালেও ফলদায়ক হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এখানকার Liberals, Independents ও Responsivist-গণকে আমি একপর্য্যায়ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। ইঁহাদের রুচি এই যে, কাউন্সিল গৃহে যখন যে কোন মুখরোচক আহার্য্য পাওয়া যায়, তখনই তাহা আনন্দেব সহিত গলাধঃকরণ করা উচিত এবং চাকরি-নোকরি সম্বন্ধে যখন যেখানে যাহা চক্ষের সম্মুখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা পকেটস্থ করিতে হয়। ইঁহাদের নীতি এই যে, কাউন্সিল প্রাসাদে মনোবেদনার সময় গভীব গর্জ্জন করিবে—এমন কি, sweet reasonablenessএর দ্বাবা তোমাদের দুর্দ্দশাব করুণ মূর্ত্তি সুচিত্রিত করিয়া বিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে হারাইতে চেষ্টা করিবে। তবে সে যদি তাহাতে পরাজয় স্বীকার না করে এবং তোমাদিগকে সেজন্য যদি স্বরাজলাভেব আকাঙ্ক্ষা সমূলে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে উপায় নাই। কিন্তু চীৎকার বা বক্তৃতায় যদি স্বরাজলাভ সম্ভব হইত—sweet reasonablenessএর দ্বারা যদি আমাদের স্বার্থান্ধ শাসকগণের অন্তঃকরণে আঘাত লাগিত, তাহা হইলে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও তার্কিক গোপালকৃষ্ণ গোখলের চেষ্টাতেই এতদিনে আমবা অন্ততঃ দুইবাব স্বরাজ লাভ করিতাম।

তৃতীয়তঃ, আমি মনে করি যে, আজকালকাব কাউন্সিলগামী Non Co-operatorগণও স্বাবলম্বনবিহীন হইয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহাদের সকল আর্ত্তনাদ মরুভূমিতে ক্রন্দনের মত ফলপ্রসূ হইতেছে না। তাঁহাদের মূলনীতি উপর্য্যুপরি কাউন্সিল পরিত্যাগ ও শেষে দেশকে civil disobedienceএর জন্য প্রস্তুত করা কার্য্যে যদি তাঁহারা অবহিত হইতেন, তাহা হইলে আমার মতে তাঁহাদের দ্বারাও আদর্শ স্বরাজলাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহাদের

একটা বৈশিষ্ট্য থাকিত—যে বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতে-হইতে বাংলার সপ্তকোটী নরনারী স্বরাজের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত এবং স্বরাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদেরই যে সামান্য দাবী, তাহা তাঁহারা আদায় করিতে পারিতেন। তবে শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনের পর তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইলে, তাঁহারা civil disobedience-এর জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, civil disobedience কে বাদ দিয়া তাঁহারা সকল প্রাদেশিক কাউন্সিলে এবং ভারতীয় য়্যাসেম্‌ব্লিতে majority পাইলেও, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা হয়তো পূর্ণ হইবে না।

চতুর্থতঃ, এদেশে সম্প্রতি আরো দুই একটী রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহাদের উদ্দেশ্য স্বরাজ-সাধনা নহে—কাউন্সিল-সাধনা। তাহাদের অভিসন্ধি ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করা আবশ্যক বোধ করি না।

স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সকল পন্থার বিষয় আমরা অবগত আছি, এখন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব। অনেকের ধারণা আছে যে, যে সকল পন্থার মূল ভিত্তি স্বাবলম্বন, তাহাদের দ্বারা বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমি নিবেদন করিব যে, তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

প্রথমতঃ, স্বাবলম্বনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ—Non-Violent Non-Co operation এর দ্বারা কতদূর কি সম্ভবপর দেখা যাক্। স্মরণ থাকে যেন, স্বরাজ অর্থে কোন্ আদর্শকে আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, Non-violent Non-Co-operation এর দ্বারা Union Autonomy, District Autonomy, Provincial Autonomy—এমন কি, হয়তো Dominion Status বা Equal Partnership within the British Empire লাভ হইতে পারে, কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জ্জন করা যাইবে না। কারণ যেরূপ বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীর সেজন্য non-co-operation করা আবশ্যক, সেরূপ non-co-operation আমাদের এই রক্তমাংসের বাস্তব জীবনে একেবারেই সম্ভবপর নহে এবং কখন বা যদি বহির্ভারতের অচিন্তনীয় কোন অবস্থা পরম্পরায় অন্তর্ভারতে তাহা

সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আসমুদ্র-হিমাচলে তাহা non-violent থাকিবে, ইহা নিখুঁৎ আকাশকুসুম। এরূপ ঘটনা সত্যই যদি কখন বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমি এই বিশাল ভারতখণ্ডে ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তখন আর আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, Terrorism বা Anarchist Conspiracyর নিকট আমরা কিছু আশা করিতে পারি কিনা, তাহাও দেখাইতেছি। ইহার ভিত্তিও স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু ইহা নীতি বিরুদ্ধ ও কুফলপ্রদ। ইহার উপাসক যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্রে কাপুরুষ হইয়া যায়। ইহার মূলমন্ত্র গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করা বিধায়, ইহারা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করে এবং সর্ব্বদাই ধরা না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া দেশ উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাদের সংখ্যা কোন দিন কোন দেশে মুষ্টিমেয়ের অধিক হয় নাই, এদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। সংখ্যায় কম হওয়ার ইহাদের প্রবৃত্তি সদাসর্ব্বদা short cutএর অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং short cut খুঁজিয়া না পাইলে কিম্বা নিজেদের আবিষ্কৃত কোনও short cutএ বিফলমনোরথ হইলে, ইহাদের অনেকে অল্প দিন পরে গৃহকর্ম্মে ফিরিয়া যায় এবং চুরি-ডাকাইতি ইত্যাদি সকল প্রকারের কদাচার অনুষ্ঠানে ইহারা সমাজকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে। প্রকাশ্য পন্থার নিশ্চিত মৃত্যুর যে নির্ভীকতা ও অমিতবিক্রম, তাহা গোপন পন্থার অনিশ্চিত মৃত্যুর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ইহারা এমনভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে যে, কিছুদিন পরে ইহারা ব্যক্তিগতভাবে citizen পদ-বাচ্যেরও উপযুক্ত থাকে না। ইহাদের স্বভাব ক্রমান্বয়ে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, ইহারা যত বেশী দেশের কথা ভুলিতে থাকে এবং নিজের ভাবনায় ভাবিত হয়, ততবেশী ইহারা দেশের নেতৃবর্গের নিকট ইহাদের গোপন অজানিত ত্যাগের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করে এবং কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি তাহাতে অসম্মত হন, তবে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পিস্তলের গুলি পাঠাইতে অথবা তাহার নামে সর্ব্বৈব মিথ্যা দুর্ণাম রটাইতে ইহারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। No means is too low যাহাদের আদর্শ, তাহাদের নিকট ইহার বেশী আশা করাই অন্যায়। ইহারা দেশ উদ্ধারের নামে নিজ সহোদরের বাড়ীতে যেমন ডাকাইতি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি আবার ধরা পড়িলে অন্য এক সহোদরের বাড়ীতে পুনরায় ডাকাইতি করিয়া আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য কৌন্সিল নিযুক্ত করে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট মাস-মাহিয়ানায় গোয়ন্দাগিরি করে বা করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। এই সংবাদে অন্য কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত নহি। কারণ বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যাহারা short cutএর দ্বারা অর্জ্জন করিতে চায় কিম্বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গোপন ষড়যন্ত্রে তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে বিশ্বাস করিয়া যাহারা কার্য্য আরম্ভ করে, তাহাদের যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণাম! তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পাবে না যে, তাহাদের মত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চেষ্টায় এদেশে কখন যদি স্বরাজ সংস্থাপিত হয়, তবে তাহাকে প্রচলিত শোষণ ও পেষণ ব্যতীত অন্য কোনও নামে অভিহিত করা যাইবে না। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ও অমঙ্গল রহিয়াছে, তাহা তেমনই থাকিবে এবং মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বা ভারতবাসী তেত্রিশ কোটী নরনারীর জন্য স্বরাজ আনয়ন করিবে—এ দুর্ভাগ্য যেন আমাদের কাহারও কখন না হয়। তারপর, ষড়যন্ত্র করিবার বাস্তবিক অধিকারী কাহারা? মনে থাকে যেন ইহা কোন অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে তাহারই উপদ্রুত দুই চারি জন প্রজার ষড়যন্ত্র নহে। ইহা একটা ভীষণ পরাক্রমশালী জাতির বিরুদ্ধে আর একটা অত্যন্ত দুর্ব্বল সঙ্গতিবিহীন জাতির ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, এদেশের ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্র আবশ্যক, তাহা Terrorism বা Anarchist Conspiracyর মধ্যে থাকিতে পারে না। সুতরাং আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পাবি যে, বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা Terrorism বা Anarchist Conspiracy দ্বারা কস্মিন কালেও অর্জ্জিত হইবাব সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়তঃ, Civil Disobedience এর কথা। এই পন্থা ন্যায়ানুমোদিত ও আত্মনির্ভরশীল। ইহা দুই প্রকারের—Individual Civil Disobedience ও Mass Civil Disobedience. এই পন্থার গোড়ার কথা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহাতে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে না। আমার মনে হয় যে, এই Civil Disobedience এর দ্বারাও আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভবপব নহে। ইহার দ্বারা হয়তো আমরা Equal Partnership পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারি, কিন্তু যে আদর্শ স্বরাজের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে আদর্শ স্বরাজ লাভ ইহার দ্বারা হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীর কোনও দৈবদুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক

ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়াই আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ সাধনায় কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কাহারও কোন কার্য্যে হাত দেওয়া উচিত নহে। Civil disobedience-এর দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না, তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণ সে অভিযানে যোগদান করিবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, তাহারা নিমকহারাম হইবার ভয়ে স্বীয় আত্মীয়-কুটুম্ব ও স্বদেশীয়গণের সে অভিযানকে পণ্ড করিবার জন্য হয়ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এমন কি, আবশ্যক হইলে অথবা বিনা আবশ্যকতায় হুকুম পাইলেই হয়তো তাহারা নিজ বাসভূমে পরদেশীর মত গুলিগোলা চালাইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। ফলে অভিযাত্রিগণ সকলেই যে সে সময়ে বাহ্যিক শক্তি প্রতিপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ থাকিবে, একথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা যায় না। তখন civil disobedience আকার অনুসারে কোথাও বা riot এবং কোথাও বা revolution-এ পরিণত হইবে। তাহার কথা পরে বলিব। ইংরাজ-প্রতিপালিত ভারতীয় সৈন্যগণকে বাদ দিলেও, তাঁহাদের নিজবংশীয় যে ৭০।৮০ হাজার পদাতিক সৈন্য এদেশে বসবাস করিতেছে এবং তাঁহাদের যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ-উদ্গীরণকারী পুষ্পকরথ রহিয়াছে, তদ্দারা ভারতে আগ্নেয় কাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাঁহাদের শেষ সময়ে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ হইবে না। ফল, এইমাত্র যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। আর একটি কারণে civil disobedience-এর দ্বারা আমাদের আদর্শ স্বরাজ লাভ হইবে না এবং সেটি এই যে, আদর্শ স্বরাজ অর্থে আমি যাহা যাহা বুঝি—আমাদের নিজেদের Army ও Navy এবং আমাদের তদুপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি—civil disobedience জয়যুক্ত হইলেও আমরা তৎক্ষণাৎ এদেশে এমন কোন আধার পাইব না, যাহাকে ভিত্তি করিয়া আমরা শীঘ্রমধ্যে আমাদের সেই অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে রচনা করিতে পারি। বিনা রক্তপাতে civil disodedience জয়যুক্ত হইলে, ইংরাজ-রাজ এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের সহিত ভারতের সৈনিক বিভাগের বড়কর্ত্তাগণকেও সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু তারপর? কে তখন ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন? তাঁহার তদনুরূপ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিবে?

ইংরাজ-পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যের উপর অচিরে বিশ্বাস স্থাপন করা কোনও রাজনীতি-বিশারদের উপযুক্ত কার্য্য হইবে না ; তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের জন্য Army এবং Navy-ই বা কোথায় পাইব ? প্রকৃতপক্ষে, কিঞ্চিৎ গভীর ভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, civil disobedienc -এর লক্ষ্য প্রচলিত শাসনপ্রণালীকে সংশোধন কবা, তাহাব আমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতবাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে, civil disobedience-এব দ্বারাও তাহা অর্জ্জিত হইবে না।

তবে কি আমাদের কোনও উপায় নাই ? তবে কি আমাদিগকে সৃষ্টিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত পবপদানত থাকিতেই হইবে ? এ জগতের যে স্বাধীন দেশে আমবা যখন যাইব, সে দেশেব বালক-বালিকা তবে কি আমাদিগকে চিবদিন অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবে এবং বলিবে—'গ্যাখ, ওগো গ্যাখ, ভাবতবর্ষেব কয়েকটা ক্রীতদাস কেমন নির্লজ্জভাবে আমাদেব ওই Liberty Road দিয়া Equality Park-এ যাইতেছে।' ভয় নাই—দুঃখিত বা নিবাশ হইবার কোন কাবণ নাই। হে বাঙ্গালী! স্বয়ং দেশবন্ধু আপনাদিগকে যে ভাবতেব অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবাব নহে। বিগত ৩০।৩৫ বৎসরে বাংলাব চিন্তাধারা কোন দিকে শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তিনি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। বাংলাব সেই চিন্তাধাবাব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া, এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাষ্ট্ৰীয় সম্মিলনেব সভাপতিরূপে আমাকে এ বৎসব আপনাদেব পথনির্দ্দেশ কবিতে হইবে। আপনাবা নিজগুণে আমাব উপব যে গুরুভাব অর্পণ কবিযাছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কবিবেন, তথাপি আপনাদেব আজ্ঞা শিবোধার্য্য করিয়া আমি এই পথনির্দ্দেশ করিতেছি যে—

বাংলা তথা ভাবতেব পূর্ণ বাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন কবিবাব একটিমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা বহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় revolution কিংবা বিপ্লব বলে। কিন্তু revolution-এব নামে হঠাৎ উৎফুল্ল হইবাব যেমন কোন কাবণ নাই, তেমনি তাহা কাহারও হৃদয়ে ভীতি সঞ্চাবিত করুক, ইহাও আমাব উদ্দেশ্য নহে। আমি যেমন আদর্শ স্বরাজেব কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তেমনি সেই স্ববাজলাভের আদর্শ-পন্থার কথাও এখানে-

উল্লেখ করিলাম। বর্ত্তমানে বা নিকট ভবিষ্যতে আমাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, তাহা পরে বলিব।

Revolution-কে নানা কারণে আমি স্বরাজ লাভের আদর্শ পন্থা বলিয়া মনে করি। এখানে দুইটি কারণের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ, জগতের সকল স্বাধীন ও পরাধীন জাতির মধ্যে ইহার স্থান এখনও অতি-উচ্চে। বোধ হয় সর্ব্বোচ্চে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, শুনিয়াছি, যে, revolution হিংসামূলক, কেননা ইহাতে রক্তপাত হয়—মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসা-প্রসূত, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না। ল্যাটিমারের রক্তপাতে তাঁহার নিজের হিংসার কি ছিল? স্বয়ং যিশুখৃষ্টের যে রক্তপাতে তিনি পৃথিবীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, সে রক্তপাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও হিংসার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং রক্তপাত মাত্রই হিংসামূলক নহে। তারপর, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোনও দুর্ব্বলা অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি ও কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্থে জগতের সৎপ্রবৃত্তিসমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল যদি আমরা বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে পদে পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। তাহা হইলে গেরুয়া পরিয়া ডাকাইতি করিতে গেলে কিম্বা হরিনাম করিতে করিতে কেহ অর্থলোভে মানুষ খুন করিলে, ধর্ম্মের নিকট তাহাকে পাপী এবং আইনের সম্মুখে তাহাকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। আমি একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, কিন্তু সে কারণে revolution হিংসামূলক কে বলিল? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শ-বিরুদ্ধ হইবে কেন? আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি Divine Right থাকে, তবে Revolution-এর সাহায্যে তাহা কার্য্যে

পরিণত করিবারও আমার Divine Right রহিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দিন দুই বেলা কি দেখিতেছি? প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকের নিকট হইতে নূতন চিকিৎসক তাঁহার গুণের জন্য শত-সহস্র রোগী কাড়িয়া লইতেছেন—বিখ্যাত ব্যবহারজীবের সার্দ্ধ শতাব্দীর অপ্রতিহত পশার নূতন ব্যবহারজীব আসিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। কিন্তু এ সংসারে কে এমন বাতুল আছে যে সে সেজন্য তাঁহাদিগকে হিংসুক কিম্বা বিদ্বেষপরায়ণ বলিবে? যে জাতির গীতা এখনও কোরাণ-বাইবেল ও বেদ-বেদান্তের মত জগতের প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর নিকট সমানভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।

দ্বিতীয়তঃ, revolution-এব জন্য এদেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে, আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তি আবশ্যক হইবে, তদ্দারা আমরা revolution-এর পবের সমূহ সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে পরিমাণে ধ্বংসমূলক বলা যায়, এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অধিক পবিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমবা বাধ্য। কারণ short cut-এ পৃথিবীব কোন দেশে revolution কখনও জয়যুক্ত হয নাই, এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্য্যে তাহা হইবে না।

সুতবাং কেহ যদি জিজ্ঞাসা কবেন যে, স্বরাজ কোন্ পথে—বাংলা তথা ভারতেব পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনেব আদর্শ পন্থা কি, তবে অবিসম্বাদিত চিত্তে বলিব—revolution-এব পথে, বিপ্লবেব পথে, তাহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই চিন্তা কবা যায় না।

বাস্তব ও আদর্শে সমন্বয় আবশ্যক

আশা কবি, এই অর্ব্বাচীনেব আদর্শবাদ আপনাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে নাই। আদর্শ যাহা, তাহা যে অনেকেব নিকট অনেক সময় শ্রুতিকটু হয়, সে কথা আমি সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু আমার যে উপায়ান্তব নাই। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে আজ যে পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেখান হইতে আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিলে, এই সম্মিলন প্রাণহীন হইবে। তবে আপনারা এতক্ষণ ধরিয়া যে আদর্শবাদের কথা শুনিয়া আসিলেন, এখন হইতে আপনাদিগকে সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু শুনিতে হইবে না। এখন বাস্তবের কথাই আপনাদিগকে বলিব। কিন্তু আদর্শ

অপেক্ষা বাস্তব অনেক বেশী শ্রুতিকটু, সেজন্য পূর্ব্বাহ্নেই আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাহার আদর্শ হওয়া উচিত, সেই বাংলা তথা ভারতের বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করিলে লজ্জা ও অপমানে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। আদর্শ যাহার নিকট যত বেশী পরিস্ফুট, বাস্তবে তাহার অভাব দর্শনে সে তত বেশী মর্ম্মাহত হয়। কিন্তু মর্ম্মাহতই হই কিম্বা লজ্জা-অপমানই বোধ করি, আজ আপনাদিগকে এখানে কয়েকটি অপ্রিয় কথা শুনাইব। আপনাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

এদেশেব তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যহীনতা হইতেই আবম্ভ কবি। তাঁহাদিগকেই আজ আমবা সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি এবং তাঁহাদেব হস্তেই বাংলাব ভবিষ্যৎ এক হিসাবে গুরুতবরূপে নির্ভব করিতেছে। পৃথিবীর কোন দেশেই আদর্শ আকাশেব বারিবিন্দুর সহিত ভূখণ্ডে নিপতিত হয় না কিম্বা বৃক্ষে তাহা উৎপাদিত হইয়াছে কেহ দেখে নাই। শিক্ষায় তাহার পবিকল্পনা এবং শিক্ষাব উৎকর্ষেই তাহার পবিবর্দ্ধন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনেব জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাব কাবণ বিপ্লবের পব ফবাসী জাতির জয়লাভে তিনি যে গভীর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তিনি মনে কবিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যৎকালে তাঁহার বংশধরগণ ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইযা তাঁহাবই মত স্বাধীনতা-কামী হইবে। কিন্তু একদিকে তাঁহাব সে আশা যেমন ফলবতী হয নাই, অন্যদিকে তেমনি ইংবাজগণ তাহাব সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া যথাসময়ে সাবধান হইয়াছিল। ফলে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিলে একটা ঘোরতর স্বার্থপর, একান্ত অদূবদর্শী ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জীবের কথা মনে পড়ে। সে যে পবাধীন, সে হযত তাহা জানে না কিম্বা সে যদি তাহা অবগত থাকে, তাহা হইলে সে তাহাকে লজ্জা বা দুঃখেব বিষয় বলিয়া মনে করে না। শুধু তাহাই নহে, তাহার পরাধীন জীবনেব সমূহ দৈন্য ও দুর্দ্দশাকে গোপন করিবার জন্য সে বড় বড় রাজ-উপাধির দ্বারা নিজের নামকে সুশোভিত করিয়া কলঙ্কিত করে এবং ইংরাজের প্রচলিত শাসনপ্রণালীর সুখ্যাতিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও তাহার নিকট পরাজিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের পর হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা এদেশে ঘটিয়াছে,

এখানে তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এদেশবাসীর আদর্শ গঠনের জন্য কি করিয়াছেন? ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর সহিত ভারতীয় শাসনযন্ত্রের তুলনা করিয়া, এদেশের তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার সমন্বয় সংস্থাপনের জন্যই জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর হইতেই ভারতেব আইন সভায় ভারতের যে সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় অবগত থাকিয়াও তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের রাষ্ট্রীয আদর্শকে প্রকাশ্যভাবে পরিবর্ত্তন করিতে একাল পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। Penal Code-এব Sedition এর ধারা, Defence of India Act, Rowlatt Act, Criminal Law Amendment Act ও Bengal Ordinance প্রভৃতি আদর্শ-ধ্বংসকাবী প্রায় সকল আইন আমাদেব জাতীয় মহাসভার পদাঙ্ক অনুসবণ করিয়াই এদেশে জন্মলাভ করিয়াছে। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় যে, তথাপি এদেশেব যাঁহাবা শিক্ষায় মৌলিক এবং নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাবাও এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমাদেব রাষ্ট্রীয় আদর্শকে খর্ব্ব ও পঙ্গু করিবাব জন্য বদ্ধপরিকর। এই পরাধীন জাতির রাজনীতি চর্চ্চা করিতে যাঁহাদেব সম্যক ত্যাগের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা কেন যে কিছুদিনেব জন্য বাজনীতি চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন। অথবা ইহাই কি সত্য নয় যে, তাঁহাবা দেশ ও দশের নামে যাহা কিছু চালাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভেব জন্য? কথা সত্য হইলে, এ জাতির উপর ভগবানেব আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে আবও অনেক বিলম্ব আছে।

এই বিলম্বের কথা বলিব বলিয়াই আমি এতক্ষণ আপনাদিগকে বিরক্ত করিয়া আসিলাম। আদর্শ আমাদেব যত বড, সময়ও আমাদেব তত বেশী লাগিবে। শিক্ষিত-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষাবলম্বন করিলে কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে নিবপেক্ষ থাকিলে, আমাদেব কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভারতেব রাজনৈতিক গগনে মহাত্মা গান্ধীব আবিভাবের পব, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে কারণেই হউক প্রায় সর্ব্বত্র আমাদের জাতীয় মহাসমিতি ও তদন্তর্গত প্রাদেশিক সম্মিলন ইত্যাদির ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য ইহা অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ যে, তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে

সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই জাগরণ যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ ত্যাগশীল ও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, তাহার গুরুভার গ্রহণ করিবে কে? আমাদের জনসাধারণ আমাদিগকে বড়জোর এক একটা বিনামূল্যের ভোট প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু মাসিক চারি আনা চাঁদা কিম্বা হাজার গজ সূতা কাটিতে তাহাদের অনেকে এখনও প্রস্তুত নহে। জেলে যাইবার কথা শুনিলে এখনো তাহাদের অনেকে ভীত হয়, নিশ্চিত মরণের কথায় তাহাদের প্রায় সকলেই রাজনীতির ত্রিসীমায় আসিতে চাহে না। তাহাদের এই mentalityর পরিবর্ত্তন করা স্বভাবতঃই সময়সাপেক্ষ, সেইজন্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শক্রতায় আরো বেশী সময় দিতে হইবে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায় রাজনৈতিক আদর্শ সৃষ্টিতে যেমন পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন, তেমনি সমাজের যে সকল দুর্নীতির জন্য এদেশে রাষ্ট্রীয় আদর্শ দ্রুত পরিস্ফুট হইতেছে না, তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্যও তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টিত নন্। অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই অপচীয়মান দুর্নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে একথা খুব সত্য যে, সমাজেব সকল দুর্নীতিকে direct action-এর দ্বারা পরিবর্ত্তন করা যায় না। তাহার চেষ্টায় অধিকাংশ স্থলেই বিপরীত ফল ফলে। এদেশ যদি স্বাধীন হইত এবং এদেশে যদি আমাদের নিজেদের কোনও স্বাধীন শাসক থাকিতেন, তাহার পক্ষে সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতি অপনোদনের জন্য direct action লওয়া সম্ভবপর তো হইতই—অবশ্য কর্ত্তব্যও হইত। সেইজন্যই এই সেদিন স্বাধীন চীনে বহু যুগযুগান্তরের প্রায় ৪০ কোটী বেণী একদিনে কাটিয়া ফেলা সম্ভবপর হইয়াছে এবং সেই জন্যই আজ স্বাধীন তুরস্কে মুসলমান রমণীর পরদা অন্তর্হিত। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা পরপদানত। আমাদের উচ্চ সভ্যতাভিমানী শাসকসম্প্রদায় বিগত ১৭০ বৎসরে আমাদের মধ্যে দুই একটি দুর্নীতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধনও করিয়াছেন, যেমন সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, 'age of consent' ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও বহুবিধ সামাজিক দুর্নীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার আমূল উচ্ছেদ সাধন না করিলে ভারতের স্বরাজ-সাধনা সর্ব্বাঙ্গীন শুভফলপ্রদ হইবে না। আমাদের শাসকসম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নামে সে-সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। সুতরাং আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের

সেই সকল ব্যাপারে মুক্তপ্রাণ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই। এদেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়—পৃথিবীর সকল দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সামাজিক বিষয়ে বড বেশী রকমে অনুকরণ করে। অগ্রগামী হইয়া তাহাদের সম্মুখে প্রকৃত কার্য্যের উদাহরণ উপস্থাপিত না করিলে, তাহারা তাহাদের ভ্রান্তপথ কিছুতেই পবিত্যাগ করিবে না। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহারা এ সম্বন্ধেও ঘোরতর উদাসীন। তাঁহাদিগকে এই পথেব পথিক করিতে হইলে, জীবন্ত জাগ্রতভাবে সমাজ-সংস্কারে লাগাইতে হইলে, আবো কিছুকাল আমাদিগকে বিলম্ব কবিতে হইবে।

কারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উদাসীনতার মূল কারণ কোথায় তাহা আবিষ্কার কবিয়া তাহাব প্রতিকাবেব চেষ্টা করা আবশ্যক। সমাজই দেশেব বাষ্ট্রীয় সম্পদ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ই দেশের সমাজ সৃজন করেন। আবাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই শক্তি তাঁহাদেব শিক্ষা হইতে যেমন উদ্ভুত হয়, তেমনি তাঁহাদেব শিক্ষাব আদর্শ তাঁহাদের শাসকগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, গত চল্লিশ বৎসবেব রাজনৈতিক আন্দোলনে আমবা এই গোডার কথাটাকে পরিষ্কাব ভাবে কেহই ধরিতে পারি নাই। যদি বা কেহ কেহ ধবিযাছিলেন, তাঁহারা হার মানিয়া সবিয়া দাঁডাইযাছেন এবং তাঁহাদেব আদর্শেব বীভৎস ব্যভিচার দেখিযা দূর হইতে চক্ষুর্মর্দ্দন কবাই এখন তাঁহাদের সার হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি কিম্বা প্রাদেশিক সম্মিলন এদেশেব শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে কিম্বা শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তনের জন্য কোন দিন সবিশেষ চেষ্টা কবেন নাই। হাজার-হাজাব লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা জাতীয় মহাযজ্ঞের জন্য উঠিয়াছে এবং ব্যযিতও হইয়াছে, কিন্তু এদেশেব কোমলমতি বালক-বালিকাব প্রকৃত শিক্ষার জন্য সে টাকার এক কপর্দ্দকও এ প্রদেশের কোথাও সঞ্চিত আছে বলিয়া আমি জানি না। আমরা যে মাটিতে মৃদঙ্গ গডিব বলিয়া স্থিব করিয়াছি, সেই মাটিকে দলিয়া মলিয়া মালমশলা দিয়া যত্নের সহিত প্রস্তুত না করিলে, তাহা যে অকালে অসময়ের মহাসঙ্কীর্ত্তনের দিনে ভাঙ্গিযা চুরমার হইয়া যাইবে! কিন্তু—কিন্তু আবার বলি, ইহা সময়-সাপেক্ষ।

তাবপর, আমাদের অর্থনৈতিক বাস্তব জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তব জীবনের কথা এইমাত্র বলিলাম, আমাদের অর্থনৈতিক বাস্তব জীবন অপেক্ষা অধিকতর

দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে পুণা সহরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—'Upon the miserable income of Rs. 27 a year, the native of India has to pay a tax of 8 per cent, while the Englishman with an average annual income of £ 33, pays only a tax of 7½ per cent.'—অর্থাৎ আমাদের বাৎসরিক সাতাশ টাকা আয়ের উপর আমরা শতকরা আট টাকা হারে কর দিয়া থাকি, কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাদেব বাৎসরিক তেত্রিশ পাউণ্ড আয়ের উপর শতকরা ৭॥ পাউণ্ড কব দিয়া থাকেন। ৩০।৩১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক প্রকারের কর বৃদ্ধি হইয়াছে, যথা লবণেব শুল্ক, পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্য, কোর্ট-ফি ও ষ্ট্যাম্পের বর্দ্ধিত হার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদেব আয়ের পরিমাণ ত্রিশ টাকার বেশী হইয়াছে বলিয়া কাহারও মুখে আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। সুতবাং আমবা দিনে দিনে অর্থবলেও দরিদ্র হইতেছি। পল্লীগ্রামে কয়েকটী জিনিষ মাত্র পল্লীবাসিগণ নিজে নিজে সরবরাহ করিতে পারিলে, আমাদের কতই না সুবিধা হইত। কাপড, কেরোসিন তৈল, লবণ ও দিয়াশলাই—প্রধানতঃ এই কয়টি জিনিষেই আমাদের পল্লীবাসীর সর্ব্বনাশ হইতেছে। রাজশক্তি আমাদের হাতে না থাকায়, আমবা বিদেশী কাপড, কেরোসিন তৈল ও দিয়াশালাইর উপর যেমন উপযুক্ত কর ধার্য্য করিতে পারিতেছি না, তেমনি আমাদের পুকুরের জলে ও ধানের ক্ষেতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ থাকা সত্ত্বেও আমরা লিভারপুলের লবণে জীবন ধাবণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি। আমাদের সহরের অর্থও বিদেশাগত সুখসৌন্দর্য্য ও ভোগবিলাসের সাজ-সরঞ্জামে নিঃশেষিত হইতেছে। দুই একজন ব্যতীত আমাদের কাহারও এ প্রবৃত্তি এখনো জন্মায় নাই যে, আমরা আর সকল প্রকারের আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া, কেবল এই স্বদেশী আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করি। কৃষিজীবী বাঙ্গালী ও ভারতবাসী, স্বদেশী না করিলে পারিবে কেন? দেশ উদ্ধারের শত-সহস্র কার্য্যে তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে? চাঁদা তুলিয়া কিম্বা কতকগুলি লোকের দয়া-দাক্ষিণ্যেব উপর নির্ভর করিয়া বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত স্বরাজ-সাধনা সুদূর-পরাহত।

সুতরাং আমাদের অবস্থা ঠিক 'ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দারে'র মত হইয়াছে। ঢাল-তলোয়ারওয়ালা নিধিরাম সাজিতে আমাদের কিছু বিলম্ব

হইবে। আমাদের মত একটা দুর্ব্বল ও সঙ্গতিবিহীন পরপদানত জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য ২।১০ বৎসরের বিলম্ব কোনও ভাবনা বা দুরদৃষ্টের কথা নহে। আমি যে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ আপনাদের সম্মুখে ধরিয়াছি, এই কয়েক বৎসরের জন্য সেই আদর্শ আমাদের চিন্তায় মহামহিমময় ও নিত্য-আরাধ্য থাকিলেও, আমাদিগকে কার্য্যে তাহার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের আদর্শের সহিত আমাদের বাস্তবের এত পার্থক্য এখনও পরিলক্ষিত হয় যে, আগামী কয়েক বৎসবের জন্য এইরূপ একটা মীমাংসা করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও উপায় নাই। আমি এখানে কেবল আদর্শের মীমাংসা বা সমন্বয়ের আবশ্যকতার কথা বলিলাম। আমাদের সমন্বিত আদর্শ ও বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা পরে বলিব।

তাহারাও সে সমন্বয়ে সহায়ক হইতে বাধ্য

কেবল আমাদিগকেই যে এক্ষণে আমাদের আদর্শকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিতে হইবে তাহা নহে, আমাদের শাসকগণও তাঁহাদেব আদর্শকে বহুল পবিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য। আমাদের শাসকদিগের আদর্শ কি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা মুখে এবং কাগজপত্রে যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের মনের কথা এই যে, তাঁহারা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন এবং এখনও বাণিজ্য-প্রয়াসী। তাঁহাবা তাঁহাদের শাসন-প্রণালীব মধ্যে যে steel frame রক্ষা করিতে চাহেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বাণিজ্য ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ এই জমিদারী হইতে তাঁহাদের কোনও মুনফা নাই। কয়েক জন ইংরাজের এদেশে ভাল ভাল চাকরী পাইবার সুবিধা আছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য ইংরাজ জাতি এদেশের শাসনপ্রণালীর সহিত সবিশেষ সম্পর্কিত নহেন। এদেশে Responsible Government সংস্থাপিত হইলে অর্থাৎ প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের ভোট অনুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা করিলে, তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্যের উপর হয়তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিব—ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম আশঙ্কা। এই মূল আশঙ্কার চতুষ্পার্শ্বে শত সহস্র রকমের উপ-আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইজন্য মুখে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের শাসকগণ এখনও নিশ্চিন্ত মনে ইহা স্থির করিতে পারেন নাই যে, আমাদিগের

নিশ্চয়ই Responsible Government হওয়া উচিত। সেইজন্য তাঁহাদের সকল কার্য্যেই গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি এই mentalityর যুদ্ধ পরিদর্শন করিয়া আসিতেছি।

তাবপব, তাঁহাদের শাসনযন্ত্রকে সদাসর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে বাখিবার জন্য তাঁহারা চিরদিন ভারতীয় সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন-প্রণালীব মূলনীতি ন্যায় বা ধর্ম্ম নহে—শক্তি ; তবে তাহাকে যতদূব সম্ভব নানা মিথ্যা-আবরণে আবৃত করিয়া বাখা হইয়াছে। তাঁহাদেব এই শক্তি যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহারা এতদ্দেশীয় শাসন-প্রণালীর গুরুতর কোনও পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদেব এই শক্তি যে আর বেশী দিন অটুট থাকিবে না, তাহা স্থির-নিশ্চিত এবং সেই কারণে তাঁহারা আমাদের সহিত একটা মীমাংসা করিতে বাধ্য। আমার এই সিদ্ধান্ত যে কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহা বহির্ভাবত ও অন্তর্ভারতের কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। বহির্ভারতের কথাই আগে বলি।

প্রথমতঃ, রুশ-জাপানেব যুদ্ধেব পূর্ব্বে এসিয়া খণ্ডে ভারতের যাহারা শত্রু ছিল, এখনও তাহাদের শত্রুতাব সম্ভাবনা কমে নাই—বরং বর্দ্ধিত হইয়াছে। রুশেব ভূতপূর্ব্ব সম্রাটগণ ভারতে আসিবার জন্য যেরূপ সুযোগ অন্বেষণ করিতে কোন দিন পরাঙ্মুখ ছিলেন না, একালের সোভিয়েট যে সে আশা একেবারে রাখেন না, এমন কথা স্পর্দ্ধা কবিয়া বলা যায় না। তবে রুশের ভারত আগমন অর্থে চিরদিনই রুশ-পদাতিকের ভাবত আক্রমণ বুঝাইয়াছে। সেকালে তাহারা খাইবার ও বোলান পাশ দিয়া পাঞ্জাবে অবতীর্ণ হইলেই, তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ভারতীয় অর্থে প্রতিপালিত যথেষ্ট ভারতীয় সৈন্য ভারতের দুর্গসমূহে দিবাবাত্রি জাগ্রত থাকিত। একালে তাহারা হঠাৎ ভারতের মধ্যে আসিয়া পড়িলে অন্তর্ভারতে পাছে কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেইজন্য খাইবাব ও বোলান পাশের মধ্য দিয়া ভারতের বাহির পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ভারতের বাহিরেই বাধা প্রদান করিতে হইবে। রুশও নিশ্চেষ্ট নহে। সে তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্বাধীন জাতির সহিত গোপন সন্ধি ইত্যাদির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং রুশের সহিত ভারতের যদি কখনও স্থলযুদ্ধ হয়—সে যুদ্ধ ভারতের ভিতরেই হউক কিম্বা ভারতের বাহিরেই হউক—তাহা যে পূর্ব্বের মত সহজসাধ্য হইবে না, ইহা কষ্টকল্পিত কথা নহে। অন্তর্ভারতকে

সেজন্য ইংলণ্ড সন্তুষ্ট রাখিতে বাধ্য। আবার এইজন্যই ভারতে Military Collegeএর প্রস্তাবনা।

এদিকে পূর্ব্ব এসিয়ায় জাপানের অভ্যুদয়ে আর এক ভীষণ ও গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। রুশের সহিত জাপানের যে কারণেই যুদ্ধ হউক, অনেকে মনে করিয়াছিল যে, ফলে ভারতেব দুই শত্রু আপনাআপনি কাটাকাটি করিয়া কিছুকালের জন্য হীনবল হইয়া যাইবে এবং ভারতের কণ্টকদ্বয় এইরূপে বিদূরিত হইলে ভারতের শাসক-সম্প্রদায় কয়েক যুগের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। জাপানের অভ্যুত্থানে ইংলণ্ড যে ভীত হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। তাঁহাদেব সহিত জাপানের যে Treaty হইয়াছিল এবং তাহাতে যে ভুতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ-সম্রাট আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার বিষয় নহে। ভৃতপূর্ব্ব কাইজার যে স্বীয় হস্তে Yellow Perılএর তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা জাপানের প্রতিপত্তি বিস্তারে তাঁহার ঘোরতর আপত্তির পরিচায়ক। কিন্তু ইংলণ্ড নিজের নিকট-ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করিবার প্রবল প্রলোভন তখন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কাইজারও সকল কথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া, পরে যতদূর সম্ভব জার্ম্মাণ-প্রতিভার দ্বারা জাপান-প্রতিভাকে পরিমার্জ্জিত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। গত যুদ্ধ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ না হইয়া যদি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইত, তবে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল আজ কিরূপ আকার ধারণ করিত, তাহা এক সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই অবগত আছেন। যাহা হউক, রুশ-জাপানের যুদ্ধের পরিণামে জাপান হীনবল হইয়াছেন প্রতিপন্ন না হইয়া, পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রধানতম শক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহার পর হইতেই ভারতের পূর্ব্বকথিত নূতন সমস্যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপের ভূগোলে ইংলণ্ডের যেরূপ অধিষ্ঠান, এসিয়ার ভূগোলে জাপানেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থিতি। জাপান এসিয়ার ইংলণ্ড। রাষ্ট্রীয় সুখৈশ্বর্য্যে জাপানীগণ বহুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে, তাঁহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেই পাইবে। ইংলণ্ডের তাহাই হইয়াছিল। সেইজন্য ইংলণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের মত জাপানেরও মূল সাম্রাজ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সুতরাং লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাপানকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেই হইবে। কিন্তু এসিয়া খণ্ডে জাপানীগণের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্থান কোথায়? ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে

যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সেখানে দায়িত্ব এত গুরুতর ও স্থান সঙ্কুলান হওয়া এত অসম্ভব যে, তাঁহারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। চীন সাম্রাজ্যে যাইতে হইলে, জগতের প্রায় সকল পরাক্রমশালী শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রুশ-সাইবেরিয়ায় বিগত রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর তাঁহারা কিঞ্চিৎ স্থান অধিকৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে এবং তাহার জলবায়ু ও অত্যধিক শীত জাপান জাতির ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড ও খনিজ ধনরত্নরাজির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া কালে সম্ভবপর হইবে। এমন কি, তাঁহাদের দেবতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতখণ্ডের দিকে তাঁহারা ক্রমে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে পারেন। তাঁহাদের সৈনিকগণের আকর্ষণ এদিকে হয়তো অধিকতর হইবে। অন্ততঃ পক্ষে, ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদগণ যদি এই দুই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অদূরদর্শী বলিব।

তবে সৌভাগ্যেব বিষয় এই যে, তাঁহারা বিনিদ্রিত নহেন—অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে জাগ্রত। Singapur Base তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কারমাইকেলকে আমি এই আশঙ্কার জন্যই ডায়মণ্ডহারবার ও চাঁদপুর দুর্গদ্বয়ের মধ্যে কোনও এক স্থানে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের সম্ভাবনাব কথা লিখিয়াছিলাম। সে লেখা নিশ্চয়ই এখনও গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় পচিতেছে। তবে বিগত ১৩।১৪ বৎসরে ব্যাপারটা পরিমার্জ্জিত হইয়া Singapur Baseএ পবিণত হইয়াছে—ইহাই তাহার পার্থক্য।

এখন, কথা এই যে, এসিয়াখণ্ডে জাপানের মত একটী নৌ-শক্তিশালী জাতির অভ্যুত্থানে ভারতীয় শাসকসম্প্রদায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন কিনা। অষ্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষ লইয়া জাপানের সহিত ইংলণ্ডের কখনও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তাহা যে প্রধানতঃ নৌ-যুদ্ধ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং এই নৌ-যুদ্ধে জাপানকে পরাজিত করিতে হইলে, ইংলণ্ড যে ভারত মহাসাগরে তাঁহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক নৌ-শক্তি প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাও সুনিশ্চিত। কিন্তু সে সময়ে বাকী অর্দ্ধ নৌ-শক্তির দ্বারা ইংরাজদিগের নিজবাসভূমি সুসংরক্ষিত হইবে কিনা, তাহা সত্যই চিন্তার বিষয়। তদুপরি জাপানের সহিত জার্ম্মাণী ও রুশের যদি কোন গোপন সন্ধি-পত্র এখন হইতে লিখিত-পড়িত থাকে এবং সেই সময় যদি অন্তর্ভারতেও অশান্তির সূচনা দেখা যায়, তাহা হইলে ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হইবে।

কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন সমস্যা এই যে, ভারত-রক্ষার জন্য অতঃপর কেবল ইংরাজগণকেই প্রাণদান করিতে হইবে—ইংরাজ-ভারতে ইহা নূতন কথা। আমাদের অর্থ ও আমাদের প্রাণের বিনিময়েই তাঁহারা এতদিন আমাদিগকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারত-রক্ষার জন্য কোনও নৌ-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, British Navyতে ভারতবাসীর কোনও স্থান না থাকায়, সেই যুদ্ধে যে কেবল ইংরাজগণকেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। সেইজন্যই Royal Indian Navyর অনুসূচনা, কিন্তু তাহাতে দলে দলে ভারতবাসীকে গ্রহণ না করিলে কার্য্যসিদ্ধির কোন উপায় নাই। আবার ভারতবাসীকে Navyতে লইতে হইলে, তাহাদিগকে অনেক নূতন নূতন অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহারা যে আর কেবল অর্থ-লোভী ভাড়াটিয়া সৈন্য থাকিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখে যে প্রশ্ন মীমাংসার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেটী এই যে, তাঁহারা কি আমাদিগকে বিগত ১৭০ বৎসর ধরিয়া যেরূপ পরাধীন করিয়া রাখিয়াছেন সেইরূপ রাখিবেন এবং নিজ নিজ রক্তদানে ভাবতবর্ষ ইহার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে, না, তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের মত আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা শক্তিশালী কবিয়া আমাদের ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইবেন এবং অধিকন্তু আমাদের জনশক্তি ও ধনশক্তির উপকর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হইবে? আমি বিশ্বাস করি যে, এই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ যেমন নির্ভর করিতেছে, তেমনি ভারতবাসীর ভবিষ্যৎও ইহার সহিত গভীরভাবে বিজড়িত। গ্ল্যাডষ্টোনের সময়ে আয়রল্যাণ্ড যে দুই আনা হোমরুলে সন্তুষ্ট হইত, তাহা যথাসময়ে তাহাদিগকে না দেওয়ায় তাহাদের mentalityর এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন তাহাদিগকে তাহার চতুর্গুণ হোমরুল দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা অসন্তুষ্ট। ফলে ইংলণ্ডের বুকের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রবল শত্রু আজ মাথা তুলিয়া হুম্‌কি দিতে চাহিতেছে। ভারতের বর্ত্তমান ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা যদি এইরূপে পদদলিত হইতে থাকে, তবে আজ ভারত যে সর্ত্তে মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছে, কিছুদিন পরে তাহাতে একবারেই সম্মত হইবে না। এবং ভারতের মত জনবহুল বিস্তৃত মহাদেশ যদি কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কাহাকে লইয়া

থাকিবে? কারণ অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে nationalismএর যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা যুদ্ধের পর হইতে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। সুতরাং এশিয়াখণ্ডের নিকট-ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের শাসকসম্প্রদায় আমাদের সহিত শীঘ্র মীমাংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ বা আমেরিকাতেই বা তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। Balance of power ঠিক রাখিবার জন্য ইউরোপে গোপনে গোপনে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। ভার্সেল্‌স্ সন্ধিপত্রকে ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য ইতালী প্রথম হইতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ক্রমে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। Locarno Pact ইতিমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, কারণ হিণ্ডেন্‌বার্গ বুঝিয়াছেন যে, League of Nation-এ যোগদান করিয়া যদি সদাসর্ব্বদা সেখানে ভোটে হার মানিতে হয়, তবে সেখানে না যাওয়াই শ্রেয়স্কর। বৃদ্ধ হিণ্ডেন্‌বার্গ কাউন্সিলগামী বাঙ্গালী দেশসেবক নহেন, ইহা তাহার দুর্ভাগ্য। ফরাসী দেশের আর্থিক অবস্থা এত জটিল হইয়াছে যে, তাহার শাসনযন্ত্র কিছুদিন হইল কোনপ্রকারেই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতেছে না এবং বোধহয় প্রধানতঃ সেইজন্য, গত যুদ্ধের ফলে তাহার যে স্থায়ী লাভ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। তুরস্ক শির উন্নত করিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়াছেন যে, লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রের সাংবাদিক পর্য্যন্ত সেদিন বিলাত ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন। রুশ প্রায় সকল স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াও এখনও যে সে মরিতেছে না—অধিকন্তু জার্ম্মাণীর সহিত সেদিন সে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। জার্ম্মাণীকে সকলে মিলিয়া চারিদিকে যেমন টানাটানি করিতেছেন, তাহাতে জার্ম্মাণীর ভাগ্যদেবতা আবার তাহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মুশোলিনীর তর্জ্জনগর্জ্জন এত বাড়িয়াছে যে, তাহার পরিণাম কোথায়, এখন স্থির করা সুকঠিন। তিনি নাকি মুসলমান জগতের সহিত মিত্রতা করিবেন স্থির করিয়াছেন। যে আমেরিকার উড্রো উইলসন্ League of Nations সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকাই যে আজ পর্য্যন্ত Leagueএ যোগদান করিলেন না—ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? মোট কথা, প্রায় সকলের মুখে যদিও মাঝে মাঝে শুনা

বায় যে, যুদ্ধ পরিত্যাগ কর এবং Army ও Navy কমাও, তথাপি কার্য্যগতিকে সকলেই কি জানি কেন তলে-তলে ও প্রকাশ্যভাবে Army এবং Navy বাড়াইতেছেন। ইউরোপের কোন এক স্থানে আর একবার যুদ্ধ বাধিলে, ইউরোপের চারিদিকে দাবানলের মত তাহা ছড়াইয়া পড়িবে। এবং এই কলিকালে যুদ্ধ অর্থে যে লোকক্ষয়ের কল্পনা করিতে হয়, তাহাতে ইংলণ্ডের আব বেশী যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তৎপূর্ব্বে যদি ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধি না হইয়া থাকে, তবে তাহার পব ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস কিরূপ হইতে পারে—সে চিত্র অঙ্কিত করিবার এখন বিশেষ কোনও আবশ্যকতা নাই। চিন্তাশীল ইংবাজগণ নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন যে, বহির্ভাবতের আভ্যন্তবীণ অবস্থা তাঁহাদের পক্ষে দিনে দিনে মঙ্গলজনক হইতেছে না। স্থতরাং ভাবতের সহিত শীঘ্র সন্ধি সংস্থাপিত না হইলে, তাঁহাদিগকেই যে শেষ পর্য্যন্ত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা স্থির-নিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, ইংরাজগণ যদি ভাবতের আভ্যন্তবীণ অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া সাহসে বুক বাঁধিযা থাকেন, তবে বলিব যে, তাঁহাদের দূবদর্শিতার অভাব হইয়াছে। ভারতেব আভ্যন্তরীণ অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, গত কুড়ি বৎসরে ভারতের চিন্তাধাবা যে কি অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের স্মবণ রাখা উচিত। আমাব ছাত্রজীবনে দেখিয়াছিলাম যে, যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় অস্থায়ীভাবে বিভাগীয় কমিশনার হইয়াছিলেন, তখন কোন কোন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দে চাঁদা তুলিয়া বাজি পোডাইয়াছিলেন এবং তাহাতে হাজাব হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু বীরভূম জেলার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় যখন সেদিন লর্ড সিংহ অফ্ রায়পুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে গিয়া বসিয়াছিলেন, তখন সে সংবাদে এদেশের কেহ আনন্দে চাঁদা তুলিয়া বাজি পোড়াইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। সেকালে চটি জুতা পরিয়া 'আঙ্গরাখা' গায়ে এক বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাংলার ইতিহাসে আজও সে ঘটনা সমুজ্জল রহিয়াছে. কিন্তু একালে কত লোক যে একেবারে সে সকল স্থানে পদার্পণ করিতেই নারাজ, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ছাপাইলে একখানি পুস্তক হইতে পারে। তখনকার দিনে কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে খেতাব পাইলে, লোকে তাহাকে সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, কিন্তু আজকাল তাহাকে জনৈক অপদার্থ ব্যক্তি—এমনকি, স্থানবিশেষে গোয়েন্দা বলিয়াও সন্দেহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন কিনা ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও, তাঁহাদের হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত যখন গোয়েন্দার হাতে অপদস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন পর্দ্দার আড়ালে নিশ্চয়ই যে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড রোলিনসন্ জীবিত নাই, থাকিলে তিনিই বলিতে পারিতেন কেন মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিতে এত বিলম্ব হইয়াছিল। যেদেশে একদিন দিল্লীশ্বর ও জগদীশ্বরে কোনও পার্থক্য ছিল না, সেই দেশেই বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ছোটলাট স্যার এণ্ডরু ফ্রেজারের উপর কি অন্যায় অত্যাচারই না হইয়া গিয়াছে! জেল যেখানে নরক অপেক্ষা ভয়াবহ ও ঘৃণ্য ছিল, সেখানে সেই জেলই আজ সহস্র-সহস্র লোকের নিকট স্বর্গ অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ ও সাধনার স্থল। ফাঁসির কথা শুনিলে যাহারা কাণে হাত দিত এবং ভয়ে দূরে সরিয়া গিয়া মূর্চ্ছা যাইত, তাহাদের কেহ কেহ আজ ফাঁসির হুকুম শুনিয়া ওজনে বাড়িতেছে এবং নির্ব্বিঘ্নে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইতেও পারিতেছে।

বাংলা তথা ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়ও আর বিনিদ্র নহে। কোন শ্রেণী পায়ের নখ কাটিবে না বলিতেছে। কোন শ্রেণী বলিতেছে যে, তাহারা আর পা ধুইতে জল তুলিয়া দিবে না। আবার কেহ কেহ একথাও বলে যে, তাহাদিগকে থালাবাসন ধুইতে নাই, তামাক সাজিতে নাই কিম্বা তবিতরকারী বহিয়া লইয়া যাইতে নাই। যাহারা শত-সহস্র বৎসর দেবালয়ে প্রবেশাধিকার পায় নাই—এমন কি, প্রকাশ্য রাজপথে যাহাদের কুকুর-শৃগালের মতও পরিভ্রমণের অধিকার ছিল না, তাহারাও আজ তাহা দাবি করিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে তাহাদের সে দাবি স্বীকৃতও হইতেছে।

ভগবানের অভিসম্পাতে এদেশে মানুষ জন্মাইয়া ছোট হয়। শত-সহস্র প্রকারে সে উন্নত হইলেও, তাহার তথাকথিত জন্মগত ক্ষুদ্রত্ব এদেশের সমাজ এখনও কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। এদিকে যাহারা জন্মাইয়া বড়, তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুতরাং এদেশে কখনও শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রকৃত জাগরণ হইলে, এদেশে প্রলয় উপস্থিত হইবে। রুশের সহিত কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির সহিত ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়ের তুলনা হয় না।

কারণ জন্মগত পার্থক্য অন্য কোন দেশে নাই। এখানকার প্রলয়, রুশের প্রলয় অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক নির্ম্মম হইবে। আমাদের শাসক-সম্প্রদায় এদেশের intelligensiaর সহিত মীমাংসা করিতে যত বিলম্ব করিবেন, ভারতের সেই মহা-ভয়ঙ্কর প্রলয় ততই নিকটবর্ত্তী হইতে বাধ্য। এই বিস্তৃত ভারতভূমে তখন মুষ্টিমেয় ইংরাজ কতদূব কি করিতে পারিবেন, তাহা এখনই চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সে সময়ে রুশ, জার্ম্মাণী ও জাপান এবং আফ্‌গানিস্থান ও তুরস্ক যে স্থির থাকিবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে?

অথবা হয়তো এমনও হইতে পারে যে, এ সকলের কিছুই কোথাও ঘটিবে না। এদেশ হইতে ইতিপূর্ব্বে দুইবাব শান্তিতে ও বিনা রক্তপাতে জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছিল। একবার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধদেবের সময় এবং আর একবার সেদিন এই নদীয়া-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে। ইহা আমি অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া মনে করি যে, বাংলাব অধিবাসিগণ দিনে দিনে যত বেশী স্বাধীনতাকামী হইবেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের পরাধীনতার কারণ-গুলি ক্রমে ক্রমে তত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শেযে যখন স্বরাজ-নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন যে, তাঁহাদের জন্মগত জাতিভেদের ধারণাকে পবিমার্জ্জিত না কবিলে তাঁহারা কিছুতেই স্ববাজ-নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না, তখন এদেশে বুদ্ধ কিম্বা চৈতন্যের মত এক মহাপুরুষেব আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তিনি স্ববাজ-নদীর তীরে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঞ্চালনে যাহা কিছু কবিতে বলিবেন, সপ্তকোটি বাঙ্গালীব নিকট তাহাই ভগবানের আদেশ বলিয়া নির্ব্বিচাবে গ্রহণীয় হইবে। বিবাহ ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ ব্যতীত প্রায় অন্য সকল ব্যাপারে জন্মগত জাতিভেদ যেমন ইতিমধ্যেই এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তেমনি এদেশেব জনসাধাবণ মহাপুরুষগণের বাণী আন্তবিক আগ্রহের সহিত চিবদিন শুনিয়া আসিতেছে। এসিয়াখণ্ড মহাপুরুষগণের আদি বাসস্থান এবং প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে ভারতবর্ষ সেই এসিয়াখণ্ডের মহা-গৌরবেব বস্তু। এদেশের লোক বিশ্বাস করে যে, জগতে গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান যুগে-যুগে এ সংসারে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের গ্লানি নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং ভারতে অবতারের আবির্ভাবেব আর বেশী বিলম্ব নাই।

তারপর, জন্মগত জাতিভেদের ধারণা পরিমার্জ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যে সামান্য-সামান্য সাম্প্রদায়িক বিরোধ কখন-কখন পরিলক্ষিত

হয়, তাহা এদেশ হইতে চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইবে। এদেশ স্বাধীন হইলে, এই বিরোধ বহুপূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়া যাইত। যাহা অন্যায় তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের নিকটেই অন্যায়। আমাদের স্বাধীন শাসনযন্ত্র সেই অন্যায়কে আইনের দ্বারা বেআইনী করিত। হিন্দুর যাহা করা উচিত নয় তাহা করিলে সে যেমন জেলে যাইত, তেমনি মুসলমানের যাহা করা অনুচিত তাহা সে করিলে সেও মার্জ্জনীয় হইত না। কিন্তু নিরপেক্ষতার বিরাট অভিনয়ে আমাদের শাসকসম্প্রদায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। এবং সেই অভিনয়েব অন্তরালে কোথায় যে কি ঘটিতেছে তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতে অসমর্থ। হিন্দুর মত মুসলমানগণ শিক্ষিত হউক এবং হিন্দুর মত মুসলমানগণ বড বড় রাজকর্ম্মের অধিকারী হউক, ইহা আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কারণ তাহারা শিক্ষিত হইলে এবং রাজকর্ম্মের ভিতরের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলে তাহারা যে হিন্দুব মত সমানভাবে আমাদের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীব উচ্ছেদ কামনা করিবে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এদেশে হিন্দু-স্বরাজ কিম্বা মুসলমান-স্বরাজেব স্থান নাই, কেবল এক ভারতীয় স্ববাজেরই স্থান রহিয়াছে। আমাদের শাসকসম্প্রদায় তাঁহাদের শাসন-প্রণালীকে অটুট রাখিবাব জন্য আজকাল যাহা কিছু করিতেছেন, আমি তাহার মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্ত স্পষ্টই নিরীক্ষণ কবিতেছি। কাবণ তদ্দ্বারা বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইতেছে। বর্ত্তমানের আপাতঃ মধুবতায় ডুবিয়া গিয়া ইংবেজদিগেব মত কোনও বিশিষ্ট জাতি ভবিষ্যৎকে এইরূপে অবজ্ঞা করিয়াছিল, এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল—নাই বলিলেও চলে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম যে আমাদের শাসক-সম্প্রদায়কেও শীঘ্র আমাদের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমি সত্যই বুঝিতে পারি না যে, তাঁহাবা কি জন্য আশঙ্কা করেন যে আমাদেব স্বরাজ হইলে তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিব। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি আজই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করি, তাহা হইলেও আমাদিগকে আগামী ৩০।৪০ বৎসব ধরিয়া বিদেশ হইতে নানা জিনিষ আমদানী করিতে হইবে। তাঁহাদের শাসনপ্রণালীকে ধন্যবাদ, সেইজন্যই আমাদের এই অবস্থা। কিন্তু তাঁহারা যদি আশা করেন যে, ৩০।৪০ বৎসর পরেও তাঁহাদের অবাধ-বাণিজ্য এদেশে অটুট থাকিবে, তবে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ ৩০।৪০

বৎসরের মধ্যে যদি এদেশ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন না করে কিম্বা ততদিনেও যদি এদেশে Responsible Government সংস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে তাহার পর এদেশবাসী নিশ্চয়ই বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে। অন্ততঃ পক্ষে ততদিনে ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের এদেশ হইতে যে বিশেষ কোন লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। কারণ আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা Responsible Government হইতে যত বিলম্ব হইবে, আমাদেব বংশধবগণ ইংলণ্ডের প্রতি তত বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবেন এবং যে পরিমাণে তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইবেন, ঠিক সেই পরিমাণেই এদেশ হইতে বিলাতি দ্রব্য ব্যবহাব উঠিয়া যাইবে। তারপর, ৩০।৪০ বৎসর পরে পৃথিবীর ইতিহাসই পবিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ততদিন ভারত পবাধীন থাকিলে, সে সম্ভাবনা প্রবলতম বলিয়াই মনে হয়। কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যাহাবা উঠিয়াছে, তাহাদিগকে এইবারে পড়িত হইবে এবং যাহারা ভূপৃষ্ঠে এখনো বিলুণ্ঠিত রহিয়াছে, এবারে তাহাদেবই উঠিয়া দাঁড়াইবার পালা। সুতবাং আমাদের শাসকগণ তাঁহাদেব শাসনপ্রণালীর মূলনীতিকে শীঘ্র বহুল পবিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য।

আদর্শ ও বাস্তবে কিরূপ সমন্বয় হইবে

আমি আদর্শ স্বরাজ এবং সেই স্বরাজ লাভের আদর্শ পন্থাব কথা বলিযাছি। আমি আরও বলিযাছি যে, আমবা যেমন আদর্শ স্ববাজ লাভেব জন্য এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত নহি, তেমনি আমাদেব শাসকগণও অচিবে এদেশেব শাসন-প্রণালীব মূলনীতিকে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য। নচেৎ নিকট-ভবিষ্যতে ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডেবই অধিক ক্ষতিব সম্ভাবনা বহিয়াছে। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে—আমাদের বাস্তব জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আমবা কতটুকু খর্ব্ব করিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, আমি আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে চিরদিনের জন্য খর্ব্ব কবিতে বলিতেছি না, কেবল অস্থায়ীভাবে অল্পদিনের জন্য তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিতে বলিতেছি।

এমন একদিন ছিল যখন রাজারাণী কিম্বা সম্রাট-সম্রাজ্ঞীকে বাদ দিয়া এ পৃথিবীতে কোন শাসন-প্রণালীর কল্পনা করা যাইত না। কোথাও তাঁহারা ভগবানের প্রতিনিধি ছিলেন, আবার কোথাও তাঁহাদিগকে ঘোরতর

স্বেচ্ছাচারী দস্যু বলিয়া লোকে মনে করিত। ফলে ফরাসী দেশের শাসন-প্রণালী হইতে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী সর্ব্বপ্রথমে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং আজ রাশিয়া, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট-সম্রাজ্ঞীও সে সকল দেশের শাসনযন্ত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাশিয়ার সম্রাট-বংশের পরিণামের কথা চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথায় আপ্লুত হইয়া উঠে। তুরস্কের যে সম্রাট স্বয়ং মহম্মদের বংশধর ছিলেন, আজ তুরস্কের শাসন-প্রণালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে দিনাতিপাত করা ব্যতীত তাঁহারও কোন উপায়ান্তর নাই। আজ সমগ্র ইউরোপ-খণ্ড সম্রাট-সম্রাজ্ঞীবিহীন হইয়াছে। আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেও আজ কোন সম্রাট-সম্রাজ্ঞী নাই। এশিয়া-খণ্ডের চীন সাম্রাজ্য হইতেও সম্রাট-সম্রাজ্ঞী তিরোহিত হইয়াছেন। সুতরাং আজ সমগ্র পৃথিবীর মাত্র দুইটী দেশে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী বর্ত্তমান আছেন এবং তাহা ভারতবর্ষ ও জাপান। আবার জাপান এবং ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, জাপানেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু কেবল ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। পৃথিবীর যে সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেশে সেদিন পর্য্যন্ত রাজা-রাণী বর্ত্তমান ছিলেন, সে সকল দেশের কোন-কোন শাসনযন্ত্র হইতে ইতিমধ্যে রাজা-রাণী অন্তর্হিত হইয়াছেন। আবার যেখানে-যেখানে রাজা-রাণী এখনও শাসন-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন, সেখানে সেখানে তাঁহারা জনমতের নিকট মস্তক নত করিয়া তাহাদের ভৃত্য কিম্বা কর্ম্মচারীর মতই শাসন-প্রণালীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন।

মোট কথা এই যে, পৃথিবীর সকল শাসনযন্ত্রই আজ জনমতের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু Republic ও Monarchyর মধ্যে আদর্শে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, আজও তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই। আমার মনে হয় যে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী যতদিন অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতেছে, ততদিন তাহার কোনও শেষ মীমাংসা হইবে না। কারণ ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীতে জনমতের প্রাধান্য যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি Monarchyও সে দেশে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে দেশের রাজা সে দেশের প্রজার শাসক নহেন—তিনি তাহাদের ভৃত্য। ইংরাজ জাতির উপর কোন কর ধার্য্য করিবার তাঁহার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার

কোনও স্বাধীন অভিমত তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। তাঁহাকে চিরদিন ইংলণ্ডের যে State Religion বা সরকারী ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মের উপাসক থাকিতে হয়। কখনও তিনি Piotestant ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া Roman Catholic হইতে চাহিলে কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে ইংলণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণের ভোটের দ্বাবা বৎসরে ৪০।৪৫ হাজার পাউণ্ড কিম্বা ৬।৭ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহাকে রাজকার্য্য চালাইতে হয়। দুই জনে মতভেদ হইলে, প্রধান মন্ত্রীর মতই শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া ইংলণ্ডেব রাজ-কার্য্যে কোনও প্রকাবে প্রতিবন্ধকতা করিলে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার উল্লিখিত বাৎসরিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধ-ঘোষণায় ও শান্তিস্থাপনে তাঁহার নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সমূহ ব্যাপাবেও প্রধান মন্ত্রী তাঁহার উপবে! ইংলণ্ডের যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ এবং নৌ-সেনাপতি বহিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাব একার হুকুম মত কার্য্য কবিতে বাধ্য নহেন। ইংলণ্ডেব প্রজাসাধাবণের উপর যখন যে কর ধার্য্যের কথা উঠে, তাহাদেব প্রতিনিধিগণই সে দেশের পার্লিয়ামেণ্টে তাহাব মীমাংসা করেন। সে দেশের শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন, পুলিশ ও বাজস্ব বিভাগ, Army ও Navy প্রভৃতি সকল বিষয়েই শেষ মালিক সে দেশেব আইন-সভা। সে দেশেব বাজা কিম্বা কোন বাজ-প্রতিনিধি দেশের আইন সভার কোনও সিদ্ধান্তেব উপব কোন প্রকাবে হস্তক্ষেপ কবিতে পাবেন না।

আমাদেব পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সময় আমবাও যে সেই ধবণেব শাসন-প্রণালী প্রচলন কবিব, সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। হয়তো আমাদের কোন State Religion এবং রাজা কিম্বা সম্রাট থাকিবে না। আমাদের শিক্ষার আদর্শ বিভিন্ন বিষয়ে নিশ্চয়ই যেমন বিভিন্ন হইবে, তেমনি আমাদেব শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার অনেকাংশে পঞ্চায়েতগণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মোটের উপব, স্বাধীন ভারতেব শাসন-প্রণালী যে ইংবাজ শাসন-প্রণালীর অনুকরণে সুগঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের এখন সেই অধিকারগুলি বিশেষ আবশ্যক, যাহার দ্বারা নিকট ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের শাসনযন্ত্রকে আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি।

সেই অধিকারগুলির সমষ্টিকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ তাহাকে Provincial Autonomy বলিয়াছেন, কেহ বা Equal Partnership এবং কেহ বা তাহাকে Dominion Status বলিয়াও বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। অন্যদিকে political catch phrase-এর অনেক রকম অর্থ হয় বলিয়া লর্ড বার্কেনহেড, লর্ড রেডিং ও স্যার হিউ ষ্টিফেনসন প্রভৃতি আপত্তি তুলিয়াছেন এবং স্যার ফ্রেডারিক্ হোয়াইট তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একখানি এত বড় পুস্তক রচনা করিয়া তাহা ভারত গভর্ণমেণ্টের খরচায় ছাপাইয়াছেন। ভক্তিভাজন দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এইরূপ আপত্তির কথা নিশ্চয়ই জানিতেন, সেইজন্য বোধ হয় তিনি ফরিদপুরে সাধারণ ভাষাতেই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় আইন সভা ও জাতীয় মহাসমিতির এ সম্বন্ধে অভিমত কি, তাহাও পরে-পরে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সেই অভিমত সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তাহা খুব সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার নহে। আমি সেইজন্য স্থির করিয়াছি যে, আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি এইখানে সে সম্বন্ধে আমার অভিমত কি, তাহা যতদূর পারি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া বলিব। আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি, সেজন্য আপনারা আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

মনে থাকে যেন, আমি এখানে যাহা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া যাইতেছি, তাহা আমাদের নিজেদের আদর্শ ও বাস্তবে সমন্বয় সংস্থাপনের জন্য—অন্য কাহারও সহিত মীমাংসার কথা তুলিবার জন্য নহে। আমি মনে করি যে, আমাদের আদর্শ ও বাস্তবে আমরা যতদিন সমন্বয় সংস্থাপন না করিব, ততদিন আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি অনিশ্চিত থাকিবে, এবং যতদিন আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি অনিশ্চিত থাকিবে ততদিন যতই আমরা কাগজে মরি এবং কলমে কাঁদি না কেন, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার আমাদের এখনি কোন শক্তি না থাকায়, আমাদিগকে কিছুদিনের জন্য তাহা স্থগিত রাখিতে হইবে। তবে আমি একথা বলিতেছি না যে, সেজন্য আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, কথকতা ও যাত্রাদিতে সেই আদর্শের উৎকর্ষ সাধনে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব। কংগ্রেসের মূলনীতিতে কিন্তু এখন তাহার স্থান হওয়া উচিত নহে, কারণ কেবল নিষ্ফল বাহ্যাড়ম্বরে জগতের নিকট কংগ্রেসের আত্মসম্মানের লাঘব হইবে। আমাদের এখন Revolution করিবার ক্ষমতা নাই; থাকিলেও

তাহাকে জয়যুক্ত করিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। সেইজন্যই কংগ্রেসের মূলনীতিতে এখন তাহার স্থান হইবে না। যদি কখন এদেশের লোক Revolution করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে, তবে সেই দণ্ডেই কংগ্রেসের মূল-নীতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ স্থান পাইবে। তবে প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোনও গোপন কর্ম্মপদ্ধতি থাকিবে না। প্রত্যেক কংগ্রেস ও প্রত্যেক প্রাদেশিক সম্মিলনে এইভাবে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া বলিলে, একদিকে যেমন আদর্শের উৎকর্ষ সাধন হইতে থাকিবে, অন্যদিকে তেমনি বাস্তবকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া আমরা আত্ম-প্রতারণায় কখনও প্রতারিত হইব না।

আমি সত্যই বুঝিতে পারি না, আমাদের শাসক-সম্প্রদায় এজন্য কেন দুঃখিত এবং বিচলিত হ'ন্। হয় তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে যবে হউক একদিন Responsible Government দিবেন, নচেৎ দিবেন না। যদি তাঁহারা আমাদিগকে Responsible Government দেন, তাহা হইলে তাহার পরদিন হইতেই আমরা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধিকারী হইলেও তাঁহাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। আর তাঁহারা যদি আমাদিগকে কখনও Responsible Government দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ হউক কাল হউক এদেশে Revolution অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিধির বিধানে একথা কখনও লেখা নাই যে, এই তেত্রিশ কোটী নরনারী চিরদিনই ইংরাজের পদানত থাকিবে। সুতরাং আমি প্রকৃতই বুঝিতে পারি না যে, আমাদের শাসক-সম্প্রদায় আমাদের স্পষ্ট কথায় কেন কষ্ট বোধ করেন।

যাহা হউক, আমরা অপারগ বলিয়া এখন কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডের রাজার অধীনে থাকিতে আমাদিগকে স্বীকৃত হইতে হইবে এবং ইংলণ্ডের প্রজাগণ ইংলণ্ডের রাজার অধীনে থাকিয়া আজ যে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী, আমরাও এখন সেই রাজার অধীনে অধীনতা স্বীকার করিয়া সেই সকল অধিকারের অধিকারী হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ইহাই এখন আমাদের জাতীয় মহাসমিতির আদর্শ হওয়া উচিত। ইহা যেমন একদিকে ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত, তেমনি অন্যদিকে আমি বিশ্বাস করি যে, অদূর ভবিষ্যতে এই অধিকার অর্জ্জন করিবার মত আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহার আলোচনা বিস্তারিত ভাবে পরে করিব। এখন, ইংলণ্ডের রাজা যে তাঁহার

প্রজা-সম্প্রদায়ের ভৃত্য, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের বিনানুমতিতে তিনি কোনও আইন প্রণয়ন কিম্বা কর ধার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য হইতে যে বিপুল অর্থাগম হয়, তাহার একটি কপর্দ্দকও নিজ খরচের জন্য গ্রহণ করিবাব তাঁহার ব্যক্তিগত কোনও অধিকার নাই। তিনি ইংলণ্ডের Constitutional Figurehead—তাঁহাব ভিতব দিয়াই ইংলণ্ডেব জনমত অভিব্যক্ত হয়। আমাদেব সম্রাট যিনি, তিনিই ইংলণ্ডের রাজা, কিন্তু তিনি এদেশে বসবাস করিয়া এদেশের রাজকার্য্য পরিচালনা কবেন না। এদেশে তাঁহাব প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা যদি এদেশবাসীর Constitutional Figurehead হ'ন্—তাঁহাদেব ভিতর দিয়াই যদি এদেশেব জনমত অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে এক পরাধীনতাব আপত্তি ছাড়া আব কোনও আপত্তি থাকিতে পাবে না। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সে আপত্তি উত্থাপন কবিবাব মত আমাদেব এখনও উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জিত হয় নাই। সুতবাং ইহাকেই এখন আমবা আমাদেব রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ কবিব এবং যাহাতে এই আদর্শ বাংলা তথা ভারতবর্ষেব প্রত্যেক নবনারীর নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। আমি মনে কবি যে, আমাদেব আদর্শ ও বাস্তবকে এখনকার মত এইরূপে সমন্বিত করিলে আমরা কোনও দোষে দূষণীয় হইব না।

কিন্তু আমাদেব শাসক-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের মালিক ইংরাজ জাতি আমাদিগকে আমাদেব এই সমন্বিত আদর্শের উৎকর্ষ সাধনে আন্তরিক সাহায্য করিবেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পাবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত অভিমত কি, তাহা তাঁহারা কখনও প্রকাশ কবিয়া বলিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নামে সচরাচর যে সকল অভিমত মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, তাঁহারা না কি বলেন যে, আমাদের ভোটদাতাগণ এখনও সম্পূর্ণরূপে পারদর্শিতা লাভ করেন নাই, সুতরাং আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। ইহার যে ঠিক অর্থ কি, তাহা আমি আমার স্থূল বুদ্ধিতে পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, সমগ্র ভারতের সকল ভোটদাতা কিম্বা অধিকাংশ ভোটদাতা এখনও এ

সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই, তাহা হইলে ইহার যে একটা অর্থ আছে তাহা উপলব্ধি করা যায় এবং বোধ হয় আগামী নির্ব্বাচনের পর আমাদের গভর্ণমেণ্টের সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকিবে না। কিন্তু ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, এদেশেব ভোটদাতাগণ এখনো তাঁহাদের ভোটের মূল্য কি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আমাদের শাসকগণ আমাদিগকে বিপ্লবের জন্য আহ্বান করিতেছেন। কারণ ভোটের মূল্য কি তাহা জানিতে পারিলে অর্থাৎ ভোট অনুসারে কার্য্য না হইলে ভোটদাতাকে সেজন্য যে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা ভোটদাতাগণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, এদেশে বিপ্লব ছয় মাসে সম্ভবপব হইবে। জানি না, আমাদের শাসকগণ সেই উদ্দেশ্যেই এদেশের ভোটদাতাগণের অনভিজ্ঞতার কথা বলেন কি না। অবশ্য যে জাতি কয়েক শতাব্দীর ত্যাগ ও জীবন বিসর্জ্জনেব ভিতর দিয়াই তাঁহাদের শাসন-প্রণালীকে বর্ত্তমান আকারে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন, সে জাতির পক্ষে এইরূপ একটা কিছু আশা করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহাদেব মনে রাখা উচিত যে, এদেশ সেজন্য যেদিন প্রস্তুত হইবে, সেই দিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এদেশবাসীকে সেজন্য প্ররোচিত করিলে, তাঁহারাই তাহার ফলভোগী হইবেন। তবে একথা আমি দৃঢতার সহিত বলিতেছি যে, ভোট পরিচালনা অর্থে যদি নিজ-নিজ স্বার্থ রক্ষা করা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা এই জাতি সে বিষয়ে কম পারদর্শী নহে। যত দিন যাইবে, গভর্ণমেণ্ট ততই বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশের ভোটদাতাগণকে মূর্খ মনে করিয়া তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। লেখাপড়া না জানিলেই লোকে মূর্খ হয় না। বিশেষতঃ, যাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত বিনা লেখাপড়ায় নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে কেবল মূর্খেরাই মূর্খ বলিয়া থাকে। তাহারা সুখনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একদিন নিদ্রা-ভঙ্গের পর যদি দেখিতে পায় যে, তাহাদের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তখন যেন তাহারা কেবল তাহাদের অদৃষ্টকেই দোষ দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শাসকগণ নাকি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাদের এখনকার দাবি ফলবতী হইলে, আমরা নিকট-ভবিষ্যতে যে আর কোনও দাবি করিব না তাহার নিদর্শন কোথায়? তাঁহারা নাকি ভয় করেন যে, আমাদের

জাতীয় মহাসমিতি এবং মহাত্মা গান্ধী নিকট-ভবিষ্যতে যে আবার নূতন কিছু কবিবেন না, তাহা কে বলিল ? সেইজন্য নাকি তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যতদিন না জাতীয় মহাসমিতি এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুচরবর্গের মধ্যে ছত্রভঙ্গের ভাব পরিলক্ষিত হয়, ততদিন তাঁহারা বেগুলেশন ও অডিন্যান্সের দ্বারা এদেশকে সুশাসনে রক্ষা কবিবেন। নেড়া যেমন একবাবেব বেশী বেলতলায় যায় না, তেমনি সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ঘর-পোড়া গরুও ভয় পায়। গতবারে এদেশের কত বড বড রাজনীতি-বিশাবদ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, শাসন-সংস্কারকে তাঁহারা দশ বৎসবেব জন্য নিশ্চিন্ত কবিয়া দিবেন, কিন্তু ইতিহাস অবগত আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পাবেন নাই। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় কাউন্সিল নির্ব্বাচনের শেষে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাহাদেব কেহ কেহ আমাদের তথাকথিত সংস্কৃত শাসনযন্ত্রের মধ্যে স্থান লাভ কবিতেই অপারগ হইযাছেন। সুতবাং আমাদেব শাসকগণ এবাবে যে কথঞ্চিৎ দৃঢতা অবলম্বন করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই দৃঢতার অভিনযে তাঁহারা যে তাহাদেবই সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাহাবা অনুভব কবিতে পারিতেছেন না।

আমাদের এখনকাব দাবি কি ?—না, আমাদের প্রচলিত শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে সুসংস্কৃত কবা হউক, যেন তাহা আমাদের আদর্শ স্বরাজলাভেব প্রতিবন্ধক না হইয়া সহায়ক হয়। ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনে যে জাতি গঠনেব সেরূপ কোন সুবিধা নাই, তাহা পূর্ব্বে অনেকে না জানিলেও এখন সকলের বোধগম্য হইয়াছে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এই শাসন-সংস্কাবকে গ্রহণ করাইবার জন্য অমৃতসহবে কি চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহা যেমন কাহারও অবিদিত নাই, তেমনি এখন তিনি সে সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন তাহাও আমবা অবগত আছি। আমাদেব শাসকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনকে আমাদের জাতি গঠনের সহায়করূপে যতদিন না আমরা পাইতেছি, ততদিন আমরা তাহাব বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবই করিব। রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্স মাঝে মাঝে সে আন্দোলনকে লোকচক্ষুর সম্মুখে কথঞ্চিৎ প্রশমিত কবিতে পারে, কিন্তু যতদিন না ভারতবাসী জাতিগঠনের পূর্ণ অধিকার লাভ করিতেছে, ততদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে হইলেও তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা ধ্রুবতারার মতই তাহাদের হৃদয়াকাশে বিরাজিত থাকিবে। কারণ জন্মই যেমন মৃত্যুর বিজ্ঞাপন, তেমনি পরাধীনতার

অনুভূতিই স্বাধীনতার অগ্রদূত। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় তেত্রিশ কোটী নবনারীর হৃদয় হইতে সে অনুভূতিকে কিছুতেই লুকাইয়া রাখা যাইবে না। রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্সের দ্বারা তাহার জন্য যতই চেষ্টার আধিক্য দেখা যাইবে, ততই তাহা প্রভাত-তপনের মত সমুজ্জ্বল হইয়া রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করিবে। সুতরাং নিকট-ভবিষ্যতের সকল আশঙ্কাকে দূরীভূত করিতে হইলে, আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে যে, তাহা যে আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠনের সহায়ক, তাহা যেন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ভারত জাগিয়াছে, তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিবার প্রয়াস বৃথা। সে প্রয়াসে সে দিনে-দিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাই প্রকৃতির নিয়ম।

আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত

সে যাহা হউক, আমাদের সমন্বিত রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে, আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই এখন আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করিব। কংগ্রেস হইতে আমাদের জন্য যে কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি এবং তাহার সহিত আমার বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি অনেক সময় কর্ম্মপদ্ধতিতেই আবদ্ধ থাকে—কাজে-কর্ম্মে তাহার কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাদিগকে দুই-চারিটা কথা নিবেদন করিব। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আপনারা কেহই আমার এই ব্যক্তিগত অভিমত গ্রহণ করিতে একেবারেই বাধ্য নহেন।

আমি মনে করি যে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপযোগী এক বিরাট mentality সৃষ্টি করিতে হইবে। কারণ মানুষকে কোন কাজ করিতে বলিলেই, সে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সুসম্পাদন করিতে পারে না। কর্ম্মশক্তি তাহার দেহে উপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মানস-রাজ্যে সেই শক্তিকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কুরিত করিতে হয়। আবার তাহাকে শীঘ্র কোন ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত করিতে হইলে, যে মালমসলার দ্বারা অর্থাৎ যে কারণ, আবশ্যকতা ইত্যাদির দ্বারা তাহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে, এদেশের কোনও প্রতিপত্তিশালী নেতা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রথম কয়েক বৎসর তৈলমর্দ্দন ও আবেদন-নিবেদনে প্রায় সকলেই ব্যস্ত থাকায় এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতি বৎসর বড়দিনের ছুটীর আমোদ-আহ্লাদে আবদ্ধ রাখায় এদেশের জনসাধারণের mentality সে দিকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। সত্য কথা বলিতে হইলে, সকলকে এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, আদিযুগে কংগ্রেসকে এদেশের ব্যবহারজীবিগণই তাঁহাদের একচেটিয়া জমিদারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা এদেশের অন্যান্য শিক্ষিত অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা লোকের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আমাদের লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা তখনকার দিনে শতকরা ২।১ জনের বেশী না থাকায়, এদেশের জনসাধারণের মন তখন সেদিকে একেবারেই আকৃষ্ট হয় নাই। মধ্যযুগে লাট-বেলাটকে খুন-জখমের যে চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণের কোন স্থানই ছিল না। বরং তাহাদিগকে লুকাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের জন্য অনেকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছিলেন। অর্থাৎ আদিযুগে যেমন আমরা গভর্ণমেণ্টের দয়ার উপর আমাদের সুখদুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলাম, তেমনি মধ্যযুগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতবাসীর চেষ্টার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। ফলে আদি ও মধ্যযুগে আমাদের স্বরাজ-সাধনার মূলভিত্তি কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই কিম্বা করিয়া থাকিলেও কেহ যে সেই আবিষ্কৃত পথে কোন কার্য্য করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, তাহা অতীব সত্য। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীই পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ফললাভের আশা থাকিলে জনসাধারণকে বাদ দিয়া আমাদের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনই চলিতে পারে না। বিগত ১৯২০ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসমুদ্র-হিমাচলকে যেরূপভাবে আলোড়িত করিযাছিলেন, ভারতের ইতিহাসে স্বয়ং বুদ্ধদেবের সময়েও সেইরূপ হইয়াছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে—আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিগকে তাঁহারই সেবকরূপে বাংলার সপ্তকোটি নরনারীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং যাহাতে বাংলার দুর্ব্বল নরনারী কোন কারণে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুদ্ধের সময় অবসর গ্রহণ না করে, সেইজন্য

তাহাদের mentalityকে তদুপযুক্ত করিয়া গঠন করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে—কি কি উপায়ে আমাদের সেই mentality সৃষ্টি হইতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে আমাদের তরলমতি বালক-বালিকার শিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ কবিতে হইবে। সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এখন এই হইবে যে, ইংলণ্ডেব রাজার অধীনে ইংরাজগণ তাঁহাদের দেশে যে অধিকার উপভোগ করিতেছেন, এদেশের বালক-বালিকা লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইলে যেন সেই অধিকাব অর্জ্জন কবিতে প্রাণমন উৎসর্গ করে; সে শিক্ষা অবৈতনিক হইবে এবং তাহাতে জাতি কিম্বা বর্ণভেদ থাকিবে না। ববং যে সকল সামাজিক দুর্নীতির জন্য আমাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছে, তাহাতে সে সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা থাকিবে। আপাততঃ প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে primary শিক্ষা, প্রত্যেক মহকুমায় secondary শিক্ষা এবং প্রত্যেক জেলার সদরে collegiate শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদেব কোন বিষয়েরই এখন পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত পুস্তক নাই—এমন কি, সকল স্থানে উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়া যায় না। আমাদিগকে কতকগুলি উপযুক্ত ত্যাগী চিরকুমার শিক্ষক সংগ্রহ কিম্বা প্রস্তুত কবিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে সকল শ্রেণীর ছাত্রেব জন্য উপযুক্ত পুস্তক রচনা করাইয়া তাহা বিনা লাভে ছাত্রগণকে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই বৃহৎ ব্যাপারে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেইজন্য আমি আপনাদের সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধীকে এই নিবেদন জানাইতেছি যে, তিনি বাংলায় আসিয়া বাংলার ২৬।২৭টি জেলায় সর্ব্বাগ্রে এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক জেলার জন্য আপাততঃ দুই লক্ষ করিয়া মোট ৫০।৫৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইলে, তাহার সুদেই এই প্রদেশের জাতীয় শিক্ষা এখন সুচারুরূপে চলিয়া যাইতে পারে। মহাত্মা ব্যতীত অন্য কাহাবো চেষ্টায় যেমন ইহা অসম্ভব, তেমনি বাংলা ব্যতীত অন্য কোনও প্রদেশে এত টাকা এখন উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। মহাত্মাকে এ প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় এইজন্য পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রত্যেক থানার জন্য ২।৩ দল কর্ম্মী আবশ্যক। প্রত্যেক দলে ৪।৫ জন অক্লান্ত-কর্ম্মী ও দেব-চরিত্র সেবক থাকিবেন। তাহাদের সঙ্গে একটী করিয়া হারমোনিয়ম থাকিবে এবং সম্ভব হইলে একজন ভাল গায়ককে তাঁহারা সঙ্গে লইবেন। প্রত্যেক দল

একমাস করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। প্রথম দল এক মাসের পর এক মাসের জন্য বিশ্রাম করিতে গেলে, দ্বিতীয় দল সেই কার্য্যে যোগদান করিবেন। আবার এক মাস পরে প্রথম দল ফিরিয়া আসিবেন। এইরূপে সে থানার প্রত্যেক বিভিন্ন অধিবাসীর নিকট হইতে যতদিন না ভিক্ষা সংগৃহীত হইতেছে, ততদিন সেখানে কাজ চলিতে থাকিবে। তারপর সেবকদল অন্য থানায় যাইবেন। ভিক্ষায় কেবল যে অর্থ সংগ্রহ হইবে, এমন মনে হয় না। ধান এবং চালও কোন কোন জেলায় সংগৃহীত হইতে পারে। তাহা রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং নিকটবর্ত্তী হাটে কিম্বা গঞ্জে উপযুক্ত মূল্যে যথাসময়ে তাহা বিক্রয় করিবার ভার কোন কোন সেবক গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একজন পাচক ও একজন চাকর থাকিবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্র সেই থানার জেলাবোর্ড বা গভর্ণমেণ্টের ডাক্তারখানার যতদূর সন্নিকটে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেবকগণকে ভরণপোষণ তো দিতেই হইবে, আবশ্যক হইলে কার্য্যের সময় তাঁহারা কিছু কিছু মাসহারা পাইবেন। পাচক, চাকর প্রভৃতি বেতন ও আহার পাইবে। এই সকল খরচ প্রথমে প্রত্যেক জেলার কোনও নেতাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু পরে উপযুক্ত পরিমাণে ভিক্ষা সংগৃহীত হইলে তিনি তাঁহার পাওনা মিটাইয়া লইবেন। মহাত্মা গান্ধী বাংলার প্রত্যেক জেলার বড় বড় সহরে গিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিয়া আসিবেন। আমি বিশ্বাস করি যে, এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এক বৎসর সারা বাংলায় চেষ্টা করিলে, বাংলার সপ্তকোটী নরনারীর নিকট হইতে নিশ্চয়ই ৫০।৫৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের এই জাতীয় শিক্ষায় মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

তারপর এই জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া, কংগ্রেস ও খদ্দর সমিতি—সেবা ও প্রচার প্রতিষ্ঠানসকল ধীরে ধীরে বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। আজকাল কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা বাড়াইবার জন্য ঘন-ঘন হুকুম আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য পল্লীগ্রামে বন্ধ থাকায় পল্লীবাসিগণ যেমন সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করে না, তেমনি তাহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বত্র কংগ্রেস কর্ম্মীর অভাবও পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের ভরণপোষণের ভারটুকু লইবার জন্যও এখন কেহ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে যখন জাতীয়

শিক্ষকগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইবে, তখন হইতেই কংগ্রেস কর্ম্মিগণ পল্লীগ্রামে আশ্রয় পাইবেন এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও খদ্দর পল্লীগ্রামের নিজস্ব সম্পত্তি হইবে। সেবার দ্বারা পল্লী-উপকণ্ঠকে আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারিলে, কর্ম্মিগণ খদ্দর ও কংগ্রেস প্রচারের অর্দ্ধেক কার্য্য সেই সঙ্গেই সমাধান করিতে পারিবেন।

জাতীয় ভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা বালক-বালিকাগণের হৃদয়মনকে যেমন আদর্শ স্বরাজের জন্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, তেমনি বিস্তৃত এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারের দ্বারা পরিণতবয়স্ক নরনারীর মনকেও সুদৃঢ় ও সুসংস্কৃত করিতে হইবে। তাহাদের দেওয়া খাজনা ও অন্যান্য কর কিরূপে ব্যয়িত হয়, তাহাদের জলাভাব কেন হয় এবং জলনিকাশ কেন হয় না, তাহাদের ধানজমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে কিছু করিবেন কিনা, তাহারা বিনা চিকিৎসায় কুকুর-শৃগালের মত কেন মারা যাইতেছে, তাহাদের পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের অভাব কিছুতেই দূর হইতেছে না কেন, তাহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার ব্যয় কেন দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের ঋণজাল কিসে তাহারা ছিন্ন করিতে সক্ষম হইবে, খদ্দর ব্যবহারের উপকারিতা কি এবং কিরূপে তাহা প্রত্যেক গৃহস্থ প্রস্তুত করিতে পারে ইত্যাদি সকল বিষয়ের বহুল প্রচার আবশ্যক। পল্লীর প্রাণ অসংখ্য জ্বালাযন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বারি-সিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গেই ফলোৎপাদন হইবে। সেবকগণ কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা নিজেরা যাহাতে কোন প্রকারে এই সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত না হ'ন, সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইতে হইবে। অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতির দিকে যেমন আমরা মনোযোগ দিব, তেমনি শ্রমিক-সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিবার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকিবে। মোট কথা, একদিকে যেমন শিক্ষা ও প্রচারের দ্বারা পল্লীবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা চলিবে, অন্য দিকে তেমনি কর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগকে সকল বিষয়ে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও অধিকার আদায়ের সুযোগ উপস্থিত হইলেই কিম্বা গভর্ণমেণ্ট এদেশবাসীর কোন অধিকার কাড়িয়া লইবার কথা উত্থাপন করিলেই, প্রত্যেক পল্লীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক।

এইজন্য প্রত্যেক লোক্যাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড এবং প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে যাহাতে কংগ্রেসের লোক প্রবেশ কবিতে পাবেন, তাহার জন্য প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক বাবেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে প্রত্যেক নির্ব্বাচনের সময় যে লোকশিক্ষার সুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এইজন্যই ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে কেবল কংগ্রেসেব প্রতিনিধিগণই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তাহাব জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ কবিয়া আমাদের এখনকার দাবি আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের কেহ কিছুতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবিতে পাবিবেন না এবং যতবাব সম্ভব আমবা ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যপদ পবিত্যাগ কবিব এবং পুনর্নির্ব্বাচিত হইবাব জন্য আবাব দাঁড়াইব। আমি মনে কবি যে, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদেব majority হইলেও এবং সেই কাবণে আমবা Diarchyকে ধ্বংস করিতে পাবিলেও, প্রত্যেক উপযুক্ত সুযোগেব সময় আমাদিগেব ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যপদ পবিত্যাগ করা উচিত। কাবণ Diarchyকে ধ্বংস করা আমাদেব শেষ উদ্দেশ্য নহে, তাহা তাহাব পন্থা। Diarchy ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আমাদেব মনোভিলাষ চরিতার্থ হইতে নাও পাবে। সেইজন্য বাব-বাব যতবাব সম্ভব পুনর্নির্ব্বাচনেব নামে জনসাধাবণেব নিকট আমাদিগকে আমাদেব প্রচাব কার্য্য চালাইতে হইবে। আমবা যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবি কিম্বা এইরূপে বাববাব সভ্যপদ পবিত্যাগ না কবি, তবে জনসাধাবণেব নিকট আমাদেব যুদ্ধেব যে আব কোন নিদর্শনই বর্ত্তমান থাকিবে না। গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইযাছেন যে, অসহযোগ আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ কবিতে না পাবিলে, তাঁহাদের কর্ণে আমাদেব কোনও দুঃখের বার্ত্তা কিছুতেই পৌছিতে দিবেন না। আমাদিগকেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে, অসহযোগ আন্দোলনকে কিঞ্চিৎ পবিমাণেও জয়যুক্ত করিতে না পারিলে, আমরাও আমবণ এইরূপ করিতে থাকিব। জাতি এইরূপেই গঠিত হয়। জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝে যে ঢেউ আসে, আংশিকভাবে হইলেও তাহাকে জয়যুক্ত করিয়াই তদুপরি ভবিষ্যতের জাতীয় জীবনকে দৃঢ়ীকৃত করাই ইতিহাসের শিক্ষা। আমি বুঝিতে পারি না যে, এই সামান্য ঐতিহাসিক সত্যটাকে বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশের কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর অনুষ্ঠিত আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিবার জন্য কেন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ

করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হইবার নহে এবং তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াও আমি বলিতেছি না। আমি এই বলিতেছি যে, গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করাইতে হইবে যে, আমাদের আন্দোলন জয়যুক্ত হইয়াছে।

আমাদেব স্মরণ রাখা উচিত যে, আগামী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভাবতীয় শাসন সংস্কাব আইনের যে পুনর্ব্বিচাব হইবে, সে সময় পর্য্যন্ত যদি মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুব আন্দোলন এদেশে প্রবলভাবে প্রচলিত না থাকে, তাহা হইলে তৎপরে আমাদেব অদৃষ্টে এক বৃহদায়তন অশ্ব-ডিম্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। পরাধীনা ভারতমাতার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় কি একবার অবহিত হইবেন না? ৩।৪ বৎসরের বিলম্বে কেহ কেহ হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্বস্ব হারাইতে পারেন, কিন্তু জাতিগতভাবে তিন-চারি বৎসর সময় নিতান্তই তুচ্ছ। Royal Commission-এর রায় প্রকাশিত হইলে যদি দেখা যায় যে, যাহা আমাদেব ছিল তাহাও যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহাদেব sweet reasonableness কিম্বা force of right কিম্বা responsive co-operation-এর দ্বাবা তখন কিছুই হইবে না। আজ যাহাবা তাঁহাদেব পদস্পর্শ করিতে প্রস্তুত, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকে একবাব হীনবল কবিতে পারিলে তাহাবাই কাল তাঁহাদের গলদেশে হস্ত প্রদান কবিবে। খদ্দব, কংগ্রেসেব ক্রীড্ ইত্যাদি বিষয়ে আপনাদেব মধ্যে যে সকল মতভেদ আছে, তাহা মিটাইয়া লইয়া আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনেব পর সকলে একযোগে আব তিন বৎসব কাউন্সিল সম্বন্ধে দেশবন্ধুর প্রদর্শিত পথে চলিব, এইরূপ ভাবে কি আমাদেব মধ্যে কোনও মীমংসার সম্ভাবনা নাই? কাউন্সিলের বাহিরে কংগ্রেস যে সকল কার্য্য কবিবেন, তাহাব সহিত তাঁহাবা কোনও সম্বন্ধ না রাখিতে পাবেন। বাংলায় যাঁহাবা নূতন নূতন রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে এ বিষযে বিশেষভাবে আমার নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান অবস্থায় বিবেকের নামেও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা সৃজন করিয়া বিপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করা বাংলার কোনও প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে সমীচীন হইবে না। আমি সত্যই বুঝিতে পারি না যে, এই পরাধীন দেশে কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারেই আমাদের এত বিবেক-বুদ্ধির উত্তেজনা কোথা হইতে

গজাইয়া উঠে। আমি তো এই জানি যে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেকবান যিনি নিজেব বিবেককে দেশের ও দশেব বিবেকের নিকট সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কর—দেশে পানীয় জল, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা হউক, তাহা হইলে দেশের লোক তোমাদের কথা শুনিবে। ভারতীয় শাসন-সংস্কাব আইনে মন্ত্রীকে প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল ক্ষমতা দেওয়া থাকিলে, কোন মূর্খই এত শীঘ্র তাহার পবিবর্ত্তনের চেষ্টা করিত না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একবাব এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, বাংলা গভর্ণমেণ্টের মোট আয় যত, তাহাব ৬০ ভাগ সংবক্ষিত বিভাগের জন্য বাখিয়া বাকী ৪০ ভাগ প্রত্যেক বৎসব হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য ব্যয়িত হউক। সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এই সামান্য একটা প্রস্তাবানুসারেও কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। আমাদেব সংস্কাব আইনেব দ্বারা আমরা কেবল বাজেট সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক কবিবার অধিকার পাইযাছি, কিন্তু বাজেটকে দেশ ও দশেব প্রয়োজন মত বিভক্ত করিবার ক্ষমতা মন্ত্রী কিম্বা আইন-সভাকে দেওয়া হয় নাই। আইনের বিধানে সংরক্ষিত বিভাগেব নিকট হস্তান্তরিত বিভাগ মস্তক অবনত কবিতে বাধ্য। এ অবস্থায় ১০০ বৎসব মন্ত্রিত্ব কবিযা ১০০০ বাব মন্ত্রীব পদ পরিত্যাগ করিলেও, আমাদের জলকষ্ট, শিক্ষাকষ্ট এবং চিকিৎসাকষ্ট ঘুচিবে না। অধিকন্তু মন্ত্রিত্ব প্রত্যাখ্যান কবিয়া যে সংগ্রাম, দৃঢ়তা ও ত্যাগের আদর্শ এদেশেব জনসাধারণের নিকট দেশবন্ধু ধরিয়াছিলেন, তাহাকে ত খর্ব্ব কবা হইবেই এবং সেই সঙ্গে তাঁহাব অনুষ্ঠিত বিরাট আন্দোলনেব এই শোচনীয পবিণামে জগতের নিকট ভাবতবর্ষকেও অত্যন্ত হেয় ও অপদস্থ কবা হইবে। একথা খুলিয়া না বলিলেও চলে যে, এদেশের জনসাধাবণের মধ্যে যে mentality সৃষ্টির জন্য আমাদিগকে এখন বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণে জনসাধারণের সেই mentalityকে আমরা একেবারেই হাবাইয়া ফেলিব। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তাহারা আর আমাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না।

সুতরাং অন্য সকলে যেভাবেই গভর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্য কবিতে প্রস্তুত হউন না কেন, বিনা মীমাংসায় জাতীয় মহাসমিতিব সহিত আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নহে। শুধু তাহাই নহে, মীমাংসা করিতে তাঁহারা যত বিলম্ব করিবেন, আমাদিগকে ততই পরে পরে বিলাতী

কাপড ও অন্যান্য বিলাতী জিনিষ বয়কট করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তারপব ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন আইন অমান্য করিতে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সুরু করিবেন এবং তৎপরে সাধাবণভাবেও ছোট ছোট আইন অমান্যের জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত হইব। শেষে এদেশের জনসাধারণ mass civil disobedience আবম্ভ করিলেই আমাদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

শুনিয়াছি কেহ কেহ বলেন যে, বিলাতী কাপড এবং অন্যান্য বিলাতী জিনিষ বয়কট কবিতে হইলে আমরা হিংসাপরায়ণ বা বিদ্বেষেব বশবর্ত্তী না হইয়া কিছুতেই থাকিতে পারিব না। আমি মনে করি যে, এই ধাবণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের এই ভ্রান্ত ধাবণাব সংশোধন হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থ বাড়ীতে কেহ সিঁদ কাটিতে আরম্ভ করিলে, গৃহস্থ ও প্রতিবেশী সকলেই তাহাব প্রতিবন্ধকতা করিবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং যাহাতে সে বাডীতে আর কেহ কখনও সিঁদ কাটিতে না পাবে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হয়। কই, সে প্রতিবন্ধকতা কিম্বা সে সতর্কতাকে আমবা কেহ ত হিংসাপ্রসূত বলিয়া মনে কবি না? বিলাতী বণিকগণ কি অহর্নিশ আমাদেব দবিদ্রেব কুটীবে সিঁদ কাটিতেছেন না? তাহাব প্রতিবন্ধকতা কবিলে বা বিশেষ সতর্কতাব দ্বাবা তাহা চিবদিনেব জন্য অসম্ভব করিবার চেষ্টা পাইলে, এ সংসারেব কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদিগকে সেজন্য হিংসুটে বলিতে পাবেন না। আমরা যদি আমাদেব দেশের আর্থিক এবং বাজনৈতিক মঙ্গলেব জন্য অন্য কোন দেশেব কোন জিনিস ব্যবহাব কবিব না স্থিব কবি, তাহা হইলে আমাদিগকে কেহ যে দুর্নীতিপবায়ণ বলিবে না, ইহাও স্থিব-নিশ্চিত। ইংবাজগণেব অনেক গুণেব মধ্যে এখানে একটি গুণেব উল্লেখ করিব। তাঁহাবা যেখানেই থাকুক না কেন—পর্ব্বতে জঙ্গলে শূন্যে অথবা লোকালয়ে—তাঁহাবা তাঁহাদের আপন দেশের জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কবিয়া থাকেন। এদেশের যাহারা ইংবাজ সাজিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করে, তাহাবা কেন যে ইংরাজের এই মহৎ গুণটির অনুকবণ কবে না, তাহা তাহারাই জানে। যাহা হউক, এদেশের সকল সম্প্রদায় যদি এক সঙ্গে এই বয়কটে যোগদান না করেন, তাহা হইলেও আমাদিগকে প্রথমে বিলাতী কাপড় এবং পরে পবে অন্যান্য বিলাতী জিনিষ বয়কট করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, স্থানবিশেষ এবং সম্প্রদায়-বিশেষকে লইয়া একদিকে চরখা ও তাঁতের প্রচলন এবং অন্যদিকে বিলাতী

কাপড়ের বয়কট আরম্ভ করা উচিত। তাঁহাদের উদাহরণে ক্রমে অন্য সকলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। শেষে কেরোসিন তৈল, লবণ, দিয়াশালাই ইত্যাদি বয়কট করিতে পারিলে, পল্লীর প্রাণকে আমরা নিশ্চয়ই কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত করিব। অবশ্য এই সকল বয়কটে কাহারও উপর কোন প্রকারে অবৈধ শক্তি পরিচালনা করা হইবে না। যাঁহারা স্বেচ্ছায় সানন্দে সবল অন্তঃকরণে ভারতের এই রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করিতে চাহিবেন, কেবল তাঁহারাই তাহার অধিকারী হইবেন।

এদেশের জনসাধারণকে আবার আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে বিশেষ-বিশেষ আইনকে ব্যক্তিগতভাবে অমান্য করিতে হইবে। যে আইন অমান্য করিলে জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, সেই সকল আইনকে কেহ কেহ সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিগতভাবে অমান্য করিবেন। তারপর, সাধারণভাবে আমরা প্রথমে সেই সকল ছোট ছোট আইন অমান্য করিব, যাহার ফলে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ লাভ অথবা উপকার অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বশেষে আমাদিগকে Mass Civil Disobedience-এর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এখন হইতেই আমাদিগের বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে ও এক প্রাণে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখনও কিছু করিতে চেষ্টা পাইবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এখনি violence করা উচিত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণে হউক মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কংগ্রেসের বাহিরে কোথাও আছে কিনা, তাহা তাঁহাদের বিবেচ্য বিষয়। আমি বিশ্বাস করি যে, এদেশে আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কংগ্রেসেরই সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কংগ্রেসের দ্বারা ভারতের কোন মঙ্গলজনক কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক সকলের আগে কংগ্রেসকে বিনাশ করিতে হইবে। তারপর তাঁহারা আশা করেন যে, তাঁহারা এমন এক দল গঠন করিবেন, যাঁহাদের দ্বারা ভারতের আদর্শ স্বরাজ লাভ পৃথিবীর কোন শক্তিই আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল, সেইজন্য

তাঁহারা তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে হার মানিতেছেন এবং কংগ্রেসের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আমাদিগকে এই শ্রেণীর লোককেও বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ কল্পনা করা যায় না। শুনিয়াছি, কোন-কোন শাস্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতাকে সকলেব চেয়ে গুরুতর পাপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা এই বিশ্বাসঘাতকদেব হাত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে চেষ্টা না কবিলে, আমাদেব সর্ব্বনাশ হইবে। আমি চিরদিনেব কথা বলিতেছি না। যতদিন এদেশ আদর্শ স্বরাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হয়, আমি কেবল ততদিনের কথাই বলিতেছি। আব আমাদিগকে দূবে বাখিতে হইবে আমাদেব গোয়েন্দা বন্ধুগণকে। তবে আমাদেব কোন কিছু গোপনীয় না থাকিলেই, তাঁহারা আপনা হইতেই সবিযা পড়িবেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, এই কর্ম্মপদ্ধতি অনুসাবে কার্য্য কবিলে, অন্ততঃ আমাদেব এই বাংলাদেশে এখনও সুফল ফলিবাব যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অবসাদ ও কর্ম্মাভাবের দরুণ কোন কোন স্থলে যে মতভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে, কর্ম্ম-সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু সকল কর্ম্মেব সার কর্ম্ম—এখন কর্ম্মিগণেব জন্য মূলধন সংগ্রহ কবা, কাবণ এই সংগ্রাম একদিকে যেমন খুব অল্প দিনে মিটিবে না, তেমনি অন্যদিকে যোদ্ধাগণেব ভরণপোষণেব ব্যবস্থা না কবিলে তাহাবা শূন্যপেটে কত দিন যুদ্ধ কবিবে? মহাত্মা গান্ধীকে আমি সেইজন্য আবাব সনির্ব্বন্ধ অনুবোধ করিতেছি যে, তিনি এ সম্বন্ধে অবহিত হউন এবং প্রথমে বাংলায় ও তৎপবে ভারতেব অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে জাতি গঠনেব প্রধানতম সবঞ্জাম সংগৃহীত কবিয়া ভাবতবর্ষকে সত্যই স্বরাজেব পথে পবিচালনার ব্যবস্থা করুন। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপবিসীম। তাঁহাব যুগে তাঁহাকেই এই কার্য্যেব ভার লইতে লইবে। কিন্তু তিনি যদি তাহাতে সম্মত না হন এবং বাংলাব স্ববাজী নেতাগণ যদি গত তিন বৎসবেব মত আগামী তিন বৎসবও কেবল কাউন্সিল গৃহেই ঘোবতব বাগ্‌যুদ্ধে পৃথিবী প্রকম্পিত করিবেন বলিয়া স্থিব কবিয়া থাকেন, তবে কপটতা পবিত্যাগ করিয়া বাংলার জনসাধাবণকে তাঁহাদেব সে কথা খুলিয়া বলা উচিত। আমি মনে করি যে, অধিকাংশ স্ববাজী নেতার হৃদয়ের কথা যদি সত্যই এই হয়, তাহা হইলে অক্ষমতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাই বিধেয়।

উপসংহার

এই অভিভাষণ লিখিয়া শেষ করিবার পর, বাংলায় এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে তুই একটি কথা না বলিলে, আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেইজন্য আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি এখানে তাহাব অবতারণা করিতেছি।

এই যে েদিন কলিকাতায় তুই তুই বার এত দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, খুনখারাপি ইত্যাদি হইয়া গেল, দেখিতেছি বাংলার চতুর্দ্দিকেই সেজন্য একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। তৎপবে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় হিন্দু দেবদেবী ও তাঁহাদের মন্দিব ধ্বংস-বিধ্বংস হওয়ায়, সেই চাঞ্চল্য যে কোন-কোন স্থানে গভীর আশঙ্কায় পবিণত হইযাছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেইজন্য কেহ কেহ বলিতেছেন যে, হিন্দুগণ যদি প্রথমে কিঞ্চিৎ সাবধান হইতেন, তাহা হইলে হয়ত এত বাড়াবাড়ি হইত না। আবাব কেহ কেহ সেই কারণে একথাও বলিতেছেন যে, মুসলমানগণ যদি এইরূপে তিলকে তাল না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সামান্য গণ্ডগোল তুই এক ঘণ্টাব মধ্যেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়, যাঁহাবা প্রকাশ করিতেছেন যে, এই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিবোধে বাংলা তথা ভারতের স্ববাজ-সাধনা এখন কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিল। আমি মনে কবি, এইরূপ অভিমত ও আশঙ্কার একেবারেই কোন কারণ নাই।

আমি বিশ্বাস করি না যে, কলিকাতায় এবং বাংলাব অন্যান্য স্থানে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিযাছে, তাহাকে কোনও কাবণে সাম্প্রদায়িক বিবোধ বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, মুসলমানকে হিন্দু ও হিন্দুকে মুসলমান মারিযাছে এবং হিন্দুগণেব মন্দিব মুসলমানগণ ও মুসলমানগণেব মসজিদ হিন্দুগণ নষ্ট কবিয়া দিয়াছে, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা একথাও অস্বীকাব কবিবেন না যে, ইহা কেবল একটা দৈব তুর্ঘটনা। কাবণ কলিকাতাব যে সকল মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মকর্ত্তা ইহার জন্য দাযী, তাঁহাবা ইচ্ছা করিলেই হিন্দুব দ্বাবা হিন্দুব এবং মুসলমানের দ্বাবা মুসলমানেব সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পাবিতেন। অর্থলোভে যাহারা বাংলার রাজধানীর উপর এবং অন্যান্য স্থানে দিনমানে মন্দির ও মসজিদ ভগ্ন করিতে পারে এবং মানুষ খুন করিতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাহারা দস্যু ও

তস্কর-দলভুক্ত—তাহাদিগকে অন্য কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত করিলে অন্যায় করা হইবে। বাংলায় অল্পাধিক পাঁচ কোটী হিন্দু-মুসলমানের বাস। তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় পাঁচ সাত হাজার বাঙ্গালীর দ্বারা যদি একযোগে কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোনমতেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলা যাইতে পারে না। বলিতে কি, কলিকাতায় সেদিন যে সকল বিসদৃশ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বাঙ্গালী বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া শুনি নাই। ববং শুনিয়াছি যে, পশ্চিম দেশীয় অ-বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানগণই সেদিন কলিকাতাব বাজপথে মারামাবি কাটাকাটি কবিয়া হতাহত হইয়াছে। এই ব্যাপাবেব শেষ পবিণতিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলিতে হইলে, উভয় সম্প্রদায়ই যে ইহাব জন্য অল্পাধিক দায়ী, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকাব করিতে হইবে। কারণ এক হাতে যে তালি বাজে না, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, এই দুর্ঘটনাব পব মুহূর্ত্ত হইতেই, বাংলাব কোটী-কোটী হিন্দু ও মুসলমান ইহাব জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বহিযাছেন—এমন কি, এইজন্য কেহ-কেহ অশ্রু-বিসর্জ্জন কবিযাছেন বলিয়াও শুনিয়াছি। যাঁহাবা বহুদিন বাংলাব পল্লীসমূহে বিনা সাম্প্রদায়িক বিবোধে বন্ধুভাবে দিনাতিপাত কবিযা আসিতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একেবারেই অস্বাভাবিক নহে।

তারপব, এই ঘটনার মূল কাবণ এত সামান্য যে, তাহাব জন্য বিবাট মুসলমান সম্প্রদায ও তদধিক বিশাল ও সুবৃহৎ হিন্দু সমাজেব কখনও এইরূপ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতে পাবে বলিয়া আমি বিশ্বাস কবিতে পাবি না। ক্রম-বিকাশেব নিয়মানুসাবে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মনুষ্যই যুগে-যুগে আপন-আপন গোঁড়ামি পবিত্যাগ করিয়া আসিতেছে। সেইজন্যই সেদিন ভারতে রামমোহন বায ও দয়ানন্দ সবস্বতীব আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্বয়ং মহম্মদেব বংশধব তুরস্কেব সিংহাসন হইতে বিতাড়িত। আমাদের শাসকগণও বিগত ১৭০ বৎসর ধবিয়া, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট থাকায়, আমাদের পুরাতন ধর্ম্মান্ধতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অশিক্ষায় যে কখন কখন সুফল ফলিতে পারে, ইহাই বোধ হয় তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। সুতরাং এতবড় গুরুতর ব্যাপার এমন একটা সামান্য কারণে সংঘটিত হইয়াছে, ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

তবে কেন এমন হইল বা হইতেছে, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যাঁহারা বলিতেছেন যে, দেশবন্ধু-অনুষ্ঠিত হিন্দু মোস্লেম্ প্যাক্ট—এমন কি, কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টও ইহার জন্য দায়ী, তাঁহাবা এদেশেব কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহাবা কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগেব সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ বা মিলন হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া, প্যাক্ট ইত্যাদিব দ্বাবা বাংলা তথা ভাবতেব স্ববাজ-সাধনাকে মধ্যে মধ্যে জয়যুক্ত কবিতে না পাবিলে, প্রকৃত স্ববাজ-লাভের জন্য আমাদিগকে হয়তো অনন্তকাল অপেক্ষা কবিতে হইবে। তাঁহাবা যদি মনে কবিয়া থাকেন যে, ২৪ কোটী হিন্দু একদিন হঠাৎ ৭ কোটী মুসলমানকে যুদ্ধে পবাভূত কবিয়া এদেশে হিন্দু-স্ববাজ সংস্থাপন কবিবে, তবে তাঁহাদিগকে বাতুল বলিব। আবার একথা যদি কাহাবও হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে যে, ৭ কোটী মুসলমান একদিন হঠাৎ ২৪ কোটী হিন্দুকে সংগ্রামে পবাজিত কবিযা এদেশে মুসলমান-স্ববাজ সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবে কিংবা আমাদেব শাসকগণেব সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহাবা ২৪ কোটী হিন্দুকে এবং তাহাদিগের সহিত আপনাদিগকেও চিরদিন পরপদানত বাখিবে, তবে বলিব তাহাও নিছক উপন্যাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মনুষ্যেব প্রকৃতি যদি সত্যই এইরূপ হইত, তাহা হইলে হিন্দুদিগেব মধ্যে যাহারা জাতি হিসাবে মুসলমান অপেক্ষা নিকৃষ্টতর, তাহাদিগের মধ্যেও এত দিনে আমরা কত অঘটন সংঘটিত হইতেছে দেখিতে পাইতাম। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমবা নিতান্তই অদূরদর্শী, সেইজন্য সামান্য কারণে আমরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠি। আমরা কল্পনা করিতে পারি না যে, এমন দিন আসিতেছে, যখন হিন্দুগণ বলিবে যে, তাহারা তাহাদেব স্বধর্ম্ম পবিত্যাগ কবিয়া মুসলমান হইতে প্রস্তুত আছে, যদি তাহাতে বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ-লাভ অবশ্যম্ভাবী হয় এবং যখন মুসলমানগণও বলিবেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কবিয়া হিন্দু হইতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে তাহার দ্বারা বাংলা তথা ভারতের স্ববাজ লাভ সুনিশ্চিত। ধর্ম্মের ধারণা এ পৃথিবীতে ক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া মনুষ্যসম্প্রদায় ক্রমে যেরূপ হাজারে-হাজাবে লক্ষে-লক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুরাতন কুসংস্কার যে অচিরে এ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে আমার আদৌ সন্দেহ নাই।

সুতবাং আমাদের যে শাসক-সম্প্রদায় আমাদের মুখে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা শুনিবাব জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন, এই সামান্য ব্যাপাবে তাঁহাদিগকেই প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিয়া আমাদের কি লাভ হইতেছে? তাঁহাদের শাসনযন্ত্রেব স্থায়িত্ব যে আমাদের এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। আমবাই যদি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের স্বরাজ-লাভেব শুভ মুহূর্ত্তকে এইরূপ বাজে কথায় পিছাইয়া দিতে সম্মত হই, তাহা হইলে তাঁহাদের যে আর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। আমি সেইজন্য বাংলা তথা ভাবতেব প্রত্যেক মুসলমান ও হিন্দু নেতাকে এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুবোধ কবিতেছি। আমাদের এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে কিঞ্চিৎ পবিমাণে হইলেও জয়যুক্ত কবিয়া, তৎপরে কি আমবা নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারি না? আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রচলিত শাসনযন্ত্রই আমাদের সর্ব্বপ্রকারের গৃহবিবাদের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সেইজন্য আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা যদি স্বাধীন জাতি হইতাম এবং কোনও স্বাধীন শাসনযন্ত্র যদি আমাদের হাতে থাকিত, তাহা হইলে আমবা এই সকল তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপাব আইনের দ্বারা বহু পূর্ব্বেই মীমাংসা কবিয়া ফেলিতে পারিতাম। স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন যে, পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনই ভারতের সকল দুর্ভাগ্যের একমাত্র প্রতিষেধক।

তাহা হইলে কেন এমন হইল বা হইতেছে, এখন তাহাই আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব। গুণ্ডা আইনের দরুণ অনেকগুলি গুণ্ডা গোপনের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য কোনও নূতন পন্থা আছে কিনা, তলে তলে তাহার অনুসন্ধান কবিতেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কতকগুলি কুচক্রী লোক অনেকদিন হইতে হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য ঘটাইবাব জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা সেই সকল গুণ্ডার হস্তে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রৌপ্যমুদ্রা সংস্থাপিত করায়, তাহারা কলিকাতার রাজপথে অস্ত্র-শস্ত্র সহ কয়েক দিন ছুটাছুটি করিয়াছিল এবং এখনও বাংলার অনেকগুলি পল্লীতে তাহারা নিজেরা কিম্বা তাহাদের অনুচরবর্গ নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আমার মনে হয়, বাংলার বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের ইহাই প্রধানতম কারণ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনর্নির্ব্বাচনের আর বিলম্ব নাই। একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, আগামী বৎসব যে করিয়া হউক diarchyকে পুনর্জ্জীবিত কবিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের দেশের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ও বাজভক্ত ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহাব-নিদ্রা পবিত্যাগ করিয়াছেন।

আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পাবি যে, গভর্ণমেণ্ট যদি প্রচার করিতেন যে, আগামী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে যে Royal Commission বসিবে, তাহার রায় প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত বাংলায় আর মন্ত্রিত্বের কথা উঠিবে না, তাহা হইলে কলিকাতা এবং বাংলার পল্লীসমূহে গত দুইমাসে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার একটি ঘটনাও এদেশে সংঘটিত হইত না। সুতরাং এই সকল ঘটনাব ভিতব দিয়া কাহাদের ছায়াচিত্র আমাদের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদেব অদৃষ্টেব দোষে এদেশেব লোক লেখাপডা শিখিয়া অনেক সময় চতুষ্পদ হয়। এইজন্যই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদেব শিক্ষার ভার আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে।

এদিকে জনসাধারণেব মনে দুইটি ধাবণা দুই দিকে কার্য্য করিতেছে। যাহারা স্বার্থপর এবং কোনও দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ, তাহারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন কবিতে ব্যতিব্যস্ত। পরাধীন দেশে চিরদিনই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে। আবার যাঁহারা নিঃস্বার্থ এবং দেশ-হিত-ব্রতে মৃত্যুভয়হীন, তাঁহারা তাহার প্রতিকারেব জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহাও যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকাব করিবেন না। কিন্তু সংখ্যায় কাহারা অধিক, তাহা খুলিয়া না বলিলেও চলে। ফলে, তিন বৎসরের জন্য diarchyকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, তৎপবে হয়ত চিরদিনের জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেব শাসন-সংস্কার আইন ও তৎসহ অন্যান্য অনেক জিনিষকে সমূলে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সে সম্ভাবনায় আমাদের দুঃখিত হইবার একবারেই কোন কারণ নাই—বরং আনন্দিত হইবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। সুতরাং আগামী তিন বৎসরের ভাবনায় যাঁহারা চিন্তান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবহিত হউন। বাংলা তথা ভারতের মত একটা বহুদিনের পরাধীন দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে, তিন বৎসরের বিলম্ব কিম্বা অত্যাচারের সম্ভাবনা বিবেচনার বিষয় হইতে পারে না।

অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনে এই সকল কুচক্রী লোক নিজ-নিজ চেষ্টায় কিম্বা গভর্ণমেণ্টের গোপন সহায়তায় অথবা প্রকাশ্য নিশ্চেষ্টতায় জয়লাভ করিতে পারিবে। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলার জনসাধারণ—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই আজকাল অত্যন্ত সহজে মেকি ধরিতে শিখিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ যথাসম্ভব সত্বর সঙ্ঘবদ্ধভাবে নির্ব্বাচনের জন্য প্রচার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, এ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ অচিরে দূরীভূত হইবে।

চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে হইলে, এদেশের সকল চক্রান্তকারীর সমূহ আব্দারকে সর্ব্বপ্রথমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। সম্প্রদায় এবং জাতিনির্ব্বিশেষে, এই দণ্ডেই সেজন্য আমাদিগের দৃঢপ্রতিজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ আর যাহাতে মুসলমানগণকে ম্লেচ্ছ বলিতে না পারেন এবং মুসলমানগণও আর যাহাতে হিন্দুগণকে কাফের বলিতে সাহসী না হন, এই মুহূর্ত্ত হইতেই সেজন্য ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে একটা সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। তৎপরে হিন্দু ও মুসলমানগণ যাহাতে সৎ-শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য সৎ-লেখকের দ্বারা সৎ-পুস্তক রচনা করাইয়া, তাহা বাংলার গৃহে গৃহে বিতরণ না করাইলে সুফল ফলিবে না। আমি ইতিপূর্ব্বে যে জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা বলিয়াছি, এই ভার তাঁহাদিগকেই লইতে হইবে। চাকরি ইত্যাদি সম্বন্ধেও এখন কিছুদিনের জন্য মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের একটা আপোষ মীমাংসা হওয়া বিধেয়। এই সকল জটিল সমস্যার সময় উভয় দলের নেতা এবং সংবাদপত্রসমূহকে অপ্রিয় সত্য পরিহার করিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য বর্ত্তমানের অশুভকে যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণে সহ্য করিতে হয়, তাহাতে বোধ হয় তাহারা সকলেই স্বীকৃত হইবেন। সর্ব্বোপরি, আমাদের শাসন-প্রণালীই যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধের উৎস, এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সে ধারণাকে বদ্ধমূল করিতে না পারিলে, আমরা কোন সম্প্রদায়ই কোনদিন জাতি গঠনে বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারিব না। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই কার্য্যের অন্যতম নাম স্বরাজ-সাধনা। সেইজন্য আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ-সাধনাকে কোন কারণেই স্থগিত রাখা সম্ভবপর নহে। বরং একদিন আমরা আগামী কাউন্সিলে প্রবেশ

করিব না স্থির করিয়া, এখন হইতে দেশকে civil disobedience-এর জন্য প্রস্তুত করিতে সম্মত হইতে পারি, কিন্তু যাহারা স্বরাজ-সাধনার জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে এবং আবশ্যক হইলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, তাহারা আজ হঠাৎ স্বরাজ-সাধনা পরিত্যাগ করিবে কেমন করিয়া? আজ যে বঙ্গভূমি অজলা অফলা বিষবায়ু-তাপিতা শস্যশূন্যা, আজ কি সন্তানকে স্বরাজ-সাধনা পরিত্যাগ করিতে বলিতে আছে! আজ যে মা আমাদের 'অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী, হৃত-সর্ব্বস্বা সেইজন্য নগ্নিকা; আজ দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন,—আজ কি সন্তানগণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে।

আমার নিবেদন শেষ হইয়াছে—এখন আপনারা আমাকে বিদায় দিন। আপনাদিগের নিকট আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আপনারা কোনও কারণে এদেশের সন্তান বা সেবকগণকে নিরুৎসাহ করিবেন না। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিযাছেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার এক একটা দুই-চারিদিন-ব্যাপী বাৎসরিক আনন্দোৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা নানা স্থানে পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদিগকে এখন হইতে সেজন্য সাবধান হইতে হইবে। এদেশের জনসাধারণকে বাদ দিয়া যাঁহারা বাংলা তথা ভারতের স্বরাজ প্রাপ্তির কল্পনা করিতে পারেন, তাঁহারা অতি-মানব কিম্বা মহা-মানব হইলেও, এই মূর্খের নিকট তাঁহারা অবোধ্য। আমাদের অতি-মানব বা মহা-মানবগণ স্বরাজ অর্থে যে কেবল আত্ম-রাজ বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের এইরূপ জন-বিদ্বেষী কার্য্যকলাপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এদেশের জনসাধারণকে চিরদিনের জন্য গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইলে, বাংলায় সেবক-সেবিকাগণই তাহার উপযুক্ত এবং প্রকৃষ্ট সূত্র। সেই সূত্রের সহিত যাহারা মিশিয়াছেন এবং একসঙ্গে এক কার্য্যে একদিনের জন্যও দিনাতিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, সে-সূত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতই যেমন শুদ্ধ ও পবিত্র, তেমনি হিমালয়ের ক্ষীণতোয়া গঙ্গার মতই রজতশুভ্র এবং মহান। কৈলাস-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ভারতের অগণ্য পল্লী ও প্রান্তরকে গঙ্গার ক্ষীরধারা যেমন এখনও আমাদের এই দুর্দ্দিনে ধন্য করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ভগবানের আশীর্ব্বাদে এতদ্দেশীয় সেবক-সেবিকার পবিত্র পদরেণু যে সকল মৃণ্ময় প্রাণহীন জনপদ পর্ব্বতশৃঙ্গ

বা বনান্তরালে নিপতিত হইতেছে, সেই সেই স্থান তদ্দণ্ডেই চিন্ময় ও প্রাণময় দেবালয়ে পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই পরাধীন দেশকে আপনারা যদি স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমে আপনাদিগকে এই সেবক-সেবিকার হৃদয়-সূত্রে গণরুদ্রাক্ষের জপমালা প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বর্ণ-সূত্র দিয়া যদি কেহ রুদ্রাক্ষের জপমালা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন, তবে স্বরাজ-সাধনায় সে জপমালার কোন আবশ্যকতা নাই জানিবেন।

হে বাংলার সেবক ও সেবিকাগণ! জননী জন্মভূমিকে উদ্ধার করিতে কেবল তোমরাই অধিকারী হইয়াছ। তোমাদের জয় হউক এবং দিনে-দিনে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক—মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বন্দেমাতরম্

Midnapore Partition

CHAPTER I

INTRODUCTION

The proposal has this time come from our brethren of Orissa. At any rate, that is what appears on the face of things to day and we don't know for certain if others may not join them in future to get rid of a knotty part of Bengal. We dread the fire like burnt children, for the question of partitioning Midnapore, in one form or other, has occupied the minds of her unfortunate people for the last quarter of a century. Years ago, after the first Midnapore bomb case, when the District Administration Committee reported that Midnapore was too unwieldy for one District Officer, the idea went forth that it should be torn into two, and Lord Carmichael actually announced in 1913, after his visit to Contai, that the headquarters of the new district town of *Hijlee* would be located at Kharagpur. The Government of Bengal was then engaged in working out the scheme in detail behind the scene, while outwardly the costly buildings were begun to be erected on the outskirts of the Kharagpur Railway Settlement. The district passed through an excitement of an unprecedented character, but it appeared finally that both the Government of Lord Reading and the then Secretary of State boldly put down the partition scheme. Although one or two members of the Indian Civil Service, who used to take great interests in same thereafter resigned their posts for reasons best known to them, Midnapur District has since remained in her old territorial grandeur.

AGITATION OF 1920-21

In the meantime, the more important and a greater portion of Midnapore has passed through two other crises of a different character. In 1920-21, there was the agitation in this district against the establishment of Union Boards, on the ground that the Act which created them was bad, and the late Sir Surendra Nath Banerjea had to withdraw something like 235 Union Boards in one day by an announcement in the local Gazette. I remember the enquiry, which the Late Sir Surendra Nath Benerjea had instituted into the sincerity of the opposition, before he acually withdrew the Union Boards and I also remember the protest meetings which were attended by people numbering from 20 to 50 thousand at a time.

LAST CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT

Then the trial through which Midnapore has lately gone, in connection with the Civil Disobedience Movement, is an event of historic importance for the rest of India and it needs no recapitulation whatever at my hands.

MIDNAPORE'S MISFORTUNE

It appears clear, therefore, that it is not the desire of Providence that the people of Midnapore District should be in peace or contentment for any length of time. Their misfortune is the greater in that the present unrest has come to them from their brethren of Orissa and almost immediately at the heels of the last Civil Disobedience Movement, the devastating scars of which are still blood-red on their foreheads and hearts. It is a thousand pities that, before launching such an attack formally on them, the Orissa Provincial Congress Committee or the leaders of Orissa never took the trouble to consult the the Congress Committees of Contai and Midnapore or the leaders of public opinion there. I find in their pamphlets that they do not want to get any area amalgamated with

them, the inhabitants of which do not agree to their proposal. The best course for them would, therefore, have been to consult local opinion first and then start the agitation. As it is, the southern portion of Midnapur is again on the verge of a volcanic irruption and no one need be surprised, if advantage is taken of the situation by interested parties to dismember a particular area, which has been very difficult for some to deal with in recent years. I am inclined to hold that our friends of Orissa never intend to create such an occasion in any shape or form, but that may be the mischievous result of an apparently legitimate agitation. That is why I said at the beginning that like burnt children we dread the fire, and we therefore appeal to our Oriya brethren to study these objections dispassionately and calmly. It shall never be my intention to hurt their feelings in any way, but, under the circumstances stated above, if I ever unconsciously do so, I would earnestly beg of them to excuse me for same. I know that hard words do not break bones, nor do soft phrases put off apprehended dangers.

CHAPTER II

WHAT THE ORIYAS WANT

What are the demands of our Oriya brethren ? What are their reasons for same ? I have gone through some of the literature which they have published on the subject, specially their pamphlet named "Separate Province for Utkal" which they submitted to the Nehru Committee for their consideration and the statements of Pandit Nilkantha Das which appeared in the Press lately. If I am not entirely mistaken, their demands are, *first,* that they must have a separate Province for Utkal, and *secondly,* in order that such a province is financially self-supporting, they desire that all those tracts where Oriya-speaking people live and which are contiguous to present Orissa, should be brought into that separate Utkal Province. They bring in the question of cultural and linguistic unity only for the purpose of justifying their demand for amalgamation of those areas where Oriya speakers reside. It is not at all their contention that, if there is no separate Province for Utkal, even then all those neighbouring tracts where people speak the Oriya language should be added to Orissa to be governed by the Behar and Orissa Government.

"As late as in February, 1927," reads their booklet named "Separate Province for Utkal," "Pandit Nilkantha Das asked in the Assembly for amalgamation, but pointed out that nothing less than a separate province would satisfy the Oriyas. The Government then stated that this question of a separate province needed further enquiry. being obviously a more serious matter than amalgamation. We concede that it is so, but the Oriyas never made a secret of what they wanted. Amalgamation was sometimes advanced by politicians only as either a necessary first step or with a view to obtaining ready acceptance because it was a simpler proposition. But if the Oriya movement should be brought into line with the Swaraj

Constitution, it should be unmistakably pointed out that we want a separate province to shape our own future and to shoulder our own burdens......The Conference of the All Parties in Utkal......has after deliberate consideration ruled out the question of merely stopping at amalgamation......We clearly see the need of forming a separate province......We have indicated that mere amalgamation will only put off the solution of the outstanding question which the sons and daughters of Orissa alone are competent or bound to achieve. Make-shifts.........will multiply constitutional difficulties without effectively or at all solving vital matters affecting the people. Orissa's long history when she was an independent kingdom with military and maritime activity, her surpluses which enabled the famous temples to be built, and her zeal in literay and religious movements, all demand that she should be a distinct entity in the future policy of India. Without being such a unit, it is impossible for Orissa to unfold her life and culture."

THEY WANT A SEPARATE PROVINCE

It is therefore abundantly clear that our friends' demand for the incorporation of all the contiguous Oriya-speaking tracts into one administrative unit, is solely based upon their desire to raise Orissa into a separate independent province. They feel that they cannot reasonably ask for a separate province for Utkal, unless the adjoining Oriya-speaking tracts are amalgamated with present Orissa : for, as it is, present Orissa can not possibly bear the financial burden of a distinct administrative entity. They appeal to the Oriya-speakers residing in their neighbourhood to consent to their demand for amalgamation on the ground that they are culturally and linguistically the same. Accordingly, it is hardly necessary to point out that our Oriya friends do not ask, and could not possibly have asked, the people of South Midnapore to go to Orissa to be governed by the Behar and Orissa Government,

simply for their alleged cultural and linguistic unity with them. The Oriyas themselves are suffering badly for their amalgamation with the Beharees and their cry for a separate province for Utkal is at least partly born of their feeling of consequent resentment. Unless they wanted the people of Southern Midnapore to go and simply weep with them in this their sorrow, because they were culturally and linguistically the same in the past, there could be no other intention on their part to have a mere amalgamation of South Midnapore with Orissa. The fact that our Oriya friends are themselves dissatisfied with their dependent existence under the predominating Behar Government shows that they could not fairly demand a mere amalgamation without raising Orissa into a separate province. The jackals that had to cut their tails on account of misfortune can not in this twentieth century induce other jackals to do the same, even though they might have been first cousins or brothers in the remote or near past. But, as I have said before, my Oriya friends have never contended that all Oriya-speakers should be in the Orissa Division, even though they are to be governed by the Behar Government as Orissa is being governed to-day by Behar.

Let us therefore see, what are the questions or issues which emerge out of the demands of our Oriya brethren. They should be clearly formulated before any impartial enquiry into them is attempted.

They demand a separate province for Utkal and their ideal of a separate province can be gathered from their writings on the subject. We will have to consider whether their ideal of a separate province is attractive enough to South Midnapore or whether it is detrimental to their self-interest in different walks of life. Then, whether their ideal of a separate province for Utkal be good, bad or indifferent, we will have to satisfy ourselves that it is capable of execution financially, not in any remote future, but immediately the new constitution is introduced. Their assertion, that South Midnapore is at the present moment culturally and linguistically Oriya, must have

to be tested carefully and without prejudice ; for, if this is not a fact, then their demand for amalgamating South Midnapore with Orissa, for whatever reason it may be, must fail. In this connection we must further consider as to whether the people concerned are willing to go to Orissa, even though they may be at present culturally and linguistically one. In other words, the important propositions which emerge out for our deep consideration are as follows :—

First, can there be a self-supporting separate province for Utkal—a self-supporting separate province as our Oriya friends have conceived of ?

Secondly, will such a separate province be of benefit to Southern Midnapore or will it be detrimental to her interests ?

Thirdly, is a full-fledged separate province for Utkal financially possible in the immediate future ? If not, should the people of South Midnapore be asked to go to Orissa now ?

Fourthly, is it correct to say that South Midnapore is at the present moment culturally and linguistically Oriya ? If not, should she be incorporated with Orissa for any reason whatsoever ? And......

Lastly, in these days of self-determination, should Southern Midnapore be added to Orissa, without consulting her people on the subject ? Will our Oriya friends drop their agitation against South Midnapore, if they find out that she is unwilling to go to Orissa ?

CHAPTER III

THE FIRST ISSUE

I take up the first problem first, namely, as to whether it is possible to have a self-supporting separate province for Utkal as the Oriyas have conceived of it. I am sorry to have to point out, at the outset, that their conception of a self-supporting Oriya Province is of a lower order in many respects. Undoubtedly they want a Governor for them, but they say that "the maximum salary of the Governor shall be sixty thousand rupees." There are many who would like to make it still less, but what is apparent in their proposal is that, unlike Bengal, our friends are willing to be satisfied with a Civilian as their Governor. They agree that "the present system of a circuit High Court at Cuttack should be continued." But they have not been able to decide which High Court of a neighbouring province should exercise these extraordinary powers in Orissa. They have perhaps discreetly left it to public opinion to be elicited in future, but it is obvious that South Midnapore can never give up the various benefits of the Calcutta High Court, while other areas may cling to Patna or Madras High Court for the same reason. They have suggested a University for Orissa, but they have nowhere given details as to when and how it is to come into existence. They consent to the "reservation of seats in the legislature for Musalmans in the proportion of their population with the right to contest additional seats" for the next ten years, at the end of which the matter is to be reconsidered, and finally they do not conceal their idea that, while they stand for provincial autonomy, they are in favour of a "strong Central Government."

WILL IT BE SELF-SUPPORTING

Now, the question is not as to why their conception of a self-supporting separate province is so modest, but the question is as to whether such a modest province as hereinbefore described is likely to be self-supporting or financially possible of existence for any length of time. It is probable that our friends' conception of a separate province for Utkal has been modest only for financial reasons, but what we have got to see here is whether even such a modest province is financially a practical proposition or not. Our Oriya friends also agree with me here, for they have said "We readily concede that the question of finance has to be examined preliminary to amalgamation and creation of a provincial status for Utkal." Now, after having carefully gone through all the available literature on the subject, I am convinced that the proposition has absolutely no legs to stand upon.

ORISSA IS A DEFICIT DIVISION

The Government of Behar and Orissa asserted in 1925-26 that the Orissa Division, as it is now, was being run on a deficit of 17¾ lacs a year. This assertion has not yet been challenged by anybody and although there are no data available to show how the matter stands to-day, there is no presumption that the expenditure has during these years been in any way curtailed. Therefore we have got to see, if the income has increased since. It is said that the income on land revenue has swelled by about ten lacs in the Orissa Division, on account of land revenue settlements after 1925-26. But in these days of fall in price of paddy and jute, which is likely to continue for some years to come, it is altogether unsafe to rely upon income from land revenue. I am optimistic, or should I say, pessimistic enough to anticipate that the time is fast approaching when the whole land revenue problem of India will have to be examined from a new angle of vision. But assuming that it is correct that their income from land

revenue has increased by ten lacs, we have still to enquire whether the expenditure has also similarly increased or not. I find from a Cuttack correspondent's letter, published in the "A. B. Patrika" of the 4th August 1931, that a separate Embankment Division was started two years ago, with an annual expenditure of about 1½ lacs. He also says, if I have not entirely misunderstood him, that the loss from water rates to the Government, due to people's refusal to pay the enhanced rate, has been about two lacs a year and "as days go by, Government may have to lose more and more, and the total loss may mount up to 4 lacs of rupees annually." The yearly deficit of the Orissa Division is, therefore, still hovering somewhere near 9 to 10 lacs. My Oriya friends suggest that the deficit is easily met, if the interest charges on the Orissa canals, which stand at 8½ lacs, are given up by the Central Government. I don't know, I am sure, if the Central Government are going to do this, but if I again assume for argument's sake that they will do so, what happens even then? "If this amount (interest charges on Orissa canals) be remitted," says a pamphlet of our friends, "the finances of Orissa will be more than self-sufficient"—that is, "so far as her present scale of expenditure is concerned." But we all know that in her present expenditure is not included the huge expense which she is bound to incur in raising her into a separate province.

WHERE THE EXCESS AMOUNT WILL COME FROM

The question that arises then for our consideration is as to what is the excess amount which may be necessary for running the separate province for Utkal and as to how that excess amount is to be secured. It appears clear from "Separate Province for Utkal" that something like 150 to 170 lacs will, in our friend's' opinion be necessary for the purpose. They point out the facts that Assam and Central Provinces are being run with similar amounts and the Behar Government's

admission to that effect. They further point out that the total income of the Orissa Division was about 88¼ lacs in 1925-26, although they admit that "the figures of revenue and expenditure for a Division or a District are not separately available." To this 88¼ lacs must be added their alleged income of 10 lacs in land revenue in the meanime and their expected remission of 8½ lacs by the Central Government on the interest charges on the Orissa canals. The total income of the Orissa Division will therefore be somewhere near 105 or 106 lacs, although they put it at about 116 lacs. Assuming that 116 is the correct figure, we will have to deduct their practically admitted deficit of 17¾ lacs and so their income will stand at about 100 lacs. But, as I have pointed out before, their expenditure for the separate province is expected to be 150 to 170 lacs. Where will this huge sum come from ?

GANJAM'S INCOME

They say at one place that from Ganjam District alone they will get 45.5 lacs. But at another place they admit that, according to Madras Government's averages, the income in Ganjam District is 45.84 lacs and the expenditure is 37.81 lacs and therefore the difference is only +8.03 lacs. They also admit that according to standard figures of Mr. U. M. Sen, who had been deputed by the Government to study the question, the income is 38.63 lacs and the expenditure is 45.14 lacs and therefore the difference is—6.51 lacs. They have also given their own standard figures, which are not very much different from the Madras Government figures.

Now, I confess, I have not been able to understand how under such circumstances, our Oriya friends can say that the income from Ganjam District alone will be about 45.5 lacs, for the purpose of raising Orissa into a separate province. It has already been seen that the Orissa Division, as it is now, cannot by itself maintain a Governor's Province. She is in need of at least 50 to 70 lacs more for that purpose. What does it

mean ? Does it mean that immediately an area is added to her, which yields a gross income of 50 to 70 lacs, immediately she becomes financially fit for a Governorship ? If that is the proposition which our Oriya friends want to propound, the sooner it is exposed, the better. The added area yielding a gross income of fifty to seventy lacs must have an administration of its own and that administration must be better than it is at present. That is why an area may come, if at all, to Orissa. She can never consent to come to anywhere, where not only her present administrative *status quo* will not be maintained, but where, further, her administration as a whole is threatened with curtailment and consequent deterioration. If this is correct, then how can the gross income of Ganjam District possibly help our friends ? It is only its profits, and profits after the administration has been developed or bettered or bettered than it is at present after the proposed amalgamation, that will count, in considering the question of finance necssary for a Governor's province. From this point of view, there may not be left anything at all as profits in Ganjam District, for we find from Mr. Sen's figures reproduced above that it is already a deficit District like the Orissa Division itself. But assuming that their own figures are correct, the profit in Ganjam stands at about 10 lacs and that sum cannot possibly be taken away to anywhere, before the existing administration there has been substantially bettered, after the proposed amalgamation. I hope, it is not suggested that all the areas proposed to be added to Orissa should sacrifice even their present-day advantages in order that only the people of the four districts of the Orissa Division may be benefited thereby.

ORISSA'S INFERIOR ADMINISTRATION

Nobody would deny that the present administration of the Orissa Division is of an inferior quality than those that obtain now in Bengal and Madras. The Simon Commission has found it as a fact that the total expenditure in Behar and Orissa is

only 1·8 rupees per head which means still less in Orissa alone, while it is 2.5 rupees per head in Bengal and 4.1 rupees in Madras. This is perhaps the main reason which has actuated educated Orissa to cry for a higher administrative status, entailing the establishment of a Governorship in their midst But if it is the intention of our Oriya friends that the higher and superior administrative efficiencies now prevalent in Ganjam District in Madras and in South Midnapore in Bengal should be undone and brought into level with their own inferior administration, in order that they may have a Governor with a few ministers and M L C s. it was time indeed that they made it clear to all concerned. The people of South Midnapore cannot possibly brook such an idea for a single moment.

CONTAI'S POSITION

They have a college at Contai while the whole of Orissa has only one college. They have about 12 High English Schools in one Sub-Division while the whole of Orissa has about 10 or 11 such schools. The number of Primary Schools for both boys and girls in the Sub-Division of Contai is 1289, while they have only 852 such schools in the whole of Balasore district. The number of dispensaries in Contai is also larger than those of any Sub-Division anywhere in Orissa. The average expenditure on health and education is therefore necessarily much heavier in South Midnapore than in the Orissa Division. If our Oriya friends contemplate anything like an infinitesimal curtailment of any such institution in South Midnapore, they should say so clearly and definitely, so that no calamity ever overtakes any of the two parties to the controversy. For it will be apparent to the meanest intelligence that, under such circumstances, no inhabitant of South Midnapore can consent to go to Orissa.

But if this is not done, that is, if the existing administrative efficiency is not lowered in the areas proposed to be added to

Orissa, to make profits out of them, the mere amalgamation of a particular tract with a particular amount of gross income won't help the proposed Governorship in any way. That is why I confessed I had not been able to understand how the gross income of 45.5 lacs in the Ganjam district helped our friends in this respect.

THE OTHER AREAS

Then, so far as the other areas proposed to be amalgamated with Orissa are concerned, the position is still worse. Of course, they do not hesitate to assert that from the Vizagapattam Agency except Gudem taluk, Singhbhum, the Midnapore areas and the C. P. Oriya-speaking tracts, they would get about 35 lacs, but they have also the frankness to admit that "Accurate and up-to-date figures of these areas are not available." It is not known, therefore, whether this sum of 35 lacs represents the gross income or only profits. If it is only the gross income, it is of no use. If it is the profit, then the profit of each area has to be separately found out and how much of it has to be left in that area for bettering the new administration has also to be seen. My own impression, however, is that, as in Ganjam, so in these areas, there will be no profit at all. In this connection it must be remembered that the sub-committee which was appointed by the Simon Commission to go into the question of a separate province for Utkal, has recommended the exclussion of Singbhum, most of the Midnapore areas (excepting the circles of Mohunpore and Gopibullavpore) and the Vizagapattam Agency from the proposed amalgamation.

PROVINCE-MAKING AND ITS DANGERS

In any case, it is astonishing how our responsible Oriya friends could advance their claim for a separate province on such incomplete and flimsy materials. If province-making

was so easy, then there would have been a thousand provinces in India by now. The pity of the whole thing is that, without first being reasonably certain of the financial aspect of the question, our friends are helping a third party by trying to divert the attention of South Midnapore from constructive nation-building works to this partition agitation. Who knows that behind this agitation, there are not men, who want that Midnapore should be disorganised for all future purposes over this attack from a neighbouring people ? I have already seen a leaflet where a few Oriya Brahmins and Karans of Midnapore district look like going against their brethren of other communities by proposing that new Orissa's northern boundary should be the river Kangsabaty near Midnapore town. No one will hesitate to blame Orissa and her leaders if the partition agitation leads to disunity among the different but hitherto united communities of South Midnapore. They have fought wonderful battles in the near past—Brahmins, Kayasthas, Karans, Mahisyas, Poundra-kshatriyas and all, standing shoulder to shoulder and dying side by side, and they think they are pre-destined to work wonders in the near future in that direction. But if in the name of this partition agitation, in the name of the Oriya culture and language and in the name of raising Utkal into a separate province, that grim determination to fight and die, without any division among themselves, disappears or is killed, history, neither of Bengal nor of Orissa, will forget the hands that brought about that calamity. To live is undoubtedly a duty, but to let live is also a nobler and greater duty in every sense of the word.

It is clear, therefore, that the question, whether there can be a self-supporting separate province for Utkal, as our friends have conceived of, must be answered in the negative.

CHAPTER IV

THE SECOND ISSUE

Let it be assumed, however, again for argument's sake only, that the proposed separate province for Utkal will be financially self-supporting. But will such a separate province be of benifit to Southern Midnapore or will it be disadvantageous to her interests ? This is the second question which I promised to discuss towards the beginning of this article. I must make it perfectly clear that when I speak of benefit or disadvantage, I mean only the matter of fact, physical and tangible advantages and their counterparts. I shall, of course, discuss the question relating to the alleged cultural and linguistic unity of the two peoples later on in their proper places, but here I am concerned only with the various other advantages and disadvantages. That is, will the modest separate province as proposed by my friends be of any advantage to the people of South Midnapore or will it be disadvantageous to them ?

DISADVANTAGES OF SOUTH MIDNAPORE

I have not the slightest hesitation in stating that it will not only be of no benefit whatever to them, but it will further be of very great disadvantage to the people of South Midnapore. There is the difficulty of the Court language. It is Bengali now, but it has to be changed into Oriya. The suggestion that court language here may be both Bengali and Oriya is ridiculous, as it will never advance the Oriya language or the Oriya culture, for which they want a separate province for themselves. If the Oriya leaders are really of this opinion, then they had better thrown off their masks and come out in true colours, namely, that they want only to exploit the sentiments of some simple folk, in the name of cultural and

linguistic unity, although at heart they do not stand for them. But if they do not mean it, then the people of South Midnapore shall have to learn the Oriya language and unlearn Bengali to get on with their court works. The *Bengal Local Self-Government Act* was introduced into Midnapore in 1885 or 1886 and since then there has not been a single Pathsala under Midnapore District Board, where Oriya has been taught. I shall show later on that, even when the permanent settlement was introduced into Midnapore, even then her people at large used to read and write the Bengali language. The consequence has, therefore, been that the alphabets of the Oriya language are not known to 99.9 per cent. of people living in South Midnapore. To ask these people to learn the Oriya language is to invite unpopularity and opposition and the sooner the request is given up, the better it is for all concerned. They have no High Court in Orissa and they do not propose to have any in the near future, for financial difficulties. Therefore, the people of South Midnapore will have to go to Patna for their High Court business, instead of to Calcutta, and it is really unreasonable to expect that the people interested will peacefully accede to it. There is at present no permanent District and Sessions Judge at Balasore and accordingly for their district court business, they will have to go to Cuttack, in place of Midnapore. The circuit High Court system at Cuttack can never be preferred by anybody to the permanent Calcutta High Court system. Neither at Balasore nor at Cuttack have they as yet the system of trial of Criminal cases by jury and South Midnapore cannot be expected to submit to it after having enjoyed the jury trial system for about a quarter of a century. There are no roads, metalled or unmetalled, between Balasore and the southern portion of Midnapore, between which there is again the dangerous river Subarnarekha and accordingly they shall have to take a highly circuitous route to go to Balasore from their homes. There is likely to be division of Zemindaries, parts of which remaining in Bengal and parts

going to Orissa, and its implication is that the Zeminders concerned will have to keep separate establishments in two different provinces beginning from the Sub-Divisional courts up to the highest tribunals in the land. The people of Southern Midnapore pay their revenue in four Kists, while the Oriyas pay theirs in two. In Orissa they file their rent suits in Deputy Magistrate's courts, while in Midnapore they are tried by the Munsiffs. In course of time, the presumption of Dayabhag will be replaced by the presumption of Mitakshara and the permanent settlement by periodical increment of rent. Who would like to go for nothing to an infant minor province with possibly a Civilian Governor from the grown-up major province of Bengal with a Governor from England ? They have no University of their own and they can have none in the near future. The people of South Midnapore must therefore have to educate themselves under the Calcutta University, but it is likely to be disqualification in matters of securing appointments in Orissa, on the ground that the applicant have not adapted themselves to Oriya outlook and atmosphere, which is altogether an impossibility in Bengal schools and colleges. If they have a University of their own now or in the near future, then the sons and daughters of South Midnapore will have to read Oriya as their compulsory second language, which will mean that they will have to study two Vernaculars almost simultaneously. There being no Engineering and Medical Colleges in Orissa, Midnapore boys shall have to qualify themselves for same in Bengal, but these qualifications are also likely to be considered less attractive to the Oriya magnets. So far as I know the Local Board and District Board eleccion rules are different in the two different places, as also their franchise for same. There is no Union Board in Midnapore now, whereas it is understood that there is a similar institution throughout Orissa at the present moment. No one can say if the ministers for Local Self-Government in Bengal and in Orissa under the new constitution can be compared favourably with each other.

NO SOCIAL BOND

Well, no more time need be given to this aspect of administrative disadvantages to South Midnapore, if she is taken to Orissa. Some which has readily come to my mind have been described, but a large number of others may be easily gathered and stated. Now, these administrative disadvantages might have been condoned, if there was any social bond or relationship existing at present among the two peoples creating a natural attachment. But the fact is that, excepting some of the Oriya Brahmins and the Karans, who are only small minorities in South Midnapore, there is practically no other community there who has ever had any social intercourse with the people of Orissa. The Mahisyas who constitute the largest majority community in this area but who are likely to be a minority community in Orissa declare that they had never had any caste men of theirs beyond the Bengal borders, in consequence of which there has been no social relationship between them and the Oriyas since time immemorial. The social disadvantages, therefore, that confront the people of South Midnapore, if she is to go to Orissa, are also of considerable importance. They will have to learn the Oriya language in their new schools and colleges. But where would the bridegrooms come from, for their Oriya-speaking daughters ? In Orissa, there are either no caste men of many of them or there has been no social intercourse between them for centuries at all. In Bengal the bridegroom speaks the Bengali language and it is a foregone conclusion that they will not like to marry girls speaking the language of our Oriya friends. Where would they go then for marrying their daughters ? It may be mentioned here that certain communities of South Midnapore have already begun contracting marriage relationship with the people of 24-Perganas, Howrah and Nadia. It is unreasonable that in the face of such formidable disadvantages, both administrative and social, our Oriya friends should insist on taking South Midnapore to Orissa.

RACE BIAS

There is also the question of race bias or Oriya feeling that already exists among the people of some portion of Balasore in their behaviour towards the people of Midnapore. Quite a good number of middle class *Bhadraloks* of Contai have taken settlements of land in Balasore district, but their difficulties are as numerous as they are formidable. Apart from the cases, Civil and Criminal, that have been going on since the beginning, they do not even now get Oriya labourers easily to cultivate their lands or to do any other manual work for them, and therefore they have got to indent Midnapore or Mayurbhunja labourers every now and then. In the places, where they have their farm houses, they live isolated from the Oriyas altogether. They combine just as badly in supporting a false cause, as a true one. It is perhaps correct that their racial bias is born of their failure to get the lands which Midnapore men have secured on higher rates, but the fact remains that the Oriya feeling does exist in these areas among the inhabitants of Balasore District.

FUTURE RELATIONSHIP

This brings me to the question as to how the Oriyas are likely to behave with the people of Midnapore, if perchance, Midnapore is added to Orissa. It is almost a foregone conclusion that there will be intellectual competitions on the various walks of life between the Oriyas on the one hand and the Midnaporians on the other, and in the majority of cases the latter are likely to beat the former. Human nature as it is, a disastrous spirit of rivalry will then arise among the two peoples and it will lead to the same feeling of tension as now exists between the Oriyas and the Bengalis. "The race bias shown by the Oriyas" says Mr. Krishnamurti in the "Advance" of 14th August 1931, "has made the Andhras of this district (Ganjam) to realise the real gravity of the situation and.

convinced them of having a strong organisation for the protection of their claims over their district. An organisation under the name of the 'Ganjam Andhra Mandali' was formed with the object of fighting by all constitutional means for the protection of Andhra rights in Ganjam District."

I don't know how much of an Andhra is Oriya, but I feel that every Midnaporian will be labelled a '*Bengali*' for a century or so after the amalgamation, and, compared with the claims of the blue-blooded aristocratic Oriyas, he will remain for long an object of compassion or pity. If votes were to decide the intellectual merits or demerits of a particular individual of Midnapore, our Oriya friends are always likely to win, for the simple reason that their votes will always be numerically greater than those of Midnapore people. I don't suggest for a single moment that this state of things will continue for ever. I say that this is inevitable for at least 4 or 5 generations to come. It is too unnatural to expect that self-respecting Midnaporians will voluntarily agree to be subjected to such invidious distinctions in the immediate future.

NO ADVANTAGES AT ALL

Now, to counter-balance so many disadvantages, real and already existing or apprehended, is there any advantage which will or is likely to accrue to South Midnapore, if she goes to the new separate province of Orissa ? I have thought over the matter seriously and I regret I have found none at all. I have asked many friends about this but they have also failed to point out any. We shall therefore remain obliged to our Oriya friends, if they will kindly point out to us the advantages which we may expect from our amalgamation with them. . Accordingly, until our Oriya friends point out, we are confronted with various disadvantages only and my second question, whether such a separate province as they have proposed will be advantageous to us or not, must also be answered in the negative.

CHAPTER V

THE THIRD ISSUE

In the third question, I have raised the issue as to whether a full-fledged separate province for Orissa in the immediate future is financially possible and as to whether South Midnapore should be asked to go to Orissa now, if it were not so. I have raised this question simply to show that a full-fledged separate Orissa Province in the immediate future is financially a doomed proposition and therefore there should be no argument advanced by anybody in favour of the amalgamation on that wrong assumption. It is a doomed proposition because the areas proposed to be added to Orissa lie mostly in Madras and Bengal Presidencies, of which the former is the most advanced of all the provinces in India and the latter is certainly more advanced than Behar and Orissa combined or Orissa Division alone. The expenditure in Madras on education and medical relief and public health has increased between 1922-23 and 1929-30 by 82 and 115 per cent. respectively and in Bengal on the same heads between the same years by 21 and 24 per cent respectively. A full-fledged separate province for Orissa means that there shall be no lowering of the aforesaid standard of expenditure in the nation-building departments in Ganjam and South Midnapore. It also presupposes a High Court of its own, a University, the establishment of the District Judges' Courts in all the districts of the new separate province, the construction of metalled and unmetalled roads and bridges where necessary in the added areas, the development of industries of all descriptions and many other costly things. No mention need be made of the non-civilian Governor and his staff, of the Legislature and its election expenses, of the Secretariate and its paraphernalia, as they are so obvious. The most obvious, however, is the fact that Orissa Division's present

standard of expenditure is only 1.8 rupees per head or less and it has to be increased either to 4.1 rupees per head as in Madras or 2.5 rupees per head as in Bengal. But an area, which has no money to have a mere Governor's province of the Assam type and which therefore urges the amalgamation with it of some of its neighbouring tracts, cannot possibly aspire to the other things in the near future.

NO POSSIBLE INCOME FROM ANYWHERE

We cannot overlook the fact that there are no sea-ports in Orissa to-day and that there can be no sea-ports in the Utkal of to-morrow. Any attempt to increase periodically the land revenue in the added areas also, will be morally indefensible and in years to come it is likely to spell disaster to whatever little got at present on that heading. The income of the Government of India is also likely to be reduced by the granting of provincial autonomy to the different provinces, and therefore very much in the shape of contribution from the Central Government cannot be expected. It is also not known for how long the present standard of income from custom, which is an important central subject, will continue. The Simon Commission says, "from now onwards any increase of revenue from existing sources except receipts from large irrigation schemes mainly in the Punjab and Sindh is likely to be small." But as days go along, the Central Government will also be confronted with the question of developing their own wards, as the new Orissa Government will be confronted with theirs. For more than a century, every little question which needed immediate attention and which could have been met if attended to then and there, has been kept back to be solved by the next Viceroy or his next, until they are now the biggest problems of the Empire and their number is legion. In the mean time, all the incomes of the state have been so arranged to be spent that either the whole system must be changed beyond recognition or sooner or later a complete breakdown is

inevitable. The financial position of the future Government of India will be better appreciated from this view-point. The question of retrenchment is also in the air now, but it is really not known how much is actually needed at once to begin with the nation-building departments—much less, how much is necessary in all for their full and complete development. I believe that even if Mahatma Gandhi becomes the Viceroy of India to-day, even then he would fail, with his well-known principles of retrenchment to satisfy the ever-growing needs of the people of India.

SOUTH MIDNAPORE CAN NOT GO NOW

But supposing that there can be, in some remote or distant future, a full-fledged separate province in Orissa, should the people of South Midnapore be asked to join the Oriyas now ? The question is answered, no sooner it is put. They are already in an advanced province. They are bound to grow great and greater with the growth of Bengal. There is no chance of any intermediate set-back there, but their joining Orissa to-day means not only that they must be ready for a thousand and one set-backs immediately, but also that their growth in some distant or remote future is only a mere uncertain possibility. A bird in hand is worth two in the bush and no amount of philosophical discourse or discourse on nationalism and patriotism will induce South Midnapore to go to Orissa, under such circumstances.

CHAPTER VI

THE FOURTH ISSUE

A great controversy has been raised over the fourth issue, namely, whether it is correct to say that South Midnapore is at the present moment culturally and linguistically Oriyas. It goes without saying that, if she is not so then she must not be incorporated with Orissa for any reason whatsoever.

ORIYA CULTURE

We may dispose of the question of Oriya culture at the outset in a few words. I don't think there is much difference between the Oriya culture and the Bengali culture. I believe that they are essentially almost the same, Buddha and Chaitanya's influence pervading both to a great extent. The *Bengali Kirtan* still inspires the Oriyas, they having none of there own. After all, they are parts of the same great Hindu culture. In any case, it cannot be asserted that Oriya culture is in any respect superior to Bengali culture. If so, why should South Midnapore give preference to Oriya culture ? If not, why should she like to go to Orissa for the sake of Oriya culture ? Besides, culture is daily becoming international or universal in its conception and it will be really going backwards to do anything great in the name of any particular culture of a particular small area.

LINGUISTIC UNITS

As to the alleged linguistic unity, it is apparent that some writers have been spending large quantities of midnight oil over the question. Some of them have traced the history of South Midnapore to the days of independent Oriya kings. Some others have gone so far as to quote chapters and verses

to prove that the present Kharagpur, Midnapore, Salboni and Kespur thanas were also under them. Some others, again, have pointed out that, by discussing the history from the Pouranic age to the days of the Muhamedan rule, one cannot but come to the conclusion that the northern boundary of Orissa was the river Subarnarekha. It is so stated in the 26th and 27th slokas, Chapter VI, Scandhapuran, Utkal Edition. At the time of Muhamedan rule, *Chakla Hijlee* was within *Sube Bangala.* Cunningham's Ancient Geography of India describes the Subarnarekha as the northern boundary of Orissa. His opinion has been accepted by the authors of the East Indian Gazetteer and also by Hunter. But, after all, this is only ancient history, whereas we are interested in the the Oriya language in Midnapore.

If South Midnapore was in Orissa in the middle ages, it also never existed on the surface of the water when Huenthsang came from China to Tamralipta or modern Tamluk. If the origin of the people of South Midnapore is to be traced to the days of antiquity, to establish linguistic connection between them and the Oriyas, then why not go to the fact that the whole of the Aryan race belonged to the same place at the beginning and that they had but one language originally. If antiquity has any special charm of its own, then the most antiquated ought to be most charming in this world and then the middle ages ought to be effaced from human memory altogether. It is really painful to think how the Indian peoples have not grown with the growth of the times, but have always tried to cling fast to the old and the ancient without any reason or rhyme. There is no gainsaying the fact that the people of India still live only four annas in the present and twelve annas in the past, while the Americans, their antipodes, live only four annas in the present and twelve annas in the future. The past has, of course, an undoubted value but it is only to spur men to future actions, in the light of experience gained in the past,—not at all to take them back in thought and action to the

days of yore. Therefore, in my humble opinion, no useful purpose is served by either side by tracing the unity or disunity of language of the two peoples to the middle ages or ancient times. What is the position of affairs now linguistically in Southern Midnapore and what injury, if any, is possible to her cause, if she does not join the Oriyas in speaking the Oriya language—are the real questions involved in the alleged linguistic unity. But I am afraid, these questions have not been fully discussed from these standpoints.

WHAT IS LANGUAGE ?

It must first be ascertained what is meant by "language." The spoken language of the Chittagonians is not Bengali at all, but still they are called Bengalees. The spoken language of the people of extreme North Bengal is also not strictly Bengali, but still nobody says that they are not Bengalees. What is meant by "language" then ? Is it meant the spoken language or is it the language in which they read and write ? It is obvious, to my mind, that "language" does not mean the spoken language. Being in the border of Orissa, the spoken language of the people of South Midnapore is bound to be somewhat mixed. If the whole district of Midnapore is taken into Orissa to-day and its court language is made Oriya, then, I am sure, after ten years, the bordering Districts of Bankura, Hoogly, Howrah and 24-Parganas will be found speaking the Oriya language. That is why we find to-day that even though Balasore is in Orissa proper, her spoken language, being in the border of Bengal, is not strictly Oriya either. So much so that I find in a pamphlet of our friends that the court language of Balasore District is still both Bengali and Oriya. Well, will our Oriya friends consent to the amalgamation of Balasore with Midnapore in Bengal on that account ? The reason, which has actuated them to demand the inclusion of Midnapore in Orissa, is the same which demands Balasore's inclusion in Bengal. The fact is

that the spoken language of the border districts in all countries and climes has been mixed and it fluctuates with the sifting of boundaries of administrative units.

CHARACTERISTICS OF SOUTH MIDNAPORE'S SPOKEN LANGUAGE

In South Midnapore, therefore, the spoken language has no alphabet of its own, no grammar, no literature of any kind and it is never taught in its numerous primary and other schools. The vernacular medium which is employed in teaching the boys and girls of these schools is also pure Bengali. Besides, the spoken language is more akin to Bengali than to the Oriya language. I have personal knowledge that, when the people of South Midnapore talk in their own spoken language before friendly Oriyas of Balasore or Cuttack, the latter laugh at the former. Phonetically, it is much nearer to Bengali than to the Oriya language. Its accents are like those of the Bengali speakers. The tongue moves like a Bengali speaker's in speaking it. For all these reasons, the spoken language of Southern Midnapore cannot be the criterion on which such a momentous question can be decided. That is perhaps why the authors of "Separate Province for Utkal" have been constrained to admit. "By language we do not mean the language spoken at home." They have, however, not been able to give it up altogether but I think to that extent they have been unfair to themselves. They ought to have frankly admitted that spoken language cannot be any criterion whatever, sole or otherwise, and that it is the language of the existing schools and colleges—it is the language of the literature which is devoured by the people concerned, that decides the question.

But they could not possibly say so in so many words, for, then, South Midnapore will at once have to be put away from the present controversy. There is in this area not a single school of any kind or college, where the Oriya language

has been taught during the last 100 years or so. When the permanent Settlement was introduced in Bengal in 1793 and when the Midnapore *Zeminders* afterwards gave Kabuliats to the Collector under the terms of the same, they gave the Kabuliats in the Bengali language and they are still to be seen in the Midnapore Collectorate. I know of some highly educated and respectable families in South Midnapore, where the present incumbent's father, grand-father and great-grand-father never knew the Oriya alphabet. In practically no house in this area will be found any other literature than the Bengali, which is largely read by the people. As a matter of fact, as I have said before, 99.9 per cent. of the people of South Midnapore read and write the Bengali language and do not know even the alphabet of our Oriya brethren. It was therefore impossible for my friends to admit that the test of spoken language should be no criterion but that the language of the present literature read by people should be the test in a matter like this.

THE OTHER CRITERIA

So far as the other criteria, to be applied and contemplated by them, are concerned, they have not been very clear either. Having said that "the language spoken at home should not be the sole criterion," they proceed to state that "an Oriya caste may have under the stress of present dismemberment become Telegu or Hindi speaking because of want of facilities in schools, courts and kutcharies for the Oriya language. A unit of area should be fixed in each of the outline tracts and if Oriya is the predominant language in that unit then it should go with Orissa." The difficulties in the way of understanding the above fully are the words "Oriya caste," a "unit of area" and "the predominant language." It is likely that by words "Oriya caste" they meant the alleged Oriya people, by "an unit of area" they meant the administrative unit of some kind and

by "the predominant language" they meant the predominant spoken language. If that is so, then exception is to be taken only to the test of predominant spoken language. I have already shown that spoken language should never be criterion for a serious matter like the proposed separation and amalgamation. It is an artificial test altogether, it does not go to the root of things nor touch the noble sentiments of civilized or educated men. But I propose to show that assuming that these tests are right and reasonable even then they do not affect South Midnapore in any way.

ONLY TWO LACS IN TWELVE

The authors of "Separate Province for Utkal" have assumed all the alleged Oriya-speakng tracts in Bengal, namely, the Contai Sub-division and the thanas of Mohunpore, Danton, Gopiballavpore and Nayagram, as one unit. I also do the same for the purpose of finding out the predominant language of the area. Well, our friends themselves say that its total population was 1243580 in 1921 and its Oriya population was 572798 in 1891. Having given the total population of 1921 they ought to have given the Oriya population of that year by its side. They have explained that as there was manipulation by interested people during the census of 1921, they have given the figures of the Oriya population of 1891 in the tabular form. Whether there was any manipulation or not in 1921 will be discussed later on. What I want to point out here is that the figures of the Oriya population in 1911, when there was no manipulation are 181801 and at least these figures ought to have been placed in the tabular form together with the total population in 1921. But whatever they might have done, we find from the above that out of a total population of about 12½ lacs, only about 2 lacs are Oriya-speaking and the other 10½ lacs are Bengali-speakers. Now, can it be said, under such circumstances, that the predominant spoken

anguage of this unit is Oriya? Unfortunately, I have not been able to get at the figures of 1931 and so I cannot say how matters stand to-day. It is likely to be worse for the purpose of our Oriya friends. But comparing the old and undisputed figures, we cannot but come to a conclusion, which entirely puts our Oriya friends out of count.

UNIMPORTANT MANIPULATION

As to the allegation that there was manipulation in 1921, there is no doubt that the census reports say so. But when the average yearly reduction in South Midnapore is compared with that of Ganjam, where there was manipulation in favour of the Oriyas in 1921, we find that it is less in South Midnapore than it is in Ganjam. The number of Oriya speakers in Ganjam district was 1274975 in 1901 and 931790 in 1921. The number of the same in Midnapore district was 270495 in 1901 and 142107 in 1921. That is, in Ganjam district, the average yearly reduction during the twenty years stands at 17159, while in South Midnapore the same for the same period stands at 6419 only. This shows that, even if there was any manipulation in any thana in South Midnapore at any time, it was of the slightest consequence.

It is, therefore, not correct to say that there is unity of culture and language between Southern Midnapore and Orissa or that Southern Midnapore is culturally and linguistically Oriya and that she would on that account be incorporated with the latter.

On the other hand, we, the people of South Midnapore, are bold to maintain that culturally and linguistically we are Bengali. One important principle of Hindu Law is that the Dayabhag School or the Bengal School obtains in Bengal. If this criterion is accepted, we shall be able to prove to the very hilt that 80 per cent. of the people of South Midnapore are governed by the Dayabhag Law.

For generations we have drawn inspirations from the Bengali language and literature. Bankim Chandra's immortal

song '*Bande Mataram*' and Rabindranath's life-inspiring national songs are sung in every home. In the last two movements these songs were the main motive force for action to the people of Contai. We cannot allow our descendants to forget the literature of Bankim Chandra, Rabindranath and Saratchandra. The Bengali literature is the only literature of the East which has obtained recognition throughout the world. It is well-known that a chair has been created in the Oxford University for the Bengali literature. Rabindranath's '*Gitanjali*' is read all over the world. We are proud of this heritage aud shall not lose it at any cost.

Bengal's oulture is altogether of a unique nature. Bengal's Vaishnavism, Navyanyaya, Brahma Samaj, Ramkrishna Mission ; Bengal's great men—Ram Mohon, Iswarchandra, Sri Ramkrishna, Vivekananda, Ashutosh ; Bengal's poets and writers of fame—Madhusudan, Dwijendralal, Bankim Chandra, Rabindranath, Sarat Chandra ; Bengal's statesmen—Sri Surendra Nath, Anandamohon, Chittaranjan ; Bengal's world-renewned scientisis—Sir Jagadish, Sir Profulla, Dr. Meghnad ; Bengal's higher culture and civilisation ; Bengal's high standard journals and newspapers—these are proud heritages. We claim them our own and won't part with them for any reason whatsoever. May we ask our Oriya friends what we shall get in exchange for these ? Some posts, perhaps, in the new Orissa Government. These are too paltry things to be taken account of. We are not going to sell our birthright for a mess of pottages,

We claim that Bengal's natural boundary is the river Subarnarekha. Two thanas on this side of the Subarnarekha are still within the Balasore District. We maintain that these two thanas must be included within the district of Midnapore without any further delay.

CHAPTER VII

THE LAST ISSUE

The only other question which remains to be dealt with is the question of self-determination. Even if it is assumed that South Midnapore is culturally and linguistically Oriya, even then her people should be consulted before she is added to Orissa. Are our Oriya friends going to consult them ? Are they going to drop the agitation against South Midnapore, if they discover that she is altogether unwilling te go to their side ?

The separation and amalgamation having been suggested only on the ground of unity of culture and spoken language, it is just and proper that the people concerned should be consulted and consulted seriously and honestly before the suggestion is given effect to. Unity of culture and spoken language is not a tangible thing which everyone can see and decide for himself what it realy is. It is mostly a matter of opinion. It is a question of pure sentiment. But opinion and sentiment differ in different people. Accordingly, it is fair and right, that, before the present administrative arrangements are changed in any way, the people interested are consulted on the subject.

PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION

This is why, I think, the Simon Commission reports the that the question of re-distribution of territories can be undertaken "only after taking full account of the interests and even the prejudices concerned.........There are very great difficulties in the way of re-distribution and the history of partition of Bengal stands as a warning of the caution needed before undertaking any operation so likely to run counter to old association or to inflame

suspicion and resentment···Most important of all relevant factors perhaps, for practical purposes, is the largest possible measure of general agreement on the changes proposed both on the side of the area that is gaining, and on the side of the area that is losing, territories."

The Nehru Committee also asked—"What principle should govern re-distributions ?" and replied.—'-The main consideration must necessarily be the wishes of the people."

THE ORIYAS AGREE TO IT

Our Oriya friends, the authors of "Separate Province for Utkal," do also recognise this principle and have said, "There may be one or two small areas predominantly Oriya-speaking, but as a result of the disruptive force working so long in the outlying areas, their leaders may be incapable of realising the value of a separate Utkal province. In such a case, there should be a referendum to the adult population to finally decide the issue."

INVITATION TO ORIYA LEADERS

I would, therefore, on behalf of the Anti-Partition Committee, South Midnapore, respectfully invite the leaders of Orissa to accompany me in my tour through the affected areas as soon after the present rains as possible. They will place their views on the subject before the people, as the views of those who hold differently from them will also be placed before them. A plebiscite will then be taken in the presence of both parties and its result will be communicated to the Government and the press. If the verdict of the people concerned be in favour of our friends, no one would be more satisfied than myself and I undertake to stay my hands altogether. But will our friends also undertake that if the verdict be against them, they will also drop their proposal or suggestion regarding South Midnapore ? I intend to give about a month to the tour and arrange about 15 to 20 meetings. A

programme can be fixed up after mutual consultation or correspondence.

In conclusion, I appeal to the Oriya leaders, some of whom are my best and intimate friends, to come and see things on the spot for their personal satisfaction. There cannot be the slightest doubt that their grievance that they are suffering badly for want of a separate province is well-founded and genuine. But have they considered seriously how much, if at all, South Midnapore can help its solution ? Is there no other scheme which will give Orissa a separate province and yet it will not disturb the existing arrangements in South Midnapore and consequently Bengal ?

I also appeal to the Bengal leaders to consider the situation which will arise in Bengal, if 12 lacs were taken away from Midnapore to Orissa. I beg to remind them that, according to Nehru Committee's recommendations 12 lacs mean 12 seats, and according to Simon Commission's recommendations, 12 lacs mean about 6 seats in the local legislature.

আমার মা আনন্দময়ী

স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

কাঁথি সহরের অনতিদূরে দক্ষিণে দুর্গাপুর গ্রাম। মাল বংশ সেই গ্রামের পুরাতন বংশ। স্বর্গীয় পঞ্চানন মাল মহাশয় সেই বংশের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আমার মা আনন্দময়ী সেই পঞ্চানন মাল মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ছিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর নাম কেন যে আনন্দময়ী রাখা হইয়াছিল, জানি না। তাঁহার অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, সেইজন্য মাতামহ মহাশয় সর্ব্বদাই হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। মাতৃহীনা কন্যাকে দেখিলেই তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিত না। সেই যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার জন্যই বোধ হয় তিনি কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন আনন্দময়ী। যাহা হউক, জন্মবাসরে যে নামের বৈশিষ্ট্য কেহ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাই, মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুশয্যায় আমি তাহার সার্থকতা প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছি।

যেদিন রাত্রিশেষে মাতাঠাকুরাণী দেহত্যাগ করেন, সেইদিন রাত্রি দশটার সময় আমি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। আসিয়া দেখি যে, তিনি সকল দিনের মত সেদিনও সন্ধ্যা ৮-৮॥৹টার সময় তাঁহার যাহা নিত্য আহার্য্য তাহা আহার করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছেন। সেইদিন কিংবা তৎপূর্ব্বে চারি মাসের মধ্যে কোনও দিন আমি কিংবা বাড়ীর কেহ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা কল্পনাও করি নাই। সুতরাং আমিও আহারাদি শেষ করিয়া পাশের ঘরখানিতে শয়ন করি। তাঁহার খাটের পার্শ্বে নীচে দুইজন চাকর যেমন প্রত্যেক দিন রাত্রে শয়ন করিত, তেমনি সেইদিন সেই দুইজন চাকর সেইখানে শয়ন করে। তাহাদের মুখে পরে শুনিয়াছি যে, মাতাঠাকুরাণী রাত্রি ১-১॥৹টার সময় একবার জাগিয়াছিলেন এবং উহাদের সহিত সকল দিনের মত সম্পূর্ণ সহজ ও সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তৎপরে তাহারা তাঁহার আর কোন সাড়াশব্দ পায় নাই। সকালে আন্দাজ ৬টার সময় মুখ-হাত ধুইয়া জামা পরিতেছি, এমন সময় চাকর ভোলানাথ হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমি দৌড়িয়া গিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হাত-পা ও সর্ব্বাঙ্গ তখন পর্য্যন্ত বেশ গরম ছিল এবং

বিছানার কোনও স্থানে, তিনি যে মৃত্যুযন্ত্রণা পাইয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না দেখিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার-বাবুকে আনাই। তিনি আসিয়া বলেন, সকলই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে। তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে একেবারে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সচরাচর তাঁহার মাথায় যেরূপ কাপড় থাকিত, দেখিলাম তখনও তাহা ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। গায়ের লেপ গলা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অকুঞ্চিত অবস্থায় ঢাকা আছে। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, নামজপ করিতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। তাঁহার স্বভাব-সুন্দর গম্ভীর মুখখানি মৃত্যুমলিন না হইয়া, তিনি যে মৃত্যুকে অতি অবহেলায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন যেন সেই আত্ম-প্রসাদের গৌরবে ভরপুর হইয়াছে। কেহ দেহত্যাগ করিলে তাহার বদনমণ্ডল এমন স্বর্গীয় আনন্দে স্বর্গের পারিজাতের মত ফুটিয়া উঠে ইহা আমি ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, মৃত্যুশয্যায় তাঁহার নামের সার্থকতা প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

আমার মাতাঠাকুরাণী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বের কথা। তখন মেদিনীপুর জেলায় ইংরাজ রাজত্ব মাত্র ৫০ বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ততঃ কাঁথি মহকুমা সম্বন্ধে ইহা নিতান্ত অনুমানের বিষয় নহে। ইংরাজ-রাজ তখনও এদেশের গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও চৌকিদারের কোন নূতন ব্যবস্থা করে নাই। এদেশের ভূম্যধিকারিগণই তখন এদেশের শান্তিরক্ষা করিতেন। কাহাকেও কোন চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হইত না। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে এই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কারণ, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৬শা নভেম্বর তারিখেই এদেশের তদানীন্তন বড়লাট সভায়, এদেশের ভূম্যধিকারিগণকেই অতঃপর গ্রাম্য চৌকিদারগণের জন্য চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হইবে এই মর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম এক নূতন আইন পাশ হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার বিগত ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলনের সময় একথা আমি অবগত ছিলাম না। আজ আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে এই সত্য আবিষ্কার করায় হৃদয় গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে।

মাতাঠাকুরাণী লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহার বাল্যাবস্থায় এদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। এমন কি, প্রাথমিক শিক্ষার

আইনটাই তাঁহার জন্মের প্রায় ৩৯ বৎসর পরে প্রথম পাশ হইয়াছিল। আমি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের কথা বলিতেছি। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৪ বৎসরে আমাদের দেশের বালকগণের শিক্ষাই বাধ্যতা মূলক হয় নাই, বালিকাগণের শিক্ষা ত দূরের কথা। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি যে, আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী লেখাপড়া না শিখিয়াও যেরূপ উচ্চহৃদয় ও তীক্ষ্ণবিচারবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন, আজকালকার দিনে লেখাপড়া শিক্ষার ফলেও সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

প্রকৃত শিক্ষা মানবাত্মাকে অন্তর্মুখী করে। বহির্জ্জগতের আগাছা-পরগাছাসকল যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষিতের নিকট পরিস্ফুট করিয়া দেয় এবং তাহার প্রথম পরিণতি এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে শিক্ষিত সে স্বভাবতঃ নিঃস্বার্থ হইয়া থাকে। আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী অশিক্ষিতা হইয়াও স্বভাবতঃই নিঃস্বার্থ ছিলেন। তিনি যখন বাড়ীতে আসেন তখন এ-বাড়ীতে অর্থের অভাব একেবারেই ছিল না। পিতামহ মহাশয়, কাষ্ঠ ও লৌহের সিন্দুকে টাকা ধরিত না বলিয়া দ্বিতল গৃহের মেজের উপর বড় বড থলিয়াতে টাকা ভর্ত্তি করিয়া তাহা গৃহের চারিদিকেব দেওয়ালের ধারে বসাইয়া রাখিতেন। কাষ্ঠের কড়ি ভাঙ্গিয়া টাকা নিম্নতলে পড়িয়া যাইতে পারে বলিয়া মেজের মধ্যভাগে থলিয়া রাখিতেন না। বীরকূল জমিদারী ক্রয় করিবার সময় বাসুদেবপুব রাজার দুইটি হস্তীর পৃষ্ঠে এত টাকা চাপাইয়াছিলেন যে, তাহারা টাকার ভারে আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। পিতামহ এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়াছিলেন এবং সমূহ টাকা সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া কেবল নোট দিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের সময়ও সহস্র সহস্র মুদ্রা মাতাঠাকুরাণীর নিকট সর্ব্বদা আসিত। কিন্তু আমি একথা নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি যে, এমন ঘরের পুত্রবধূ ও গৃহিণী হইয়া তিনি একদিনের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। আমি বাল্যাবস্থায় পিতামহের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে একটি পয়সার ছোট থলি লইয়া পলাইতেছিলাম। পিতামহ তৎক্ষণাৎ তাহা কাড়িয়া লইয়া একটি ১০০টি সোনার মোহরের থলি আমার হাতে দিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাহা এমনভাবে রাখিয়াছিলেন যে, আমার সম্যক জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বেই তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল।

মাতাঠাকুরাণীর নিকট দানের কোন মাপকাঠি ছিল না। কন্যা তাঁহার

নিজের কি হইবে তাহা তিনি একেবারেই চিন্তা করিতেন না। আবার তিনি বাছ-বিচার করিয়াও দান করিতে পারিতেন না। নির্ব্বিচার দানই তাঁহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ছিল। আমি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নানা স্থানে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সত্যই, দানের ধর্ম্ম অবিচারে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। আকাশের বারি যেমন পুষ্প ও আবর্জ্জনায় ঝরিয়া পড়ে প্রকৃত দাতার দানও ঠিক সেইরূপ তাঁহার নিকট যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার নাই—সে যে বাহিরের জিনিষ। তাঁহার অন্তঃপ্রবাহিত ভগবৎ পিপাসাকেই সন্তুষ্ট করা তাঁহার দানের একমাত্র লক্ষ্য। দরিদ্রের মধ্য দিয়া নারায়ণকে অর্ঘ্য দানই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণভাবে উক্ত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মহিলা ছিলেন। মাতাঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পোর্টমেণ্ট খুলিয়া দেখিয়াছি—তিনি মৃত্যুর পূর্বে কয়েক দিন ধরিয়া আমার নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কাহারও জন্য সোণার কাণের ফুল, কাহারও জন্য গায়ে দিবার চাদর, কাহারও জন্য বাসন ইত্যাদি ক্রয় কবিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার আর একটি মহৎ গুণ ছিল সকল মানুষকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা। তিনি আমাদের জন্মগত জাতিভেদে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। আজ তাঁহার মৃত্যুর পরে চণ্ডীভেটাব বাল্যজীবনের কথা মনে পড়িতেছে। আমবা ভাইবোনে প্রত্যেক দিন প্রাতে পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বে কিছু জলযোগ করিতাম। আমরা সকলে কিছু না কিছু খাইতেছি, এমন সময় হয়ত বনমালি-বেড়্যা গ্রামেব কোনও নমঃশূদ্রের পুত্র বা কন্যা কার্য্যবশতঃ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বালসুলভ চপলতাব সহিত তাহাকে সেখান হইতে সরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী তদ্দণ্ডে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেখানে আসিতেন এবং আমাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন যে, সে মানুষ, গরীব, তাহাকে তাড়াইতে নাই, বরং তাহাকে আমাদের হইতে কিছু আহার্য্য দেওয়া উচিত। তারপর আমরা তাহার সহিত এক আসনে বসিয়া আহার করিতাম। ইহাতে মাতাঠাকুরাণীর আনন্দের সীমা থাকিত না। পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর যেদিন ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সেদিনের রাত্রের ঘটনাও আমার স্মরণ আছে। মাতাঠাকুরাণীই সর্ব্বপ্রথম

তাঁহার নবাগতা ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী পুত্রবধূর সহিত সেই রাত্রে একসঙ্গে এক থালাতে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে মাতাঠাকুরাণী আমার সহিত ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই খুব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম—তিনি লেখাপড়া না জানিলেও শিক্ষার চরম উৎকর্ষ তাঁহার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজকে বর্ত্তমান জগতের উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইলে তাহাকে তাহার জন্মগত জাতিভেদ প্রথা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রথার উচ্ছেদ যদি কখনও ঘটে, ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ ও বংশধরগণ তখন এইরূপ অশিক্ষিতা মহিলাব উদারহৃদয়তা ও দূরদর্শিতার নিকট নিশ্চয়ই মস্তক অবনত করিবেন। আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি যে, আমি এমন মায়ের গর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম।

মা মাত্রেই সন্তানবৎসলা, কিন্তু আমার মনে হয় যে. আমার মাতাঠাকুরাণীর মত সন্তানবৎসলা মাতা এই পৃথিবীর আব কোথাও কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমার মা আনন্দময়ী আমাকে যে কত স্নেহ করিতেন তাহা একবার আমার ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসের সময় অতি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং আর একবাব, আমি যখন কাবাবরণ করি তখন আমি বুঝিতে প্যারিয়াছিলাম। বিলাত হইতে সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া যখন আমি প্রথম তাঁহাব পদধূলি গ্রহণ কবি সেইদিন তাঁহার সেই কঙ্কালসার দেহ ও বিশুষ্ক বদনমণ্ডল দেখিয়া সত্যই আমাকে শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। আবাব জেল হইতে ফিবিযা প্রায় সেই দৃশ্যই যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সম্যকরূপে বুঝিতে পারিযাছিলাম তাঁহার পুত্র-স্নেহের গভীরতা কত।

মা জীবনে কখনও এ-পুত্রের কথা সে-পুত্রের নিকট কিংবা সে-পুত্রেব কথা এ-পুত্রের নিকট বলিতেন না। আমরা ভাযে ভাযে বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবাব জন্য যখন ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তিনি তখন একদিন ধীবে ধীরে ফুলবাড়ী চলিযা গিযাছিলেন এবং বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার তিন পুত্রেব মধ্যে কোনও পুত্রেব নিকটই থাকিবেন না, কাবণ তাঁহার নিকট তাঁহার সকল পুত্রই সমান।

মা! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চিরদিনেব মত চলিয়া গিয়াছ—একথা

চিন্তা করিতেও হৃদয়ে গভীর যন্ত্রণা অনুভব করি। তুমি যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতে। যখনই কোনও পাপ বা প্রলোভন আসিয়া আমার কর্ম্মজীবনের অন্তরায় হইত, তখনই যে আমি তোমাকে আমার হৃদয়-মধ্যে মূর্ত্তিমতী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে দেখিতে পাইতাম। কারাগারে থাকিতে যে গঙ্গার তীর আমার বাসস্থান হইয়াছিল সেদিন তোমাকে সেই গঙ্গার তীরেই চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া আসিয়াছি। মাগো! তোমাব যে বুকে মুখ লুকাইয়া কতদিন কত বৎসব কাঁদিয়া হাসিয়া স্বর্গের সুখ ও শান্তি উপভোগ করিয়াছি—যে বুক হইতে স্তন্য টানিয়া পান করিয়া আমার এই নশ্বর দেহ পুষ্ট করিয়াছি, নিজের হাতে তোমাব সেই পবিত্র সোণার বুকখানি পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়া আসিয়াছি। লোকে বলে আমি খুব ভাগ্যবান, কেননা তুমি আমার গৃহেই দেহত্যাগ করিয়াছ এবং আমি তোমার শেষ সৎকাব করিতে পারিয়াছি। লোকেব কথা লোকে বুঝিবে, আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমার সৎকারের সময় তোমার পাশে বসিয়া আমার হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাতৃদেহে অগ্নি অর্পণের ভার সমাজ পুত্রের উপর না ফেলিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

মা, তুমি মরিয়াছ—একথা বলিব কেন? এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাণময়। তুমি যে-প্রাণ হইতে প্রাণ পাইয়াছিলে, তুমি যে আবার সেই প্রাণেই বিলীন হইয়াছ। আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রাণ, তোমাব সকল পুত্রের প্রাণ, আবার সেই প্রাণেই একদিন প্রাণ পাইবে। সেই প্রাণের কর্ত্তার নিকট আজ কি প্রার্থনা জানাইব, মা? তোমার প্রাণ আবার জন্মান্তব গ্রহণ না করুক, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনাই জানাইতেছি। আমার শিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ, সেইজন্য আমি যে মা ইহাপেক্ষা বড় কোনও প্রার্থনা করিতে শিখি নাই। আমি আজ তোমার মৃত্যুর পরে এই কথা কয়টি অতি বিনীতভাবে বলিতে পারি যে, কোন পুত্রের নিতান্ত সরল, অকপট, গভীর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ প্রার্থনায় যদি কোনও মাতার আত্মার বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তোমার এই অধম পুত্রের এই প্রার্থনা সেই প্রার্থনাময়ের চরণে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ।

ব্যক্তি-পরিচিতি ও ঘটনার বিবরণ

পৃঃ ১৭ ঃ—হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭০-১৯৫১ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার রাধানগর গ্রামে জন্ম। বাংলায় বিপ্লব-সমিতি স্থাপয়িতা দুইজনের মধ্যে ইনি একজন। বাংলার প্রথম বিপ্লবান্দোলনে ইনি ছিলেন অস্ত্রগুরু। ইনি নিজে দুইটি বোমা তৈয়ারী করিয়া ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে বিনয়জীবন ঘোষ প্রণীত "অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র" দ্রষ্টব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮ খৃঃ)—মেদিনীপুর সহরে জন্ম। ভারতে বিপ্লব-যজ্ঞের অন্যতম যাজ্ঞিক। ইনি বিপ্লবান্দোলন সম্পর্কে ধৃত হইয়া আলিপুর জেলে অবস্থান কালে হেমচন্দ্র কানুনগোর সহযোগে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করেন। ইঁহার ফাঁসি হয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামে জন্ম। বিশ্বে কমিউনিষ্ট ভাবধারার প্রবর্ত্তক। মেক্সিকোর স্বাধীনতালাভের মূলে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা। তিনি রাশিয়ায় কমিণ্টার্ন-এর অন্যতম সভাপতি ও লেনিনের একান্ত অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি মানবতাবাদ নামক এক নূতন মতবাদের প্রবর্ত্তক। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য (১৯১৩-১৯৩২ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার গোকুলনগরে জন্ম। মেদিনীপুরের জেলা-শাসক মিঃ ডগলাসকে হত্যার অপরাধে ইঁহার ফাঁসি হয়।

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৬৯-১৯৪২ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা গ্রামে জন্ম। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবান্দোলনের সময় তিনি জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে করিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় তাঁহার বাম হাতে ছিল জাতীয় পতাকা এবং ডান হাতে শঙ্খ। পুলিশ প্রথমে বাম হাতে গুলি করে। মাতঙ্গিনীর ডান হাতের শঙ্খ পড়িয়া গেলে তিনি ডান হাতে পতাকা ধরেন। পুলিশ ডান হাতে গুলি করিলে তিনি রক্তাক্ত দুই হাতে পতাকা ধরেন। তারপর পুলিশ তাঁহার কপালে গুলি করে।

চুয়ার্ড বিদ্রোহ—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ (প্রধানতঃ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ) হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আদিবাসী সৈন্যসামন্তদের সাহায্যে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন তাহা চুয়ার্ড বিদ্রোহ নামে কথিত হয়।

পৃঃ ১৮ ঃ—স্বদেশী আন্দোলন—২৯নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩০ ঃ—এই সময় (শেষ অনুচ্ছেদের প্রথমে)—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

পৃঃ ৩২ ঃ—লর্ড কর্জ্জন (১৮৫৯—১৯২৫ খৃঃ) ইনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ইনি অসুস্থতা হেতু ছুটি লইলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লর্ড এম্‌থিল তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। লর্ড কর্জ্জন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন।

পৃঃ ৩৩ ঃ— মিঃ এ কে. ফজলুল হক—ইনি এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট, অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষক প্রজাদলের নেতা ছিলেন। পরে ইনি পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হইয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৮৮ বৎসর।

পৃঃ ৩৭ ঃ—নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র—ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে য়্যাটর্ণিগিরি করিতেন। বীরেন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৮ ঃ—(বালগঙ্গাধর) তিলক—মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তানায়ক ও স্বদেশপ্রেমিক।

পৃঃ ৭৩ ঃ—যুবরাজ—ইংল্যাণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্।

পৃঃ ৭৪ ঃ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট। ইনি কংগ্রেসের ইতিহাস, গিরিশপ্রতিভা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

পৃঃ ৭৫ ঃ—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৯-)—ইনি এক সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও খণ্ডিত ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

পৃঃ ১০৭ ঃ—(কৃষ্ণগোপাল) গোখেল (১৮৬৬-)—মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ছিলেন নির্ভীক দেশহিতৈষী।

পৃঃ ১০৮ :—হেমন্তকুমার সরকার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

পৃঃ ১১১ :—অনিলবরণ রায়—ইনি এক সময়ে অধ্যাপক ছিলেন। এখন পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে থাকেন।

রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি আলিপুরের উকিল ছিলেন।

পৃঃ ১১২ :—হরিধন দত্ত—ইনি য়্যালোপ্যাথিক এম ডি ছিলেন।

জে. সি. মুখার্জ্জি—ইঁহার পুরা নাম জ্যোতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৬০ সালে পরলোকগমন করেন। সুভাষচন্দ্রের পর ইনি কলিকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হন।

পৃঃ ১১৩ :—ক্যাপিটাল—ইংরেজ বণিকদের পরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা।

পৃঃ ১১৬ :—ডাঃ জে. এম দাশগুপ্ত—ইনি স্বরাজ্য দলের সদস্য ছিলেন।

পৃঃ ১১৯ :—রামসুন্দর সিংহ—ইঁহার নিবাস মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা। ইনি স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবার কারাবরণ করেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন।

পৃঃ ১২১ :—মহেন্দ্রনাথ মাইতি (১৮৫৯-১৯৪০ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার তিলন্তপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী ছিলেন। ইঁহার মত পূতচরিত্র ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়।

পৃঃ ১২৭ :—দেবেন্দ্রলাল খান (১৮৯৫-১৯৪৭ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলে ইঁহার জন্ম। ইনি নিরহঙ্কার ও উদারচেতা জমিদার ছিলেন। ১৯২৬ সালে দলীয় চক্রান্তের প্রভাব পরিহার করিতে না পারিয়া ইনি শাসমলের বিরোধিতা করেন।

তুলসীচরণ গোস্বামী—হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ইঁহার জন্ম। ইনি এম এ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ইনি কংগ্রেসদলভুক্ত ছিলেন।

পৃঃ ১৩৩ :—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু—১৮৬১ সালে এলাহাবাদে ইঁহার জন্ম। ইনি সেখানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতি হন। এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পৃঃ ১৩৭ :—গোপীনাথ সাহা—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ টেগার্ট কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তিনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলার সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য তাঁহার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহা সত্য। সন্ত্রাসবাদীদিগকে জব্দ করিবার জন্য তিনি তাহাদের উপর এবং সেই সঙ্গে অনেক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের উপর নিপীড়ন চালাইয়াছিলেন। সেজন্য সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা চলে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ সাহা নামক এক নিতান্ত তরুণ বাঙালী কলিকাতায় ধর্ম্মতলা ও এসপ্লানেডের মোড়ে ভ্রমক্রমে মিঃ ডে নামক এক ইউরোপীয়কে মিঃ টেগার্ট মনে করিয়া রিভলভারের গুলিতে নিহত করে। গোপীনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিচারে তাহার প্রতি ফাঁসির আদেশ হয়।

১৯২৫ সালে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টে আর্ল উইণ্টারটন (ইনি এক সময়ে ভারত-সচিব ছিলেন) বলেন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর সম্মেলনে মিঃ ডেব হত্যাকারী গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার অর্থ শ্বেতাঙ্গদিগের হত্যার জন্য দেশবাসীদিগকে প্ররোচিত করা। ভারত সরকার বা ইংলণ্ডের সরকার ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করিবেন কিনা তাহা স্থির করা প্রয়োজন। বাংলার মত অশান্তিময় প্রদেশে যাহারা হত্যাকারীর সমর্থন করে তাহাদিগকে আইনতঃ শাস্তি দিলে পার্ল্যামেণ্টের কোন দলই আপত্তি করিবে না। যদি দেখান যায় যে, মিঃ সি আর. দাশ বা বাংলার স্বরাজ্য দলের অপর কোন লোকের প্ররোচনাতেই রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিয়া এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে সরকার সহজেই তাহাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর যদি ভারতে আবার হত্যাকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে ভারত সরকারের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।

পৃঃ ১৪৫ :—মাখন সেন—ইনি এক সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত জড়িত ছিলেন। পরে ইনি 'ভারত' নামক দৈনিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি এক সময়ে বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। পরে ইনি কলিকাতা করপোরেশনে চাকরি করিতেন।

পৃঃ ১৫০ :—সাতকড়িপতি রায়—মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার

জাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট। ইনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

সতীশরঞ্জন দাশ—ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি ব্যারিষ্টার ছিলেন।

পৃঃ ১৫২ :—গঙ্গাধর নন্দ (১৮৬১-১৯৩০ খৃঃ)—মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। ইনি দুইটি উচ্চ ইংরেজী ও একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহা ছাড়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

পৃঃ ১৬৩ :—বাংলার গভর্ণর—স্যার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সমাবর্ত্তন সভায় বীণা দাস (পরে ভৌমিক) ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল—লর্ড আরউইন।

পৃঃ ১৭৬ :—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২০ সালে ইনি চাকরী ত্যাগ করিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কয়েকবার কারাবরণ করেন। পরে কয়েক বৎসর ইনি কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইনি এখন পরলোকগত হইয়াছেন।

পৃঃ ১৯৪ :—লর্ড মিণ্টো (১৮৪৫-১৯১৪ খৃঃ)—১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ইনি ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হন। ইঁহারই প্রস্তাবে প্রথম একজন ভারতীয় (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। মিঃ (পরে লর্ড) সিংহ আইন সচিব ছিলেন।

লর্ড মিণ্টোর প্রপিতামহ লর্ড মিণ্টো (বংশগত নাম জর্জ্জ ইলিয়ট) (১৭৫১-১৮১৪) ১৮০৭ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন এবং ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত এদেশে কাজ করেন।

পৃঃ ২০৭ :—জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি অকৃত্রিম দেশসেবিকা ছিলেন। এই বিদুষী মহিলা সিংহল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। ইঁহার মাতা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার এবং

পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ-সংস্কারক ও চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা হাঙ্গামার কিছুদিন পরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পৃঃ ২৫৭ :—রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃঃ)—হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম। ব্রাহ্মমতের প্রবর্ত্তক। ভারতে সতীদাহ নিবারণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিরোধ ইঁহার দুই প্রধান কীর্ত্তি। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সমর্থকদের মধ্যে ইনি অন্যতম।

পৃঃ ২৩৮ :—কাণ্ডারী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খৃঃ)।

লর্ড বার্কেনহেড (১৮৭২-১৯৩০ খৃঃ)—ইনি ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত-সচিব ছিলেন। ইনি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ খৃঃ)—কলিকাতায় ইঁহার জন্ম। ইনিই রাষ্ট্রগুরু ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্মদাতা সুরেন্দ্রনাথ। ইনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট বারাকপুরে পরলোক গমন করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (-১৯২৫ খৃঃ)—ইনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

জগদিন্দ্রনাথ রায়—নাটোরের মহারাজা। "মানসী-মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (স্যার) (১৮৫১-১৯২৬)—ঢাকা জেলার ভাটপাড়ায় ইঁহার জন্ম। ইনি আই. সি এস ছিলেন। ইনি তৎকালে সরকারের কয়েকটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছিলেন। ইনি ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় সরকারের বোর্ড অব্ রেভিনিউর প্রথম ভারতীয় সদস্য ও পরে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য হন।

পৃঃ ২৩৯ :—সত্যেন্দ্রচন্দ্র (মিত্র)—ইনি স্বরাজ্য দলের সদস্য ছিলেন। পরে ইনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি হন।

পৃঃ ২৬৫ :—লর্ড কারমাইকেল (১৮৫৯-১৯২২ খৃঃ)—ইনি এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল বাংলার গভর্ণর হইয়া আসেন এবং পাঁচ বৎসর কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন।

পৃঃ ২৬৬ :—(উইলিয়াম ইওয়ার্ট) গ্ল্যাড্ষ্টোন (১৮০৯-১৮৯৮ খৃঃ)—লিভারপুল নগরে জন্ম। ইনি কয়েকবার ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

পৃঃ ২৬৭ :—ভার্সেল্স্ সন্ধিপত্র—১৯১৮ সালে প্রথম মহাসমর শেষ হইলে মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানিকে তাঁবেদার করিয়া রাখিবার জন্য ভার্সেলিস

নামক স্থানে তাহার সহিত যে চুক্তি করে তাহাই ভার্সেল্‌স্‌ বা ভার্সাই সন্ধি নামে খ্যাত।

হিণ্ডেনবার্গ—জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।

লীগ্‌ অব্‌ নেশনস্‌—প্রথম মহাসমরের পর বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য যে সংঘ গঠন করা হয় তাহার নাম লীগ অব্‌ নেশন্‌স্‌। জেনেভায় ইহার সদর দপ্তর ছিল। স্থাপনকর্ত্তা আমেরিকার উড্রো উইলসন।

মুসোলিনি—ইতালির রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।

(টমাস) উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪ খৃঃ)—১৯১৩ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মাণ-সম্রাট কাইজারের নিকট হইতে অমানুষিক ডুবোজাহাজ যুদ্ধ পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম মহাসমরে মিত্রশক্তির জয়লাভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলেন তিনি।

পৃঃ ২৬৮ :—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড) (১৮৬৩)—বীরভূম জেলার রায়পুরে ইঁহার জন্ম। ইনি বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে ইনি লর্ড উপাধি পান এবং সহকারী ভারত-সচিব হন। ১৯২০ সালে ইনি বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী প্রদেশের গভর্ণর হন নাই।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯ খৃঃ)—১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ইনি ভারতে ঠগদের উপদ্রব নিবারণ করেন। ইনি সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন।

পৃঃ ২৬৯ :—লর্ড রোনাল্ডসে (১৮৭৯-) ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের পর বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড কর্জনের এ-ডি-কং ছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৫৮-)—১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ইহার সময়ে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশ পুনঃ সংযুক্ত হয়; ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং বিহার-উড়িষ্যা বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

ইহার পিতামহ লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন

পৃঃ ২৭৩ :—মহম্মদ—মুসলমানদের ধর্মগুরু।

পৃঃ ২৭৫ :—লর্ড রেডিং—ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পর ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ইনি ভারতবাসীর অহিতকর কয়েকটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

পৃঃ ২৯৪ :—দাদাভাই নৌরজী (১৮২৫-১৯১৭ খৃঃ)—বোম্বাইতে পার্শী পুরোহিত বংশে জন্ম। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। ১৮৯২ সালে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের সভাপতি। রাজনীতি ও রাজস্ব বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। প্রথম জীবনে ইনি অধ্যাপক ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের জীবনের বর্ষানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ।

১৮৯৩ „ কাঁথি হাই স্কুলে প্রবেশ।

১৮৯৫ „ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শের প্রেরণালাভ।

১৮৯৭ „ পিতৃবিয়োগ ও সম্পত্তি পরিচালনায় অংশগ্রহণ।

১৯০০ „ এনট্রান্স পরীক্ষায় সাফল্যলাভ।

১৯০১ „ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি, অস্পৃশ্যতা-জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের প্রথম প্রচেষ্টা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের মেদিনীপুর অধিবেশনে ঐ জেলার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি হিসাবে ঐ অধিবেশনে যোগদান, ব্যারিষ্টারি অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাত্রার সংকল্প।

১৯০২ „ কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্ত্তি, বিলাত যাত্রার প্রস্তুতি, শপথ গ্রহণ, বিলাত-যাত্রা, ইনার টেম্পল-এ ভর্ত্তি।

১৯০৩ „ শপথ পালন।

১৯০৪ „ ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন, আমেরিকা ভ্রমণ; প্রলোভন জয়, বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপান ভ্রমণ, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ।

১৯০৫ „ স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার।

১৯০৬ „ মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের উদ্যোক্তা, সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান, মেদিনীপুর বোমার মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন (পৃঃ ১৬১)।

১৯০৭-১৩ খৃঃ মেদিনীপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ, জেলা বোর্ড ও সদর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য।

১৯১৩ খৃঃ কলিকাতায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ, মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত্তদের সেবা, প্রস্তাবিত মেদিনীপুর জেলা বিভাগের নিরোধ সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের নিকট প্রেরিত ডেপুটেশনের সভ্য, ডায়মণ্ডহারবার ও চাঁদপুর দুর্গদ্বয়ের মধ্যে কোন একস্থানে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য লর্ড কারমাইকেলের নিকট পত্র প্রেরণ (পৃঃ ২৬৫)।

১৯১৯ „ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ময়মনসিংহ অধিবেশনে মেদিনীপুরের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান, পরবর্ত্তী বৎসর মেদিনীপুরে সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান, বিবাহ।

১৯২০ „ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের মেদিনীপুর অধিবেশনের আয়োজন ও অসামান্য সাফল্যলাভ। মেদিনীপুরে বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সেবা, কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সম্পাদকতা, বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থন, ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ। আইন ব্যবসায় ত্যাগ, আইন সভায় প্রবেশের আয়োজন স্থগিত।

১৯২১ „ বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ, জাতি সম্পর্কিত ইঙ্গিতে অপমান বোধ করিয়া কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ। মেদিনীপুরে অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের প্রচার ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ। কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথে শত-শত মাইল পদব্রজে ভ্রমণ, স্বদেশের পরাধীনতা মোচনে জাতিধর্ম্মের বিভেদ অস্বীকার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশনে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন। মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ, এবং ইউনিয়ন বোর্ড থাকা কালে পাদুকা পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা, কাঁথির মহকুমা-শাসক জ্ঞানাঙ্কুর দের নিকট যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ পত্র প্রেরণ, আন্দোলনে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্বর্দ্ধনায় যোগদানের জন্য অন্ধকার রজনীতে দীর্ঘ ও কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথ পদব্রজে ও বৃষ্টির মধ্যে অতিবাহন, আন্দোলনে

অসাধারণ সাফল্যলাভ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক-পদ লাভ, সম্পাদকের পারিশ্রমিক ত্যাগ, কাঁথিতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে সমগ্র বঙ্গে হরতাল পালনের আয়োজন ও সাফল্য লাভ, গ্রেপ্তার।

১৯২২ খৃঃ বিচারে ছয়মাস বিনাশ্রম কারাবাস, কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ। দেশবাসীর সম্বর্দ্ধনা, পুনরায় পাদুকা ব্যবহার, ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবীদিগকে কংগ্রেসে স্থানদান ও গান্ধীপন্থীদিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়ন সম্পর্কে আপত্তি এবং চিত্তরঞ্জনের সহিত মতভেদ, "স্রোতের তৃণ" গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ।

১৯২৩ „ নবগঠিত স্বরাজ্যদলেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক নির্বাচিত, স্বরাজ্যদলের মুখপত্র "ফবোয়াড"-এর ডিরেক্টার নির্বাচিত, মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত, জনগণেব অভূতপূর্ব কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন, মেদিনীপুরে জেলাবোর্ডের পক্ষ হইতে বাংলাব লাটের সম্বর্দ্ধনায় বৈধভাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন, লাটের সম্বর্দ্ধনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত আহ্বানে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় যাইতে অস্বীকার, অন্য কারণে চেয়ারম্যান হিসাবে যাইতেও অস্বীকৃতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি কেন্দ্র হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত, চিত্তরঞ্জনের অনুকূলে একটি আসন ত্যাগ, ব্যবস্থাপক সভায় স্ববাজ্যদলেব 'হুইপ'।

১৯২৪ „ 'ফবোযার্ড' পত্রিকার ডিবেক্টাবের পদ ত্যাগ, কলিকাতা করপোবেশনেব চীফ একজিকিউটিভ অফিসাবের পদ লইয়া স্বরাজ্য-দলেব নিকট হইতে কুৎসিত ও চিত্তবঞ্জনেব নিকট হইতে বিসদৃশ আচরণ লাভ, বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ, বঙ্গ সরকাবের বার্ষিক ৬৪ হাজাব টাকা বেতনেব মন্ত্রীব পদ প্রত্যাখ্যান, বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণেব জন্য চিত্তবঞ্জনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান।

১৯২৫ „ স্বরাজ্যদল ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য পদ ত্যাগ, পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়, পুনবায় অর্থাভাবে মেদিনীপুবে আইন ব্যবসায় আবম্ভ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীব নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে সহায়তার জন্য চিত্তরঞ্জনেব অনুবোধ বক্ষা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতিত্ব বিনাসর্ত্তে গ্রহণে অসম্মতি, স্বাধীনভাবে

আইন সভায় পুনঃ প্রবেশ, প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ, পুনরায় জেলা বোর্ডের সদস্য ও চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত, কন্যার জন্ম।

১৯২৬ খৃঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গোলমাল সম্পর্কে তুলসী গোস্বামীর পত্র, স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পত্র। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত, অনাস্থা প্রস্তাব, সভামণ্ডপ ত্যাগ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে শাসমলের নির্ব্বাচন সরকার কর্ত্তৃক বাতিল, শাসমলের সহিত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চালাকী।

১৯২৬ „ মেদিনীপুর জেলার প্লাবন-পীড়িত ব্যক্তিদের সেবা, বঙ্গীয় আইন সভার নির্ব্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার মনোনয়ন লাভ, অবৈধভাবে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার সভ্যপদ ত্যাগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান, নির্ব্বাচনে পরাজয়।

১৯২৭ „ পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান, নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক পদ গ্রহণ, অনাস্থা প্রস্তাব, কংগ্রেস রাজনীতি হইতে দূরে অবস্থান, পুত্র সন্তান লাভ, হুগলী বোমার মামলা সমর্থন।

১৯২৯ „ মাতৃবিয়োগ ও লাহোর কংগ্রেসে যোগদান।

১৯৩০ „ চট্টগ্রাম হাঙ্গামা সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য, মেদিনীপুরে পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন, সদস্য হিসাবে কাজ, গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তি, মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৪৪ ধারা জারি, হাইকোর্টের আদেশে ১৪৪ ধারা জারি বাতিল।

১৯৩১ „ মেদিনীপুর বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব, মেদিনীপুর বিভাগ সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর ও ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট পত্র প্রেরণ, ইংলণ্ডে গান্ধীজী ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট তারবার্ত্তা প্রেরণ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য উড়িষ্যার বি. এন. মিশ্রের নিকট কড়া চিঠি প্রেরণ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন।

১৯৩২ খৃঃ মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসের হত্যা মামলায় আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন, গ্রেপ্তার ও মুক্তি।

১৯৩৩ „ কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে জয়লাভ, আততায়ীর ছুরিকাঘাত হইতে রক্ষা, পুনরায় মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সেবা, করপোরেশন দমন বিলের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন।

১৯৩৪ „ মেয়র নির্ব্বাচন সভায় সভাপতিত্বকালে সূক্ষ্ম আইন জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ অভিযানে যোগদান, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত, মহাপ্রস্থান।

